কে বলে কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়?

অভিযোগের জবাবে

কুরআন ও বিজ্ঞান

ডা. শাহ্ মুহাম্মদ হেমায়েত উল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
বিনতে মুজাহিদ

যে বলে কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়

অভিযোগের জবাবে

কুরআন ও বিজ্ঞান

ডা. শাহ্ মুহাম্মদ হেমায়েতউল্লাহ্
প্রাক্তণ মেডিকেল অফিসার
মিটফোর্ড হসপিটাল- ঢাকা
প্রাক্তণ মেডিকেল সুপারভাইজার
জেদ্দা মিউনিসিপ্যালিটি
সৌদি আরব

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

গুলশান পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
মোঃ হাদিউল ইসলাম
গুলশান পাবলিকেশন্স
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭৫৩৭১
০১৭১৪৬৫১২৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০০৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
লেখক
শাহ্ ভিলা
জি, পি, 'শ' ২৩-এফ
আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৯৮৮৭৪৪৩

কম্পিউটার
রাতুল কম্পিউটার
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
আধুনিক প্রেস
২৫ শ্রীশ দাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য
১০০ (একশত) টাকা মাত্র

Ovijoger Zobabe **Quran O Biggan** Written by Dr. Sha Muhammad Hemayetullah Published by Gulshan Publications, 38/4, Mannan Market (2nd Floor) Banglabazar, Dhaka-1100. Price : Tk. 100.00 Or. 5 Dollar

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

প্রাপ্তিস্থান

❑ **আধুনিক প্রকাশনী**
২৫/ শ্রীশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

❑ **আধুনিক প্রকাশনী**
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

❑ **আধুনিক প্রকাশনী**
চাষী কল্যাণ ভবন
ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা

❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**
- ৩৮/৩ বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
  বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
  ফোন- ৭১২৫৬৬০
- কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস,
  ঢাকা-১১০০
  ফোন- ৯৬৭০৬৮৬, ৮৬২৭০৮৬,
  মোবাইল : ০১৭১-৩৭১১৭১
- ১৯৩ ওয়ারলেস রেলগেট,
  বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

❑ **তাসনিয়া বই বিতান**
৪৯১/১ বড় মগবাজার,
ওয়ারলেস গেট, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
A- শুরুর কথা	৫
B- বই লেখার উদ্দেশ্য	১১
C- কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ	১৫
D- অভিযোগের জবাব	১৬
কুরআনের সঠিকতা বা সত্যতার দলিল	১৮
ক. কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা	১৮
খ. কুরআন সংরক্ষণ ব্যবস্থা	২১
গ. অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য ঘটনার বর্ণনা	২৩
a. অতীতকালের (কুরআন নাযিলের পূর্বের ফেরাউনের) বর্ণনা	২৪
b. বর্তমান (কুরআন নাযিল হওয়াকালিন আবু লাহাব ও মি'রাজের) বর্ণনা	২৬
c. ভবিষ্যতের (কুরআন নাযিলের পরের মহাশূন্যাভিযানের) বর্ণনা	৩১
d. সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য	৩৩
ঘ. বৈজ্ঞানিক প্রমাণ	৩৫
a. মহাবিশ্বের সৃষ্টি	৩৫
১. বিগ ব্যাংগ (Big Bang) কি?	৩৮
২. কুরআন ও বিজ্ঞানের মতে ছয়দিনে (পর্যায়ে) মহাবিশ্ব সৃষ্টি	৩৯
৩. মহাবিশ্বের সৃষ্টির বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেলের গরমিল	৪৪
৪. দৃশ্য ও অদৃশ্যমান মহাবিশ্ব	৪৫
b. মহাবিশ্বের পরিণতি / কিয়ামত (মহাধ্বংস)	৫৯

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. সূর্যসহ ছোট তারার পরিণতি (ধ্বংস)	৬০
২. পৃথিবীর পরিণতি (ধ্বংস)	৬৩
৩. সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে ১০ গুণ বড় তারার পরিণতি	৬৮
৪. ব্লাকহোলের পরিণতি	৬৯
c. মানব সৃষ্টি	৭৩
১. ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্ব	৭৩
২. চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে মানব প্রজনন	৭৬
৩. কুরআনের আলোকে মানব প্রজনন	৭৮
৪. সামান্যতম শুক্রকীট (নুৎফা) থেকে মানুষ তৈরি	৮০
৫. বীর্য সংমিশ্রিত তুচ্ছ তরল পদার্থের সমষ্টি	৮২
৬. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্যস্থিত নির্গত তরল পদার্থ হতে	৮৩
৭. জরায়ুতে ভ্রূণের পরিবর্তন বা ক্রম বিকাশ	৮৫
৮. জীবন ও রূহ এক নয়	৮৯
d. পরকাল ও পুনরুত্থানের প্রমাণ	৯২
e. আল্লাহর বাণী, বিধান ও সৃষ্টির কোনোই পরিবর্তন নেই	১০১
১. জাহান্নামের জ্বালানি কি ও কেন?	১০১
২. ব্যাথার অনুভূতির কেন্দ্র চামড়াতেও বিদ্যমান	১০৬
৩. মাতৃগর্ভে প্রথমে কর্ণ ও পরে চক্ষু তৈরি হয়	১০৮
৪. অন্তরের ব্যাধি বা মানসিক রোগ (Psychic disease)	১১০
৫. কাহারো দু'টি হৃদপিণ্ড নেই	১১২
৬. নারীর চেয়ে পুরুষরা ক্ষমতাবান (শক্তিশালী)	১১৩
৭. সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি	১১৫
৮. মহাবিশ্বে সবকিছুই ঘুরছে, কিছুই স্থির নেই	১১৬
৯. চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই	১১৭
১০. চন্দ্র-সূর্য সময়ের নির্ধারক	১১৮
১১. উদয়াচল ও অস্তাচল কয়টি?	১২১
১২. সূর্য ও পানির অবদান	১২৩

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩. সূর্য ও চাঁদের অবদান	১২৫
১৪. দিন-রাতের অবদান	১২৬
১৫. আল্লাহ কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে	১৩১
i. বজ্রপাতের উপকারিতা	১৩১
ii. ঝড় (Cyclone) এর উপকারিতা	১৩২
iii. হিংস্র প্রাণীর উপকারিতা	১৩৩
১৬. পানির অস্তিত্ব ও গতিপথ	১৩৪
১৭. দুই সাগরের মাঝে রয়েছে এক অন্তরায়	১৪১
১৮. সাগরের গভীরতা ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সমুদ্রের অন্ধকার বৃদ্ধি করে	১৪৬
১৯. প্রাণীদেহে দুধ তৈরি	১৪৮
২০. হারাম খাদ্যের অপকারিতা	১৪৯
f. ক্লোনিং (Cloning) কি সম্ভব?	১৫৫
g. স্রষ্টার বিধানের লংঘনই এইডস (AIDS) এর কারণ	১৫৮
h. কম্পিউটারের বিশ্লেষণে কুরআন	১৬১
i. আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও মাতৃগর্ভের সন্তানের লিঙ্গ জানা কি গায়েবকে জানা নয়?	১৭১
j. সকল কাজতো আল্লাহই করান, তবে পাপের জন্য আমরা দায়ী হব কেন?	১৭৭
k. ভাগ্যে যা লিখা আছে তাই হবে তবে পুণ্য করে লাভ কি?	১৮০
l. পাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?	১৮২
m. স্রষ্টার স্রষ্টা কে?	১৮৫
n. শেষ কথা	১৯০

www.nagorikpathagar.org

শুরুর কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া যিনি আমার মতো অধমকে দিয়ে এ বই লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ ও সালাম। জীবনেও কল্পনা করিনি, এ ধরনের বই আমার দ্বারা লেখা হবে। কারণ আমি ছিলাম ধর্মের নিয়মকানুন ও আদেশ-নিষেধ পালন করা থেকে অনেক দূরে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অর্থ জানা তো দূরের কথা; সেই ছোটবেলায় তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন সময়ে কোনমতে মক্তবে পবিত্র কুরআন একবার খতম করেছিলাম। তারপর থেকে, ডাক্তারি পাস করার বেশ ক'বছর পর পর্যন্তও আর কুরআন খুলে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ১৯৮০ সনে সৌদীতে যাওয়ার পর আবার নতুন করে কুরআন পড়া শুরু করি । শ্রদ্ধেয় ওসমান গণি ও শামসুদ্দোহা সাহেব মক্কা উম্মূল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন। আমরা কয়েক বন্ধু জেদ্দায় তাঁদের কাছে কুরআন শেখার সুযোগ পাই। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে (আলহামদুলিল্লাহ্), অতি সংক্ষেপে তাজবীদ (কুরআন পড়ার নিয়ম) শিখে কুরআন পড়তেও অর্থ জানার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তাঁদেরকে 'জাযায়ে খায়ের' (উত্তম বদলা) দান করুন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআন যেনতেনভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করা নিষেধ। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا (ط) (المزمل : ٤)

'আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।'

(সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩ ঃ আয়াত-৪)

জীবনের শেষ বেলায় আজ খুবই আফসোস হচ্ছে এই ভেবে যে, ছাত্র জীবনে বৃত্তি পেতাম রেজাল্ট ভাল হওয়ার কারণে। আর মেডিক্যাল বইয়ের কত বিদঘুটে গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ মুখস্ত করেছি। অথচ পাঠ্যসূচিতে কুরআন-হাদিস না থাকায় সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। পাঠ্য তালিকায় তা অন্তর্ভুক্ত থাকলে কিছুই কি জানতাম না? যাক কুরআন না বুঝার কারণে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। তবে বর্তমানে কুরআনের অর্থ পড়ার মাধ্যমে সরাসরি কুরআনেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। নিম্নে আমার মনে যেসব প্রশ্ন উদয় হতো তার মধ্য থেকে দু'চারটা আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআন থেকে উত্তরসহ তুলে ধরছি।

www.nagorikpathagar.org

১. পশ্চিমা বিশ্বে অধিকাংশই কাফের (অবিশ্বাসী) হওয়া সত্ত্বেও তারা এত উন্নত, তাদের আরাম আয়েশ ও শান্তির শেষ নেই কেন?

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এর উত্তরও ১৫০০ বছর পূর্বেই কুরআনে মহান স্রষ্টা দিয়ে দিয়েছেন। অথচ কুরআন না জানার কারণে দীর্ঘদিন এ প্রশ্ন মনের মধ্যে জমা করে রেখেছি।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ (ط) اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ (لا) (ابرٰهيم : ٤٢)

'তুমি কখনও মনে করিও না যে, যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি উহাদিগকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদের চক্ষু স্থির হইবে।' (সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ আয়াত ৪২)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ـ (هود : ١٥)

'যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি উহার কর্মফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না।'

(সূরা হুদ ১১ ঃ আয়াত ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ (ط) (النمل : ٤)

'যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

(সূরা নামল ২৭ ঃ আয়াত ৪)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ (ط) وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ (ط) لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ (العنكبوت : ٦٤)

'এই পৃথিবীর জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনইতো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত।'

(সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ আয়াত ৬৪)

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ (الطارق : ١٧)

www.nagorikpathagar.org

'অতএব, কাফেরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।' (সূরা তারিক ৮৬ ঃ আয়াত ১৭)

২. কিছু কিছু যালিম, মুশরিক ও কাফের যেমন- ফেরাউন, হামান, কারুন, নমরুদ ও লুত (আ) এর সম্প্রদায়ের দুনিয়াতেই কিছুটা শাস্তি হয়েছে। এখনও ঐরকম অনেকে আছেন তাদের শাস্তি হয় না কেন? অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এসব খুঁটিনাটি প্রশ্নের উত্তরও কুরআনে রয়েছে।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (ط) لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ (ط) بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً ـ (الكهف : ٥٨)

'এবং তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান, উহাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি উহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তবে তিনি অবশ্যই উহাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু উহাদের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুতি মুহূর্ত, যাহা হইতে উহারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।'

(সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ আয়াত ৫৮)

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ـ (طه : ١٢٩)

'তোমার প্রতিপালকের পূর্বসিদ্ধান্ত ও একটা কাল নির্ধারিত না থাকিলে অবশ্যম্ভাবী হইত আশু শাস্তি।' (সূরা তাহা ২০ ঃ আয়াত ১২৯)

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (ج) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ (ط) فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ـ (مريم : ٧٥)

'বল, যাহারা বিভ্রান্তিতে আছে দয়াময় তাহাদিগকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তাহারা যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, উহা শাস্তি হউক অথবা কিয়ামতই হউক। অতঃপর তাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।'

(সূরা মরইয়াম ১৯ ঃ আয়াত ৭৫)

وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ (ط) إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا (ط) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ـ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ـ (لقمن : ٢٣-٢٤)

www.nagorikpathagar.org

'আর কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি উহাদিগকে অবহিত করিব উহারা যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।'

(সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ২৩-২৪)

৩. অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা দুনিয়াতে যেসব ভাল কাজ করে আখেরাতে তারা এর কোন বদলা পাবে কি?

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ـ

(الشورى : ٢٠)

'যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহার কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।' (সূরা শূরা ৪২ ঃ আয়াত ২০)

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ (ط) لَايَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ (ط) ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ـ

(ابرهيم : ١٨)

'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদের উপমা তাহাদের কর্মসমূহ ভস্মসদৃশ যাহা ঝড়ের দিনে বাতাসে প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা কাজে লাগাইতে পারে না। ইহাতো ঘোর বিভ্রান্তি।' (সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ আয়াত ১৮)

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا ـ (الفرقان : ٢٣)

'আমি উহাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করিব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব।' (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ আয়াত ২৩)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِى هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ (ط) وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ـ (ال عمرن : ١١٧)

'এই পার্থিব জীবনে যাহা তাহারা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হিম শীতল বায়ু, উহা যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছে তাহাদের শস্য ক্ষেত্রকে

www.nagorikpathagar.org

আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি যুলুম করেন নাই, তাহারাই তাহাদের প্রতি যুলুম করে।' (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ আয়াত ১১৭)

৪। দুনিয়াতে মুসলমানদের এত দুঃখকষ্টের কারণ কি?

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ

(العنكبوت : ٢)

'মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে?'

(সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ আয়াত ২)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ

(الكهف : ٧)

'পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি সেগুলিকে উহার শোভা করিয়াছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে, উহাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।' (সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ আয়াত ৭)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ـ (البقرة : ١٥٥)

'আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব।'

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৫৫)

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ـ

(الشورى : ٣٠)

'তোমাদের যে বিপদ আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।'

(সূরা শূরা ৪২ ঃ আয়াত ৩০)

মৃত্যুর পর ঈমানদারগণ পাবেন পরম সুখময় জান্নাত। এমন শান্তির স্থান বিনা পরীক্ষায়, বিনা শ্রম ও বিনা ক্লেশে পাবেন তা হতে পারে না। দুনিয়ার জীবনে আমাদের যত বালামসিবত তা আমাদের কিছুটা কর্মের ফল বাকিটা আমাদেরকে পরীক্ষা ও পাপমোচনের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

এ সমস্ত প্রশ্ন ছাড়াও আরো কিছু প্রশ্ন আমার মনে উদয় হতো। যেমন- কেন আমরা মুসলমান? কেনই বা নামায-রোযা ইত্যাদি করি? বাপ-দাদা মুসলমান বলেই কি আমাকে মুসলমান হতে হবে? এবং বিজ্ঞান সম্পর্কীয় নানা প্রশ্নও আমার মনে ভীষণ নাড়া দিত। আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশ্নের উত্তরই সরাসরি কুরআনে পেয়ে গেছি। তবে নিজের প্রশ্নোত্তর পাওয়ার পর অন্য কারো প্রশ্নের সন্ধান পেলেই তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুঁজতে যেয়ে অত্যন্ত মারাত্মক কঠিন কঠিন প্রশ্ন আমার হাতে এসেছে যা আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি। প্রকাশ থাকে যে, এ বইয়ের উপকরণ জোগাতে সময় লেগেছে দশ বছরেরও বেশি, আর বই লিখতে লেগেছে প্রায় দু'বছরের মত।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, কেউ যদি কুরআনের তাফসীর পড়েন তা'হলে তো কোন কথাই নেই, অতি উত্তম। কিন্তু তা না হলে যদি অন্তত মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষভাবে শুধু কুরআনের অর্থও পড়েন তাহলেও ঈমানের দৃঢ়তা, ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কীয় সকল প্রশ্নোত্তর এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার নিশ্চিত উপায় খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ্। তবে কাজটি হতে হবে একেবারে নিরপেক্ষভাবে খালেস নিয়তে, ইখলাসের সাথে। যেহেতু মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বজান্তা, সকল জ্ঞানের অধিকারী মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে। কাজেই এমন কোন প্রশ্ন পাবেন না, যার উত্তর ও সমাধান এ গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহান স্রষ্টা ঘোষণা করেন-

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ - (النمل : ٧٥)

'আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নাই।' (সূরা নামল ২৭ ঃ আয়াত ৭৫)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ (٧)

(النحل : ٦٤)

'আমি তো তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য।'

(সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ৬৪)

কুরআন হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার একমাত্র বিধান। কাজেই মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে এ কিতাবে বিশদভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাতে করে যে কেউ সৎ ও সঠিকভাবে চলে কামিয়াব হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

আমার একান্ত অনুরোধ অন্তত **"পরকাল ও পুনরুত্থানের প্রমাণ"** অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে পড়বেন। যেহেতু পরকাল আছে বলেই সঠিকভাবে ধর্মের নিয়মকানুন ও বিধিবিধান মেনে চলা প্রয়োজন।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ (ص : ٢٩)

'এক কল্যাণময় কিতাব। ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে মানুষ ইহার আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।' (সূরা ছোয়াদ ৩৮ ঃ আয়াত ২৯)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ (القمر : ١٧)

'কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?' (সূরা কামার ৫৪ ঃ আয়াত ১৭)

এ বই লেখার উদ্দেশ্য

কুরআনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে ভিত্তিহীন নানা অভিযোগ উঠে। বিশেষ করে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার হলে অনেকেই বলে উঠেন এটি কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। অবশ্য ইতিমধ্যেই কুরআন ও বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক বই বাজারে এসে গেছে এবং টিভিতেও এ সম্পর্কে অনেক প্রোগ্রাম হচ্ছে। আমার ধারণা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নন অথবা যারা কুরআন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন না তারা ঐসব বই ও টিভি প্রোগ্রাম থেকে তেমন উপকার পাচ্ছেন না। তাই আমি অতি সহজ-সরল ভাষায় অতি সংক্ষেপে কুরআনের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগের উত্তর বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; যাতে ঈমান মজবুত হয় এবং কুরআনের বিধিবিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগ করতে পারেন। বিশেষ করে যারা দাওয়াতি কাজ করেন তাদের জন্য এই বই সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। বইটি সহজে বুঝার জন্য আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ডাক্তারি শিখার পদ্ধতি (System) কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। কারণ যে কোন দিন SSC ও HSC তে বিজ্ঞান পড়েননি অথচ তার মেধা ও বিবেকবুদ্ধি ভালো এবং Sincere। তাকে যদি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে ডাক্তারি পাস করা তার জন্য মোটেও কঠিন নয়। আমি ব্যাপারটা একটু খুলে বলছি। মেডিক্যালে প্রথম দু'বছর এনাটমি ও ফিজিওলজি নামক দু'টি বিষয় পড়ানো হয়। **এনাটমি**- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন আর **ফিজিওলজি**- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ কি কি কাজ করে তা শিখায়। এনাটমি ও ফিজিওলজি পড়ার সময় এর সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রয়োজনীয় রসায়ন, পদার্থ ও জীববিজ্ঞান পড়ানো হয় প্রথমে, তারপর এনাটমি ও ফিজিওলজি। আর তৃতীয়

www.nagorikpathagar.org

বর্ষ থেকে পড়ানো হয় প্যাথলজি, মেডিসিন, সার্জারি ও অন্যান্য বিষয়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ পড়ানোর সময় এর সাথে সম্পৃক্ত রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, ফিজিওলজি এবং এনাটমির যতটুকু প্রয়োজন তা পুনরায় পড়ানো হয়। এভাবে যেকোন বিষয় পড়ানোর সময় যে বিষয়ের যেখানে যতটুকু দরকার তা পূর্বে শিখানো হয়। যেমন- হৃদপিণ্ডের রোগ পড়ানোর সময় হার্ট ও হার্টের রোগের সাথে রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, ফিজিওলজি ও এনাটমি যতটুকু প্রয়োজন তা পড়ানো হয় প্রথমে। সর্বশেষে হার্টের রোগ ও তার প্রতিকার শেখানো হয়।

তাই আমি এই বইতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানের বক্তব্য প্রথমে পেশ করেছি। পরে ঐ সম্পর্কীয় আয়াত বা আয়াতাংশ তুলে ধরেছি। উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" কর্তৃক প্রকাশিত **"আল-কুরআনুল করীম"** থেকে (সাধু ভাষায়) আয়াতের তরজমা গ্রহণ করেছি।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তা নয়। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'লাও অনেক ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا (ط) فَأَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ (ج) وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ
مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ـ (البقرة : ٢٦)

'আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচবোধ করেন না। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য- যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে যে আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন?' (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৬)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ
(الزمر : ٢٧)

'আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ আয়াত ২৭)

অনুরূপ আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। কাজেই স্রষ্টাও চান মানুষ কুরআনের ন্যায় উদাহরণ গ্রহণ করুক। কুরআনের আরেক আয়াতে এসেছে-

www.nagorikpathagar.org

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى (ط) قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ (ط) قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ (ط) قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ـ (البقرة : ٢٦٠)

"যখন ইব্রাহীম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও', তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার মনের প্রশান্তির জন্য।' তিনি বলিলেন, 'তবে চারিটি পাখি লও এবং ইহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের একেক অংশ একেক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর ইহাদিগকে ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৬০)

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'লা নবীর মনের প্রশান্তির জন্য মৃত পাখিকে জীবিত করে দেখালেন। তাহলে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেয়া কি ঠিক নয়? আসলে বেঠিক হচ্ছে অপব্যাখ্যা বা মিথ্যা ব্যাখ্যা করা। যেমন- হাশরের দিনে সবাইকে একত্র আমলনামা দেয়া কি সম্ভব? এর উত্তরের জন্য কম্পিউটারের উদাহরণ আর সবাইকে হাশরের দিনে যার যার কৃতকর্ম দেখানো হবে- এজন্য ভিডিও ক্যামেরার উদাহরণ দেয়া কি ঠিক নয়?

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ (ط)(الحج : ١١)

"মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সহিত।"

(সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ১১)

কাজেই যারা ঈমানদার এবং ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলেন তাদের আত্মতৃপ্তি আর যারা ইসলামের বিধান মানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সহিত ও নানা প্রশ্ন করে কুরআন না বুঝার কারণে তাদের জন্য এ বই। যাদের ঈমান নেই, কুরআন পড়ে না বা কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না ও জ্ঞান খাটায় না এমন লোকদের জন্য এ বই। জন্মগতভাবে মানুষ অনুসন্ধিৎসু। কোথা থেকে কিভাবে এবং কেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এ জীবনই কি শেষ- না এর পরও জীবন আছে? এমন নানা প্রশ্ন মনের মাঝে ভিড় জমানো স্বাভাবিক। এসব জবাবের জন্যই এ বই। পাগল ছাড়া সবারই জানার, বুঝার, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা আছে। আমি মনে করি আপনারা আপনাদের উপরোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিরপেক্ষভাবে এ বইটি অধ্যয়ন করলে স্রষ্টা ও কুরআন সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পারবেন এবং নানা প্রশ্নের উত্তর এবং উত্তর খোঁজার পথ খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ্। আপনি জেনে অবাক হবেন- শুধু নানা

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্নের উত্তরই নয় বরং কুরআনের মু'জিযা,[১] কুরআনের অনেক আয়াত ও শব্দের বহু অর্থ, পদ্য-গদ্যের সংমিশ্রণ, অতি উচ্চাঙ্গের উপমা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির বর্ণনা, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কথা ১৫০০ বছর পূর্বেই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ পর্যন্ত এমন কিছু আবিষ্কার হয়নি যা কুরআনের একটি আয়াতকেও ভুল প্রমাণিত করতে পেরেছে। কম্পিউটার কর্তৃক কুরআন বিশ্লেষণের ফলাফল ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশনাসমূহ দেখে আমি রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমি আবারও বলছি- ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে যারা সন্দিহান এবং যাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয় তাদের উদ্দেশ্যেই এ বই লিখা।

আমি মানুষ, ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বইতে কোন ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আমাকে অবহিত করলে আমি তা পরম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে আগামীতে সংশোধন করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবো। তাছাড়া আরো নতুন তথ্যাদি ও সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবো, আর মহান স্রষ্টার দরবারে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا (ج) وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا (ط) وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ۔

(النساء : ٨٥)

'কেহ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে নজর রাখেন।' (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৮৫)

وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۔ (يوسف : ٥٦)

'আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।'

(সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত ৫৬)

এ পুস্তক পাঠ করে পাঠকবৃন্দ যদি অর্থসহ কুরআন পাঠে আগ্রহী হন এবং এর মর্ম বুঝে নিজের মনের সংশয় দূর করে আল্লাহর মনোনীত পথে চলার চেষ্টা করেন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাকে ও এ বই লিখতে যারা সাহায্য করেছেন এবং পাঠকবৃন্দকে কবুল করে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার তৌফিক দান করেন। এই দোয়াই করি। আমীন!

[১] মু'জিযা হচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ও আয়ত্ত্ব-বহির্ভূত কাজ। যা নবীগণ দেখিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অজয়কে জয় করা আর না পাওয়াকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরদিনের। কাজেই কুরআন না জানা বা না বুঝার কারণে নানা প্রশ্ন করে থাকে মানুষ। কুরআনকে সঠিকভাবে জানতে পারলে নিশ্চয়ই এত প্রশ্ন করতো না। প্রশ্ন করা অন্যায় নয়, অন্যায় হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা না করা অথবা জানার জন্য সঠিক পথে অগ্রসর না হওয়া। কিয়ামত পর্যন্ত হয়ত কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে অনেকে। কেউ হয়তো উত্তর খুঁজে পাবে আর কেউ হয়তো উত্তর তো খুঁজবেই না বরং দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে। আসলেই কুরআনকে বুঝতে হলে পুরো কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। যেমন- আল্লাহর নাম রাহ্মান ও রাহীম আবার কাহ্হারও। এ তিনটি নামের অর্থ না জানলে এবং কোন পরিস্থিতিতে কোন নাম প্রযোজ্য তা না বুঝলে অনেক কিছুই বুঝতে ভুল হবে। এছাড়া কুরআন তো মানব রচিত অন্যান্য গতানুগতিক বইয়ের মতো নয়। সাধারণত যেসব বই, প্রবন্ধ ও রচনা আমরা পড়ে থাকি সেগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা দেয়া থাকে। অথচ কুরআনে এমনটি পাবেন না। হঠাৎ করে কেউ যদি কুরআনের অনুবাদ পড়তে শুরু করেন তাহলে প্রথমেই যে বিষয়টি প্রকট হয়ে দেখা দেবে তা হচ্ছে সুরার নামকরণের বাইরে অসংখ্য বিষয়ের বর্ণনা, হঠাৎ পট পরিবর্তন, পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে পরবর্তী আয়াতে সম্পূর্ণ নতুন কিছুর বর্ণনা। তাছাড়াও মনে হবে কিছু আয়াত নিষ্প্রয়োজন, কিছু আয়াত আরেক আয়াতের বিপক্ষে, কিছু আয়াত ঠিক নয় এবং কিছু আয়াত বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। (আমি এই বিষয়গুলিরও উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি এ বইতে) আগেই বলেছি প্রথম থেকেই তাফসীর পড়লে এ সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা নেই। কুরআনের প্রতিটি আয়াতই স্বতন্ত্র। আবার যেসব বিষয় সম্পর্কে আয়াতটিতে বক্তব্য রয়েছে উক্ত বিষয়েও গভীর জ্ঞান থাকা জরুরি। কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা একেবারেই ভ্রান্তিপূর্ণ। এর কারণ নিম্নরূপ-

১. **অজ্ঞতা-** কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানের বিশেষ অভাব। ব্যাখ্যা জানা তো দূরের কথা; অর্থই জানেন না অনেকে।

২. **অপপ্রচার-** সুপরিকল্পিতভাবে কুরআন তথা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সত্যকে বাদ দিয়ে ডাহা মিথ্যা ব্যাখ্যা করে প্রচার করা হচ্ছে। নিচে 'মরিস বুকাইলে'র বই থেকে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সালি' এর ষষ্ঠ খণ্ডের এমন একটি রচনার উদাহরণ তুলে ধরা হলো। 'গসপেল' বা সুসমাচার শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের সাথে সুসমাচারের (ইঞ্জিল ১-৪

www.nagorikpathagar.org

খণ্ডের) পার্থক্য তুলে ধরেছেন এভাবে, "সুসমাচারের লেখকবৃন্দ .... কস্মিনকালেও .... কুরআনের মত এই দাবি করে নাই যে, স্রষ্টা স্বয়ং অলৌকিক উপায়ে পয়গম্বরের নিকট একখানি আত্মজীবনী অবতীর্ণ করেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে কুরআন কিন্তু আদৌ কোন আত্মজীবনীমূলক কোন রচনা নয়, বরং কুরআন হলো মহান স্রষ্টার ওহী। লেখক যদি একটু কষ্ট করে কুরআনের যেকোন একটি অনুবাদও দেখে নিতেন তাহলে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন কুরআন সম্পর্কে তার ধারণা কতটা ভ্রান্তিপূর্ণ। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম আরও একটা উপায় অবলম্বন করেছে। এ ব্যাপারে মরিস বুকাইল বলেন, "প্রথম ইসলামে আমার আদৌ কোন বিশ্বাস ছিল না। লোকে মুসলিম বলতো না, বলতো মুহামেডান, অর্থাৎ বুঝানো হতো এ ধর্ম একজন মানুষ (মুহামেড) দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ার কারণে গডের (God) সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই- এ মিথ্যা ধারণা পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত।" তাছাড়া তারা আল্লাহকে মুসলমানদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এমনভাবে প্রচার করে- ভাবখানা এই যে, মুসলমানেরা যে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস রাখেন, তিনি খ্রিস্টানদের সৃষ্টিকর্তা (God) থেকে আলাদা। অথচ মুসলমানেরা আল্লাহ শব্দের দ্বারা হযরত মুসা (আ), হযরত ঈসা (আ) অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকুলের স্রষ্টাকেই বুঝায়। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এছাড়া পশ্চিমা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত ইতিহাস, বিকৃত মতামত প্রচার করা হচ্ছে। যার কারণে ওদেশে বসবাসরত লোকদের ইসলামের পথে অগ্রসর হওয়া ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা সহজ নয়। বরং ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবেরই উদয় হয়। সেখানে ইসলামকে নৈতিকতাহীন, গোঁড়ামি, সন্ত্রাসী ও ভীতির ধর্ম বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ করলে সহজেই অনুমান করা যায়, এ অভিযোগ কতটা সত্য আর কারা এ গুণের অধিকারী।

অভিযোগের জবাব

পবিত্র কুরআন স্বয়ং মহান স্রষ্টার বাণী বা ওহী। জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে, দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর। কুরআন নাযিলের সময় হতে আজ পর্যন্ত কুরআনের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ চলে আসছে। এই অভিযোগগুলো হয়তবা একই কথা কিংবা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কিছুটা নতুন ধরনের।

যেহেতু কুরআন মহান স্রষ্টারই বাণী যিনি সর্বজান্তা। তিনি ভাল করেই জানেন ভবিষ্যতে কি কি অভিযোগ আসবে। তাছাড়া কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ওহী গ্রন্থ এরপর স্রষ্টার কাছ থেকে আর কোন ওহী আসবে না। কাজেই অতীত,

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল কালের সকল অভিযোগেরই উত্তরও দিয়েছেন মহান স্রষ্টা এই মহাগ্রন্থে। এখন পর্যন্ত এমন কোন প্রশ্ন আসে নাই যার উত্তর এই মহাগ্রন্থে পাওয়া যায়নি। অনেক সময় উত্তর খুঁজে না পাওয়ার কারণ, আমাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা জানার জন্য তথ্য ও আবিষ্কারের অপেক্ষা। ডা. মরিস বুকাইল ঘোষণা করেন, "কুরআনে এমন একটি বর্ণনাও নেই যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে।"

কুরআন নাযিলের সময়কার অভিযোগের উত্তরে এমন সব সহজ-সরল আয়াত নাযিল হয়েছে যা সে সময়কার মানুষ অতি সহজে বুঝতে পেরেছে। এজন্য কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আদৌ প্রয়োজন হয় নাই।

অন্য দিকে বর্তমান বিজ্ঞান ও কম্পিউটার যুগের অভিযোগের উত্তরের জন্য কুরআনে রয়েছে এমন সব আয়াত যা বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও কম্পিউটারের ব্যাখ্যার ফলেই মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন কিভাবে এসব অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের অভিযোগের উত্তর দিয়েছে, তা-ই হচ্ছে এ বই এর আলোচ্য বিষয়। আমার সাথে একপাতা দু'পাতা করে চলুন না বইয়ের শেষ পর্যন্ত। ঠিক তখনই আপনার কাছে জানতে চাইব কুরআনের উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা? উত্তর পেয়েছেন কি পাননি? উত্তর যুগোপযোগী হয়েছে কি হয় নি? আমন্ত্রণ থাকল উপরোক্ত বিষয়ে আপনার নিরপেক্ষ অভিমত ব্যক্ত করার। আপনাদের সুচিন্তিত বিবেক কি রায় দেয়, তার অপেক্ষায়ই রইলাম।

কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর সরাসরি দেয়ার আগে কুরআন তথা এর প্রতিটি আয়াতই যে সত্য এর প্রমাণ পেশ করব প্রথমে। কারণ বিজ্ঞানের মতে, কোন কিছু পরীক্ষা করার আগে যে যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হবে তারই প্রথমে পরীক্ষা করে নিতে হয় ঐ যন্ত্রের কার্যকারিতা সঠিক কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। যন্ত্রই যদি ঠিকমত কাজ না করে তবে ফলাফল সঠিক হওয়া অসম্ভব। কাজেই কুরআন যদি সত্য প্রমাণ করতে পারি তবে আপনি এর প্রতিটি কথাই সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য। অতএব চলুন প্রথমে কুরআনের সত্যতার আলোচনায় যাই। তাই বলে আপনি কখনও মনে করবেন না যেন, আমি কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতে বসেছি এবং পরীক্ষায় প্রমাণিত হলেই বিশ্বাস করব বা ঈমান আনব (নাউযুবিল্লাহ)। না, এমন বুকের পাটা আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, কুরআনের প্রতিটি আয়াতই এর সত্যতার দলিল। কারণ এর এক আয়াত আরেক আয়াতের ব্যাখ্যা। এক আয়াতে প্রশ্ন আরেক আয়াত এর উত্তর। এত উচ্চাঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যিক মান, বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলির বিবরণ, বৈজ্ঞানিক তথ্য, যুগোপযোগী বিষয়ের বর্ণনা এমন নিখুঁতভাবে (Accurate) মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ দিতে একেবারেই অক্ষম। আবার তিনি ছাড়া অন্য

www.nagorikpathagar.org

কারো পক্ষেই কিয়ামত (সব সৃষ্টির ধ্বংস) পর্যন্ত তা (কুরআন) হুবহু রক্ষা করাও অসম্ভব। তাই এ দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখেছেন তিনি।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ - (الحجر : ٩)

'আমিই কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং অবশ্যই আমি উহার হেফাযতকারী (সংরক্ষক)।' (সূরা হিজর ১৫ ঃ আয়াত ৯)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (ط) تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ - (حم السجدة : ٤٢)

'কোন মিথ্যা উহাতে প্রবেশ করিবে না সম্মুখ হইতে কিংবা পশ্চাৎ হইতে। উহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসাসহ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।'

(সূরা হামীম-আস-সাজদা ৪১ঃ আয়াত ৪২)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا - (النساء : ٨٢)

'তবে তাহারা কি সতর্কতার সহিত কুরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি উহা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উৎস হইতে অবতীর্ণ হইত, তবে অবশ্যই উহাতে বহু অসামঞ্জস্য এবং অসংগতি থাকিত।' (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৮২)

মহান স্রষ্টার উপরোক্ত বক্তব্যই কুরআনের সত্যতার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু যাদের মনে বক্রতা আছে বা যাদের মনে এখনও কেন কেন প্রশ্নের উদয় হয় তাদের জন্য রয়েছে অনেক দলিল ও প্রমাণ।

কুরআনের সঠিকতা ও সত্যতার দলিল

নিম্নের আলোচ্য বিষয়সমূহই কুরআনের সত্যতা বা সঠিকতা নিরূপণের জন্য যথেষ্ট।

ক. কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা বা মেনে নেয়া।

খ. কুরআনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

গ. অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও সর্বকালের ঘটনাবলির বর্ণনা।

ঘ. বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ঃ কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আর কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে সত্যতা নিরূপণের সবচেয়ে উত্তম পন্থা। কিন্তু বিশ্বাস করার যুক্তি কি? যুক্তিবাদী মন হয়ত রুখে দাঁড়াবে- মানতে চাইবে না, এ কেমন অযৌক্তিক দাবি? যা দেখব না তা বিশ্বাস করব কেন? এ দাবি অযৌক্তিক ও অন্যায়! যারা যুক্তি ও চাক্ষুস দেখার এতটা ভক্ত তারা কি প্রমাণ ছাড়া দুনিয়ায় কিছুই বিশ্বাস করেন না? না দেখে আমরা কি দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম-ভালবাসা, বাতাস, গরম-ঠাণ্ডা বিশ্বাস করি না?

ড. ম্যারিট স্ট্যানলে কংডন তার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন-

"আমি অনেকের কাছেই চিন্তার যথার্থ রাসায়নিক ফর্মুলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। এর দৈর্ঘ্য কত সেঃ মিঃ, এর ওজন কত গ্রাম, এর রং দেখতে কেমন, কী তার গঠন ও আকার; একি চাপ- নাকি অভ্যন্তরীণ টান, কী তার কর্মক্ষেত্র, কোথায় তার অবস্থান, কী তার শক্তি, কী তার দ্রুতি?" - এর উত্তর জানা না থাকলেও চিন্তা বা ভাবনার অস্তিত্ব কি আমরা অস্বীকার করতে পারি?

না দেখেতো কত বৈজ্ঞানিক মতবাদ আমরা সবাই বিশ্বাস করি! পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার অসংখ্য মতবাদ (Theory) বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত না দেখে বা প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করেন। চন্দ্র-সূর্যের দূরত্ব, আলোর গতি, রোগজীবাণু ইত্যাদি কতজনে দেখে বিশ্বাস করেন? এছাড়া কোন উপায়েই কোনদিনই আমরা দেখতে পারব না বিদ্যুৎ, এক্স-রে, গামা-রে, লেসার-রে সহ আরও অনেক কিছু? এসব আমাদের চোখের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। অথচ আমরা কি দাবি করতে পারি এ সবের সুফল ভোগ করা থেকে আমরা বঞ্চিত? প্রতিদিনই কত এক্স-রে করা হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের জন্য। আর লেসার-রে দিয়ে কত অপারেশন করা হচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেহারা কেমন বা কি তার রং তা কি দেখতে পাওয়া যায়? যে বিগ ব্যাংগ বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্তমান বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, তা কি কেউ দেখতে পেয়েছে কোন দিন? গাছ কিভাবে পাতার ক্লোরোফিল, সূর্যের আলো, বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ও মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে শোষিত উপাদান সম্মিলিত করে খাদ্য তৈরি করে? তার সঠিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারেনি। অথচ উদ্ভিদের তৈরি খাদ্য খেয়ে সমগ্র মানবজাতি বেঁচে আছে।

এতক্ষণ বেশকিছু বর্ণনা দিয়েছি যা মানুষ দেখতে পায় না। অথচ ঐসব সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর জানা কি সম্ভব? আসলে মানুষ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞানী হতে পারে তারপর সে একেবারে অজ্ঞ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোনদিন লেখাপড়া করেনি বা গণনাও করতে পারে না সে একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু যে শুধুমাত্র ১০০ পর্যন্ত গণনা করতে পারে এরপর আর কিছুই গণনা করতে বা পড়তে পারে না, এমন

www.nagorikpathagar.org

দুজনের মধ্যে একজন একেবারেই অজ্ঞ আর একজন ১০০ গণনা করার পর অজ্ঞ। কাজেই ১০০ গণনা করার ক্ষমতার পর দুজনেই সমান। তেমনি পৃথিবীতে যে সবচেয়ে জ্ঞানী তার জ্ঞানের পরিসীমার পর একজন অশিক্ষিত এবং সে একসমান। মহাবিশ্বের অদৃশ্য জগতের আলোচনায় জানতে পারবেন, মাহবিশ্বে যে আলো আছে তার শতকরা এক ভাগেরও কম আলো আমাদের চোখের দৃষ্টিতে অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। বাকি নিরানব্বই ভাগের বেশি আলোই দেখা সম্ভব নয়, মানে অদৃশ্য।

এত গেল আলোর কথা। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাবিশ্বের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ বস্তু দেখা সম্ভব। বাকি ৯০ ভাগই রয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে। আবার দৃশ্যমান ১০ ভাগ বস্তু জগতের গ্যালাক্সির[২] সংখ্যা ১০০ কোটি। টেলিস্কোপের সাহায্যে যা দেখা যায় তার বেশির ভাগই খালি চোখে দেখা যায় না। সেগুলো চিরদিন মানুষের দৃষ্টির বাইরে থেকে যাবে.। কাজেই আমরা তেমন কিছুই দেখার ক্ষমতা রাখি না বরং বেশিরভাগই আমরা বিশ্বাস করে থাকি।

এমন হাজারো বিষয় না দেখে দৃঢ় বিশ্বাস করে আসছে বিজ্ঞানীগণ এবং সুধী সমাজ। অথচ অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে বিশ্ব প্রভু মহান স্রষ্টাকে অস্বীকার করছে অনেকে।

আপনার বাবা-মায়ের পরিচয়তো বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল। জন্মের মাধ্যমে আপনার পৃথিবীতে আগমন আর মৃত্যুর মাধ্যমে আপনাকে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে এসবই কি আপনি দেখে বিশ্বাস করেন? আমি যদি বলি, জন্ম ছাড়া আমি পৃথিবীতে এসেছি এবং আমার মৃত্যুও হবে না কোনদিন, তা কি আপনি আমাকে বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বুঝাতে বা দেখাতে পারবেন? অথচ এ দুটো ঘটনা আমরা যারা জন্মগ্রহণ করেছি তাদের জন্য প্রকাশ্য দিবালোকের মত সত্য নয় কি? তাই আমরা দেখিনি বা দেখতে পাই না বলে সবকিছু সত্য নয়, একি কোন যুক্তির কথা? অনেক দেশে আমরা যাইনি অথচ সে দেশ সম্পর্কে অনেক কিছুই আমরা বিশ্বাস করি, না দেখে। কাজেই বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের জীবনের অস্তিত্ব। আর অস্তিত্ব থেকে পরলোকে গমন। আমরা যে মরব তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে আমাদের জন্ম।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ (ال عمران : ١٨٥)

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

(সুরা আলে ইমরান ৩ঃ আয়াত ১৮৫)

---

[২] দৃশ্য ও অদৃশ্যমান অনুচ্ছেদে গ্যালাক্সি সম্বন্ধে বিস্তারিত দেখুন।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং কুরআনে বিশ্বাসের আহবান কি অবৈজ্ঞানিক? অযৌক্তিক? এখনও যারা কুরআনে বিশ্বাস আনতে পারেন নি তাদের জন্য আরও একটু এগিয়ে যাব পরবর্তী আলোচনায়।

কুরআন সংরক্ষণ (হিফাজত) ব্যবস্থা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন স্বয়ং মহান স্রষ্টার বাণী যা আজও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। কুরআন যে স্রষ্টার বাণী, মুহাম্মদ (সা) এর কথা নয় তার অনেক প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ হচ্ছে-

মুহাম্মদ (সা) এর নিজস্ব ভাষার হাদিসের সাথে কুরআনের তুলনা হয় না। কুরআনের ভাষা অনেক উন্নত এবং আজও কুরআন আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। শুধু তাই নয় কুরআনের সূরাসমূহের নাম, অবস্থান ও ক্রম বিন্যাস সবই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'লা জিবরাঈল (আ) মারফত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে নবী (সা) বা অন্য কারও কোনই হাত নেই। কুরআনের যখন যতটুকু নাযিল হত সাথে সাথে তা মুখস্থ করে ফেলতেন সাহাবীগণ (রা) এবং লিখে রাখতেন খেজুর পাতা, হাড়, চামড়া ও পাথর-খণ্ডের উপর। পরে সেসব একত্র করে কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। কুরআন শুরুই হয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে। এর প্রথমটি হল মুখস্থ করা আর দ্বিতীয়টি হল লিখে রাখা এবং এ দুটিই হচ্ছে সঠিক (আসল) হওয়ার প্রমাণ ।

হযরত ওসমান (রা) এর হাতে লেখা একখানা মাসহাফ (কপি) তাঁর নিজের কাছেই ছিল। যাকে "মাছহাফুল ইমাম" বলা হত। সারা জীবন এটি হযরত ওসমান (রা) এর কাছে ছিল, পরে তা হযরত আলী (রা) ও হযরত ইমাম হোসেনের হাতে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে তা স্পেনে এবং সর্বশেষ মরক্কোর রাজধানী ফাশে গিয়ে পৌঁছে। অবশ্য পরে আবার মদীনায় ফেরত আনা হয়। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মদীনা থেকে মাসহাফখানা তুরস্কের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে নেয়া হয় এবং আজও সেটি সেখানেই আছে। হযরত ওসমান (রা) এর স্বহস্তে লিখিত অপর একটি পাণ্ডুলিপি যার শেষে একথা লিখা আছে, "এটি লিখেছেন হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান"। বর্তমানে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে আছে। প্যারিসের 'বিবালিওর্থিক" ন্যাশনাল পাঠাগারে প্রাচীন কুরআনের যে অংশবিশেষ সংরক্ষিত আছে তা বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর। যা হোক আসল কথা এই যে, প্রাচীন কুরআনের যতগুলি খণ্ডের সন্ধান এ যাবত পাওয়া গেছে, তার সবগুলিই একই রকম। এসবের মধ্যে সামান্যতম অমিলও নেই।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম থেকেই মুসলমানদের মধ্যে প্রতিদিন কিছু কিছু করে কুরআন পড়ার ও শোনার নিয়ম চলে আসছে। ফলে কেউ মুখস্থ ভুল পড়লেও শ্রোতারা সহজেই তা সংশোধন করতে পারেন। কারণ কেউ কোন বিষয় বার বার শুনলে বা পড়লে তা প্রায় মুখস্থের মতই হয়ে যায়। নামাযে অবশ্যই কুরআন মুখস্ত পড়তে হয়। বিশেষ করে রমযানে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করা হয় 'তারাবী' নামাযে। যার ফলে বছরে অন্তত একবার সম্পূর্ণ কুরআন শুনার সুযোগ হয়। এভাবে প্রথম থেকেই মুখস্থ করা, লিখে রাখা, পড়া ও শোনার মাধ্যমে কুরআনকে সঠিক রাখার উপায় চালু হয়ে গেল। কিছুতেই কুরআন আর বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

কুরআনের ভাষা আরবি। বিশ্বের প্রায় শতকোটি মুসলমানের ধর্মীয় এবং সমগ্র আরব জাহানের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। এখনও এমন অনেক আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত আছেন যাদের মাতৃভাষাও আরবি, কিন্তু তারা মুসলিম নন। এমনকি অর্ধেক খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও লেবাননের রাষ্ট্রভাষা আরবি, এতদসত্ত্বেও কেউ আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ একটি আয়াতও তৈরি করতে পারে নি।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ
وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ (البقرة : ٢٣)

'আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর।' (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৩)

কুরআন বিশ্বের সবচেয়ে অধিক পঠিত গ্রন্থ। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করে রাখেন। এদেরকে হাফেজ বলা হয়। পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এভাবে কেউ মুখস্থ করে রাখে না বা এমন পদ্ধতিও নেই।

কুরআন মজিদ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে যদি কারও মনে সামান্যতম সংশয়ও থেকে থাকে তাহলে তিনি পৃথিবীর যে কোন দেশের কুরআনে হাফেজের পড়া শুনে এবং যে কোন দেশ থেকে কুরআনের যে কোন মাসহাফ (কপি) এনে মিলিয়ে দেখতে পারেন, কোন ভুল-ত্রুটি বা অমিল পাওয়া যায় কিনা? কুরআনের প্রথম লিখিত কপির সাথে যে কোন সময়ের মুদ্রিত কপির মধ্যে কোন অমিল পাবেন না। এটা কি প্রমাণ করে না কুরআন অবিকৃত অবস্থায় প্রথম থেকেই সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে? আল্লাহর ঘোষণা-

www.nagorikpathagar.org

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (ط) تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ـ (حم السجدة : ٤٢)

"কোন মিথ্যা উহাতে প্রবেশ করিবে না সম্মুখ হইতে কিংবা পশ্চাৎ হইতে। উহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।"

(সূরা হা-মীম- আস-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৪২)

এবার নিম্নে সংক্ষেপে কুরআন ছাড়া অন্য সব ধর্মগ্রন্থের সংরক্ষণ ব্যবস্থা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যার ফলে সহজেই বুঝতে পারবেন ঐ সব ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হওয়ার কারণ কি?

কুরআন ছাড়া অন্য যে সব কিতাব রয়েছে তার অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য। অল্প যে ক'টি পাওয়া যায় তাও তার মূল ভাষায় নয়। বর্তমানে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি যা পাওয়া যায়; সব গ্রন্থই মানব রচিত। হযরত মূসা (আ) এর উপর তাওরাত আর হযরত দাউদ (আ) উপর যবুর নাযিল হয়। এ দুটো কিতাবের নির্ভরযোগ্য কোন কপি পৃথিবীতে নেই। পরবর্তীকালে ইহুদি পণ্ডিতগণ এ দুই কিতাবের যতটুকু উদ্ধার করেছেন এবং শ্রুতি ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে যা লিখেছেন সেটাই বর্তমানে ইহুদি বাইবেল বা পুরাতন নিয়ম (Old Testament)। হযরত ঈসা (আ) এর উপর ইঞ্জিল কিতাব নাযিল হয় কিন্তু এর কোন নির্ভরযোগ্য কপিও পৃথিবীতে মজুদ নেই। হযরত ঈসা (আ) এর অন্তর্ধানের বহু বছর পর চারজন পাদ্রী বিভিন্ন সময় চারটি পৃথক Gospel লিখেন যার সমষ্টি বর্তমান বাইবেলের প্রাচীনতম নমুনা। এ বাইবেল সর্বপ্রথম গ্রীক ভাষায় লিখা হয়। অথচ হযরত ঈসা (আ) এর মাতৃভাষা ছিল এরামিক। হিব্রু, ল্যাটিন ও সংস্কৃত যদিও ধর্মীয় ভাষা, আজ এগুলো কোথাও কোন জাতি বা গোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসাবে চালু নেই। এসব ভাষা এখন কেবল গীর্জা ও মন্দিরের পুরোহিতগণই ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ এগুলো এখন মৃতভাষা (Dead language)।

মোট কথা, বর্তমানে একমাত্র কুরআনই নির্ভরযোগ্য ও অবিকৃত আসমানী গ্রন্থ আর বাকি সকল ধর্মগ্রন্থই বিকৃত ও মানব রচিত।

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য ঘটনার বর্ণনা

কুরআনে অনেক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যা কুরআনের সত্যতার অকাট্য দলিল। এর বেশিরভাগ বিষয়ই কুরআন নাযিলের

www.nagorikpathagar.org

সময়ে ছিল অজানা। পরবর্তীকালে এমন কি এখনকার অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার কুরআনের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞান যা নতুন আবিষ্কার (Invent) বলে দাবি করে বাহ্বা নিচ্ছে তা পবিত্র কুরআনে এসেছে ১৫০০ বছর পূর্বে। অতীতের এমন একটি ঘটনা হচ্ছে মিশরে হযরত মুসা (আ) এর সময়ে ফেরাউনের ঘটনা। নিম্নে অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেয়া হল -

অতীতকালের (কুরআন নাযিলের পূর্বের ফেরাউনের) বর্ণনা

হযরত মুসা (আ) একজন নবী ছিলেন। যখন তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে আরম্ভ করলেন তখন ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং কঠোরভাবে মূসা (আ) এর বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করল। মহান স্রষ্টা আল্লাহ জানালেন-

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا
(ط) حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ (ط) قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا
اِسْرَاۤئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - اٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ - فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً (ط) وَاِنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ - (يونس : ٩٠ - ٩٢)

"আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফেরাউন ও তাহার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন বলিল, 'আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাঁহাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" এখন! ইতিপূর্বেতো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল (খবর রাখে না)।

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৯০-৯২)

ডা. মরিস বুকাইল তার 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' বইতে ফেরাউন সম্পর্কে লিখেছেন, "সকল সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, লোরেট ১৮৯৮ সালে ফেরাউনের মমি (মৃত লাশ) রাজাদের উপত্যকা (King's valley) থিবিস থেকে আবিষ্কার করেন। সেখানে মমিটি শায়িত ছিল তিন হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে।"

www.nagorikpathagar.org

"১৯৭৫ সালের জুন মাসে মিশর সফর কালে আমার (মরিস বুকাইলের) সুপারিশক্রমে কর্তৃপক্ষ মমিটি বিশেষভাবে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ডা. আল মেলিজি ও ডা. রামসাইস মমির এক্সরে করেন এবং তার ভিত্তিতে তাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। ডা. মর্নিয়াবি পেট ও গলার কাছের একটি পথ দিয়ে এন্ডোসকোপির মাধ্যমে বুকের অভ্যন্তর পরীক্ষা করে দেখেন। [এটাই ছিল কোন মমির ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি (Endoscopy) প্রক্রিয়ার প্রথম ব্যবহার]। যার ফলে আমরা দেহের অভ্যন্তরের অবস্থা ভালভাবে দেখতে ও তার ছবি তুলতে সক্ষম হই। এছাড়া প্রফেসর সিকালডি একটি সাধারণ চিকিৎসা ও আইন শাস্ত্রীয় পরীক্ষা শুরু করেন। মমির দেহের অংশ পরীক্ষা করেন প্রফেসর মাইন্ট এবং ডা. ডুরিসন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে।"

"ফেরাউনের হাড়ের স্থানে স্থানে ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। তার মৃত্যু হয়েছে পানিতে ডুবে অথবা ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। ফেরাউনের মৃত্যু ও তার লাশ উদ্ধার যে আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এ মমিই ইহার সাক্ষ্য বহন করে। আর কুরআনের বর্ণনা মোতাবেক তার লাশ পরবর্তী মানুষের জন্য নিদর্শন হওয়ার নিমিত্তে আল্লাহর হুকুমে ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল।"

- মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা ফেরাউনের মৃতদেহ পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন। এ ঘোষণা কুরআনে দেয়ার ১৪০০ বছর পর্যন্ত ফেরাউনের মৃত লাশ কোথায় আছে কেউ জানত না। মাত্র ১০০ বছর আগে ১৮৯৮ সালে মানুষ এটা জানতে পেরেছে। এতদিন এটা ছিল মুসলমানদের বিশ্বাস ও ঈমানের দাবি। মরিস বুকাইল আরও লিখেছেন- "ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যারা আধুনিক তথ্যের সন্ধান করেন তারা কায়রো মিশরীয় জাদুঘরের রয়্যাল ম্যমিজ রুমে গেলেই ফেরাউনের লাশ সম্পর্কে আল কুরআনের আয়াতের বাস্তব চিত্র দেখতে পাবেন।"

বাইবেলে এ সম্বন্ধে কোন উক্তি না থাকায় এবং কুরআন অবতীর্ণের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ফেরাউনের দেহ সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত তথ্য আবিষ্কার না হওয়ায় খ্রিস্টান জাতি কুরআনের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রচার করার একটি বড় সুযোগ পেয়ে আসছিল। কিন্তু ফেরাউনের 'মমি' (সংরক্ষিত মৃত দেহ) আবিষ্কৃত হওয়ায় পবিত্র কুরআনের বাণীর সত্যতা এবং বাইবেলের অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়েছে।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ (النساء : ٨٢)

www.nagorikpathagar.org

'তবে কি তাহারা কুরআনে মন সংযোগ করে না? আর যদি ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত, তবে ইহার মধ্যে তাহারা বহু বৈসাদৃশ্য পাইত।' (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৮২)

এসব কি প্রমাণ করে না "কুরআন স্রষ্টারই বাণী?"

বর্তমান (কুরআন নাযিল হওয়াকালিন আবু লাহাব ও মি'রাজের) বর্ণনা

সূরা লাহাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঘোষণা দিলেন-

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَّتَبَّ (ط) مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ـ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَأَتُهُ (ط) حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِى جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ـ (لهب)

'ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও। তাহার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই। অচিরেই সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। তার স্ত্রী ইন্ধন বহনকারিণীও। (দোযখে) তার গলায় পাকানো রশি থাকিবে।' (সূরা লাহাব ১১১ ঃ সম্পূর্ণ সূরা)

এই সূরায় ভবিষ্যৎ বাণী হচ্ছে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী দোযখের আগুনে জ্বলবে। কারণ তারা ঈমান না নিয়ে মারা যাবে। আবু লাহাব ছিল মুহাম্মদ (সা) এর চাচা। যখনই কেউ মুহাম্মদ (সা) এর কাছ থেকে ফিরে আসত তখনই আবু লাহাব তার কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা) কি বলেছেন তা জেনে নিত এবং মুহাম্মদ (সা) যা বলত ঠিক তার উল্টোটা করত। উপরোক্ত সূরা নাযিল হয়েছে আবু লাহাবের মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে। কাজেই সে (আবু লাহাব) কুরআন মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যদি একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শুধু বলত যে "আমি ঈমান এনেছি। দেখ, কুরআন মিথ্যা দাবি করেছে।" একথা, বলা কত সহজ ছিল তার পক্ষে কুরআন মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু যেহেতু এটা মহান স্রষ্টারই বাণী, যিনি ভবিষ্যৎ জান্তা। অতএব আবু লাহাব উক্ত অভিনয়টুকুও যে করবে না তা মহান স্রষ্টা ভালভাবেই জানতেন।

এসব কি প্রমাণ করে না মহান স্রষ্টার বাণী কুরআন সত্য?

لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ (يونس : ٦٤)

'আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।'

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬৪)

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (ط) تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ـ (حم السجدة : ٤٢)

'কোন মিথ্যা উহাতে প্রবেশ করিবে না সম্মুখ হইতে কিংবা পশ্চাৎ হইতে। উহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।'

(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৪২)

কুরআন নাযিলের সময়ে যা ছিল অবিশ্বাস্য- আজ তা আদৌ অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব মনে হয় না। এমনি একটি ঘটনা হচ্ছে **মি'রাজের ঘটনা**।

একরাতে মুহাম্মদ (সা) মহাশূন্যের বিশাল পথ অতিক্রম করে স্রষ্টার সাথে কথা বলে ফিরে এসেছেন। এ ঘটনাকে মি'রাজ বলে। সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা'লা ঘোষণা দিয়েছেন-

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ
الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا (ط) اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

(بنى اسرائيل : ١)

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করাইয়াছিলেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাঁহাকে আমার নিদর্শন (কুদরত) দেখাইবার জন্য । নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা।"

(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত ১)

উপরোক্ত আয়াতে মুহাম্মদ (সা) এর শুধুমাত্র মাসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) থেকে মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা এসেছে। কুরআনে আর বেশি কিছু না থাকলেও হাদিসে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে ২৫ জন সাহাবীর বর্ণনা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আশ্রাফ আলী থানভী ও ইবনে কাসীরের তাফসীরের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ- মুহাম্মদ (সা) মি'রাজ সফর করেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে নয়। জিব্রাঈল (আ) মুহাম্মদ (সা) কে মক্কা মুকাররামা থেকে বোরাক যোগে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে "সিঁড়ি'র সাহায্যে সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছান। অবশ্য মুহাম্মদ (সা) কে কি ধরনের সিড়ি দিয়ে মহান স্রষ্টা ঊর্ধ্বাকাশে নিয়েছেন তা তিনিই ভাল জানেন।

বর্তমানে মানুষ চলন্ত বৈদ্যুতিক সিঁড়ির সাহায্যে ঘর, বাড়ি ও দোকানে উঠানামা করে অতি সহজেই। এক ধরনের সিঁড়ির সাহায্যে এখন মহাশূন্যেও যাবে বলে আমেরিকার নাসার (NASA) বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করেছেন। গত ২৭-৪-২০০২ তারিখে ইনকিলাব পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠায় একটা খবর ছাপানো হয়েছে। তা হুবহু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

www.nagorikpathagar.org

আসছে আকাশে উঠার সিঁড়ি

"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর সাফল্যের এই যুগে মানুষ যখন ক্রমশ সকল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে তখন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) এই সুসংবাদ দিয়েছে বিশ্ববাসীকে যে, অতিদ্রুত মানুষকে মহাকাশে নেয়ার জন্য লিফট তৈরি করা হচ্ছে; আর এর নাম তারা লিফট না বলে মহাকাশে ওঠার সিঁড়িই বলতে বেশি আগ্রহী। এটি তৈরি করবে 'ওটিস এলিভেটর' কোম্পানি নামক এক প্রতিষ্ঠান। এ কাজে তাদের লাগতে পারে বেশ ক'বছর। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই লিফটগুলো হবে মূলত রকেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং এদের গতিবেগ রকেটের মতই। তবে এতে লোকজনের আরোহণের পর বোতাম টিপলেই এর যাত্রা শুরু হবে এবং দেখা যাবে চোখের পলকে এটি মহাশূন্যের নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছে যাবে।"

-মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম

সিদরাতুল মুনতাহা থেকে নবীজী 'রফরফ' যোগে একাকী আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন। এখানে ৩টি প্রশ্ন প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে-

ক. তিনি জাগ্রত গিয়েছেন না স্বপ্নে গিয়েছেন?

খ. সম্পূর্ণ পথ তো ১টি যানবাহনেই যেতে পারতেন। ৩টি যানবাহন ব্যবহার করলেন কেন?

গ. কি করে মুহাম্মদ (সা) এত কম সময়ে এত দীর্ঘ পথ ঘুরে আসলেন?

স্বপ্নে যাওয়ার কথা হলেতো কোন প্রশ্নই উঠত না। কারণ মানুষ স্বপ্নেতো কত কিছুই দেখে। আসলে তিনটি প্রশ্নই স্বল্প চিন্তার ফল। মুহাম্মদ (সা) যখন এ ঘটনা প্রকাশ করলেন তখন অমুসলিমরা মিথ্যারোপ এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল। এমনকি কিছু নওমুসলিমও এ সংবাদ শুনে ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে ফেললেন। কিন্তু বর্তমানে রকেট আবিষ্কারের ফলে কেউ আর একে অসম্ভব বলে মনে করেন না। অথচ সে যুগে এক রাতে মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসা যেয়ে ফিরে আসাটাই অসম্ভব মনে করেছেন অনেকে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অবশ্যই সর্বময় ক্ষমতাবান মহান স্রষ্টা ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ যাত্রা একটি যানবাহনের মাধ্যমে সম্পন্ন করাতে পারতেন। কিন্তু কুরআন হচ্ছে হেদায়েতের কিতাব। তাই আল্লাহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে এবং তা জেনে হেদায়েত পেতে পারে।

مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ (المائدة : ٦)

www.nagorikpathagar.org

'আল্লাহ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না; বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

(সূরা মায়িদা ৫ ঃ আয়াত ৬)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ - (القمر : ١٧)

'কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (সূরা কামার ৫৪ ঃ আয়াত ১৭)

আগেই বলেছি, কুরআন নাযিলের সময়ে যা ছিল অবিশ্বাস্য। বর্তমানে বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতে তা হয়েছে বাস্তব সত্য। এমনি একটি ঘটনা হচ্ছে- মি'রাজ। মি'রাজে পৃথক পৃথক ৩টি যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভবত সহজে মানুষকে বুঝাবার জন্য। নিম্নে সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা দেয়া হল।

এ যুগে যাতায়াতের বাহন হচ্ছে- পানিতে লঞ্চ-স্টিমার, ভূপৃষ্ঠে ট্রেন-গাড়ি আর আকাশপথে প্লেন-রকেট ইত্যাদি। অবশ্য এখন ভূপৃষ্ঠে একস্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত যেতে হলে ব্যবহার করা হয় প্লেন। প্লেন চলে বাতাসের সাহায্যে নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে (প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে)। প্লেন প্রথমে বাইরে থেকে বাতাস টেনে নেয়। পরে ঐ বাতাসই জোরে পিছনের দিকে নির্গত করে। এই নির্গত বাতাসের ধাক্কায় প্লেন সামনের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু যেখানে বাতাস নেই সেখানে প্লেন চলতে পারে না। অন্যদিকে রকেট বাতাসের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি চলে নিজের শক্তিতে। কাজেই রকেট বায়ুমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের বাইরেও চলতে পারে। কিন্তু রকেট অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে চলে বলে মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসার এত সামান্য পথ রকেটে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ রকেট উঠেই নামতে পারে না। এ দূরত্ব রকেটের জন্য কয়েক সেকেণ্ডের পথ মাত্র। রকেট মহাশূন্যের বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার পর পৃথিবীতে ফিরে আসে। আবার এই রকেটও হয়ত মহাবিশ্বের বিশাল তারকাদের মাধ্যকর্ষণের সীমানা অতিক্রম করার পর অকেজো হয়ে যাবে। আর কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না। যেমনি বাতাস শূন্য স্থানে প্লেন অকেজো। এই নির্দিষ্ট সীমার পর আরশে আযীমে যেতে হলে অন্য ক্ষমতা সম্পন্ন যানবাহনের প্রয়োজন, যা আমাদের জানা নেই। হয়ত ভবিষ্যতে মানুষ তা জানতে পারবে, হয়তবা পারবে না। এটা নির্ভর করে কতটুকু জ্ঞান ও ক্ষমতা মহান স্রষ্টা মানুষকে দান করবেন তার উপর। যাক, বলছিলাম নবীজীর (সা) মি'রাজে যাত্রার যানবাহনের কথা। হয়ত মক্কা থেকে প্লেনের অনুরূপ 'বোরাকে' করে যা কম দূরত্বে নামতে পারে তা দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে, সেখান থেকে রকেটের মত ক্ষমতাসম্পন্ন সিঁড়ির সাহায্যে সিদরাতুল মুনতাহা এবং সবশেষে আমাদের চিন্তা, জ্ঞান ও জানার ক্ষমতার বাইরের ক্ষমতাসম্পন্ন যানবাহনে করে

www.nagorikpathagar.org

নবীজীকে একা আল্লাহ তা'লা তাঁর আরশে আযীমে নিয়েছেন। এসব আমাদের মানবীয় জ্ঞানের সীমারেখা মাত্র। [অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন- কেন মি'রাজ যাত্রায় নবীজী (সা) কে ৩টি পরিবহনে করে নিয়েছিলেন]।

এত কম সময়ে মহান স্রষ্টা মুহাম্মদ (সা) কে মি'রাজ করিয়েছেন তা যারা খাঁটি ঈমানদার তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা অতি সহজ। কিন্তু যাদের মন দুর্বল এবং স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না শুধু তারাই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। বিশ্বাস করতে চায় না। ঈমানদারদের বিশ্বাস হচ্ছে, মহান স্রষ্টা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে করতে পারেন না এমন কোন কাজ নেই। আমরাই নিয়মের অধীন। আমাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমিত বলে আমাদের মনে এত সন্দেহ, এত প্রশ্ন। বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রমাণ করছে অতি অল্প সময়ে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হওয়া অবশ্যই সম্ভব। নিম্নে সংক্ষেপে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন। সূর্য পরিবারের প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে একই সময়ে প্রদক্ষিণ করতে পারে না বলে প্রতিটি গ্রহের বছরের দীর্ঘতাও বিভিন্ন। যেমন-

গ্রহের নাম	**পৃথিবীর সময় হিসাবে বছরের দীর্ঘতা**
বুধ	৮৮ দিন
শুক্র	২২৫দিন
পৃথিবী	৩৬৫ দিন
মঙ্গল	৬৮৭ দিন
বৃহস্পতি	১২ বছর
শনি	২৯ বছর ৬ মাস
ইউরেনাস	৮৪ বছর
নেপচুন	১৬৫ বছর
প্লুটো	২৪৮ বছর
কোয়ার	২৮৮ বছর

প্রতিটি গ্রহের সময়- সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ও বছর পৃথিবীর অনুরূপ হবে না। "A long time in one planet is no time in another." আবার ছায়াপথ গ্যালাক্সির একদিন পৃথিবীর হিসাবে ২২০ মিলিয়ন বছর।

আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু যখন আলোর গতিতে চলে সময় তখন স্থির হয়ে পড়ে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'মি'রাজে আল্লাহর দরবারে আমি ২৭ বছর অবস্থান করেছি।' এ কথার উপর অনেকেই তখন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। কারণ নবীজী (সা) মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর দেখেছেন তাঁর বিছানায় তখনো উষ্ণতা বিরাজ করছে এবং ওযুর পানি গড়াগড়ি খাচ্ছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে যার দূরত্ব ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। সেখান লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীর জন্য Zero Time।

www.nagorikpathagar.org

বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে। ফলে আমরা বস্তুটিকে স্পষ্টভাবে দেখি। এ আলো আমাদের চোখে এসে পৌঁছতে নিশ্চিত কিছু সময় লাগে। কারণ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০০০০ কিঃ মিঃ। কাজেই যে মুহূর্তে কোন ঘটনা ঘটছে বলে আমরা মনে করি সে-ই মুহূর্তে সেটা ঘটছে তা কিন্তু নয়। তা পূর্বেই ঘটে গেছে। তবে কত পূর্বে ঘটেছে তা নির্ভর করে দূরত্বের উপর। ৩০০০০০ কিঃ মিঃ দূরে ঘটলে সে ঘটনা আমরা দেখব ১ সেকেন্ড পরে। এ হিসেবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ কিঃ মিঃ দূরে ঘটলে ১ মিনিট পর আর ১০৮ কোটি কিঃ মিঃ দূরে ঘটলে ১ ঘণ্টা পরে দেখব। আমরা আকাশে অনেক নক্ষত্র দেখি, এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি এত দূরত্বে অবস্থিত যে তাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যায়। সে লক্ষ লক্ষ বছরগুলো আমাদের জন্য ভবিষ্যৎকাল। আর নক্ষত্রদের জন্য বর্তমান কিংবা অতীত কাল। বর্তমানে আমরা যে বিশ্বজগত দেখছি তা কি এখনো বিদ্যমান আছে! এ ক্ষেত্রে আমরা কি বলব।

যেমন, আমরা সকলে অবগত আছি, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। এ যুদ্ধে যারা সামনে ছিল তারা সবাই দেখেছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিঃ মিঃ দূরে যে গ্রহ আছে তাতে ২৪৬ বছরের ব্যবধানের মধ্যে এখনো আলোকচিত্র হয়ত পৌঁছেনি। কিন্তু যে গ্রহে আলোকচিত্র পৌঁছবে ২৪৬ বছরে। তারা দেখবে যে পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছে। তাহলে ঐ ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্তমান অতিক্রম করে অতীত হয়েছে। অথচ অন্য গ্রহের জন্য এখনও ভবিষ্যৎ কাল। তাই সময় একটি আপেক্ষিক ধারণা মাত্র।

অতএব, আমাদের হিসাব মতে মহান আল্লাহর সৃষ্ট জগতসমূহ পরিদর্শনে নবীজীর (সা) ২৭ বছর সময় লেগেছিল।

ভবিষ্যতের (কুরআন নাযিলের পরের মহাশূন্যাভিযানের) বর্ণনা

কুরআনে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই মহান স্রষ্টা ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা) কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর কুরআন নাযিলের সময়ে যা ছিল মানুষের অজানা, ভবিষ্যৎ বাণী। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে তা আজ সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। এমনই ঘটনা হচ্ছে প্লেন ও রকেট আবিষ্কার। কুরআন নাযিলের সময় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে একদিন মানুষ বিমানে আকাশপথে এক স্থান হতে আরেক স্থানে যাতায়াত করবে। আর মহাশূন্য অভিযানের কথার তো প্রশ্নই উঠে না।

অথচ বর্তমানে নবী কেন, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও মহাশূন্যাভিযানকে অসম্ভব বলে কেউ মনে করে না। এখন নভোচারীরা অহরহই

www.nagorikpathagar.org

মহাশূন্যাভিযানে যাচ্ছে। মানুষ যে একদিন মহাশূন্যে ভ্রমণ করবে তার ভবিষ্যৎ বাণীও কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। সূরা আর রাহ্‌মানে মহান স্রষ্টা জানালেন-

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ـ (الرحمن : ٣٣)

"হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না শক্তি (সামর্থ্য) অর্জন ব্যতিরেকে।'

(সূরা আর রাহ্‌মান ৫৫ ঃ আয়াত ৩৩)

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ـ (الانشقاق : ١٩)

"তোমরা অবশ্যই (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) ধাপে ধাপে উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।" (সূরা ইনশিকাক ৮৪ ঃ আয়াত ১৯)

এখানে মহান স্রষ্টার দেয়া বুদ্ধিমত্তা ও আবিষ্কারের ক্ষমতাবলে মানুষ একদিন মহাশূন্য জয় করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাশূন্য অভিযান পরিচালনা করতে যে বিপুল দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এ দক্ষতা ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করেছে মানুষ সকল জ্ঞানের অধিকারী মহান স্রষ্টার দেয়া জ্ঞান থেকে। সূরা হিজরে ঘোষণা দেয়া হয়েছে-

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ـ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ـ (الحجر : ١٤-١٥)

যদি আকাশের দরজা খুলিয়া দেই এবং উহারা সারাদিন যদি উহাতে আরোহণ করিতে থাকে, তবুও উহারা বলিবে, 'আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হইয়াছে নতুবা আমরা জাদুগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

(সূরা হিজর ১৫ ঃ আয়াত ১৪-১৫)

নভোচারীগণ এ যাবত ঠিক একই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন মহাশূন্য থেকে ফিরে এসে। কারণ, বায়ুমণ্ডল সূর্যের আলোর নীল রং ছাড়া বাকি ৬টা রং শুষে নেয় আর নীলকে ছড়িয়ে দেয়। কাজেই পৃথিবী থেকে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল না থাকায় চাঁদকে তার নিজস্ব রং এ দেখা যায়। নভোচারীদের চোখে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অভিনব -অভূতপূর্ব। এক্ষেত্রে কুরআনের বাণীর সাথে নভোচারীদের বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত ও হতবাক হয়ে যেতে হয়। কাজেই কুরআনের এই ভবিষ্যৎবাণী কোন মতেই ১৫০০ বছর পূর্বের একজন সাধারণ মানুষের বর্ণনা হতে পারে না; তবে এসব কার বাণী? মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নয় কি?

www.nagorikpathagar.org

সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য

ইয়াহুদি ও মুশরিক এরা সবাই মুসলমানদের শত্রু। ইসলামের প্রারম্ভ থেকে তারা মুসলমানদের শত্রুতা করে আসছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন হবে না। মহান স্রষ্টা জানালেন-

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

"অবশ্যই মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদি ও মুশরিকদিগকে তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে।" (সূরা মায়িদা ৫ ঃ আয়াত ৮২)

কুরআন নাযিল হয়েছে প্রায় ১৫০০ বছর হলো। আজ পর্যন্ত উক্ত আয়াতটি আমাদের কাছে দিবালোকের মত সত্য। এর এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি। কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য উপরোক্ত জাতি সমূহ যদি পরিবর্তন হয়ে মুসলমানদের প্রতি সুবিচার, সুব্যবহার ও একটু দয়াবান হয়ে বলত যে, "দেখ কুরআন আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে।" কিন্তু একদিনের জন্যও তা সম্ভব হয়েছে কি? মহান স্রষ্টা ভালো করেই জানেন এটি কোনদিন সম্ভব হবে না। তাই তিনি ও উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন।

এতক্ষণ যে সব দলিল আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে কুরআন সত্য। এ গ্রন্থ স্রষ্টা ছাড়া আর কারও বাণী হতে পারে না। কাজেই কুরআনের সব বর্ণনাই সত্য। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন-

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ (ط) تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ـ (حم السجدة : ٤٢)

"কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না- অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।"

(সূরা হা-মীম-আস্-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৪২)

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (ط) مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ (ط) فَارْجِعِ الْبَصَرَ (لا) هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ـ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ـ (الملك : ٣-٤)

www.nagorikpathagar.org

"দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কখনও কোন অসংগতি দেখিতে পাইবে না। তোমরা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেখ, তেমন কিছু (অসংগতি) দেখিতে পাইয়াছ কি? অতঃপর আবারও তোমার দৃষ্টিকে নিক্ষিপ্ত কর এবং আবারও। তোমার দৃষ্টি তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করিবে ব্যর্থ, ক্লান্ত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়ে।" (সূরা মূলক ৬৭ ঃ আয়াত ৩-৪)

আজ পর্যন্ত যে মহাগ্রন্থের একটি অক্ষর বা শব্দের কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটেনি- কী হতে পারে তার অর্থ? কত অপূর্ব যে বিগত ১৫০০ বছর ধরে এ সত্য রক্ষিত হয়ে চলছে-

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ (ط) ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - (يونس : ٦٤)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহা সাফল্য।"

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬৪)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ (لقمن : ٣٠)

"এগুলিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদের আহবান করে তাহা মিথ্যা।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ৩০)

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ (ط) وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ - (الصف : ٨)

"উহারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ তাঁহার জ্যোতির্ময় জ্ঞানকে পূর্ণতা প্রদান করিবেন, যদিও কাফেররা উহা অপছন্দ করে।"

(সূরা সাফ্ফ ৬১ ঃ আয়াত ৮)

www.nagorikpathagar.org

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

মানব জাতির হেদায়তের জন্য মহান স্রষ্টা নাযিল করেছেন আল কুরআন। এতে প্রায় ৭৫০টি আয়াত আছে বিজ্ঞান সম্পর্কীয়। কিন্তু কুরআন কোন বিজ্ঞানের বই নয় বা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্যও অবতীর্ণ হয়নি। এসব আয়াতের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা মানুষকে ঈমান, কিয়ামত, হাশরের মাঠ, পুনরুত্থান, বেহেশ্‌ত - দোযখের অস্তিত্ব এবং মহাবিশ্বের যাবতীয় বিষয়ে (অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) সুস্পষ্ট প্রমাণ ও জ্ঞান দান করেন। যাতে মানুষ হেদায়েত পেতে পারে। কিন্তু কথায় আছে "বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল।" আজ যা সত্য বলে গৃহীত কাল তা বদলে যায়- কথাটি সত্য। আসলে কি বদলায়? থিওরি বদলায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত সত্য, তা বদলায় না। ধর্মের মোকাবিলায় ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সত্যের কথাই বলছি- থিওরির কথা নয়। (থিওরি হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া চিন্তা বা কল্পনা থেকে কোন কিছুর প্রতি দৃঢ় ধারণা করা বা মত পোষণ করা। কাজেই থিওরি পরিবর্তনশীল)। কুরআনের অনেক বাণী ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতকাল যাবত এসব আয়াতের অর্থ এবং ব্যাখ্যা অনেকেরই জানা ছিল না। ইদানীং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে ঐসব আয়াতের সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা এবং বুঝা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

মহাবিশ্বের সৃষ্টির আলোচনায় যাওয়ার আগে বুঝতে হবে মহাবিশ্ব, সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাকে বলে?

মহাবিশ্ব ঃ দৃষ্টি যেখানে শেষ (যেহেতু দৃশ্যমান জগৎ মহাবিশ্বের তুলনায় কিছুই না) সেখান হতে আরম্ভ বা শুরু হয়েছে এক সীমাহীন অসীম মহাবিশ্বের মহাসমুদ্র যার কোন কুলকিনারা নেই। কোন জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি বা প্রযুক্তি জানতে পারে নি এর শেষ সীমানা কোথায়? আর পারবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিকেরা। এ নিয়ে আলোচনা থাকবে পরবর্তী অধ্যায়ে ইন্‌শাআল্লাহ।

সৃষ্টি ঃ সৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি মহাবিশ্বে (পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে) গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নিহারীকা গ্যালাক্সি ইত্যাদি এবং এদের মধ্যে ও এদের চারপার্শ্বে যত জড় ও জীব বিদ্যমান তা-ই হচ্ছে সৃষ্টি।

স্রষ্টা ঃ যিনি উপরোক্ত বস্তুসমূহ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে অর্থাৎ পূর্বে আদৌ ছিল না এমন নূতন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনিই স্রষ্টা।

www.nagorikpathagar.org

কাজেই রাইট ব্রাদারসদ্বয় প্রথমে উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছেন বলে তারা স্রষ্টা নন। উড়োজাহাজের যাবতীয় উপাদান পূর্বে অস্তিত্বে ছিল না এমন বস্তু দিয়ে যদি তৈরি করতে পারতেন তাহলে তাদেরকে স্রষ্টা বলা যেত। এমনিভাবে যারা রেডিও, টিভি, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, কম্পিউটার, রকেট, যা-ই তৈরি করেন না কেন, কেউই স্রষ্টা নন- তারা আবিষ্কারক (Discoverer) মাত্র। আবার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির অনেক নিয়ম আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন- নিউটন, গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস এমন আরো অনেকে। তারা যেসব নিয়ম, বিধান (Law) আবিষ্কার করেছেন তা সৃষ্টির প্রথম থেকেই অর্থাৎ আবিষ্কারের পূর্বেও যা ছিল আবিষ্কারের পরেও তাই আছে এবং আবিষ্কার না করলেও তাই থাকত। অতএব তারা ঐসব নিয়মের আবিষ্কারক মাত্র। নিয়ম তৈরির স্রষ্টা বা বিধাতা নন। আজ সারা বিশ্ব ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আবিষ্কারকদেরকে তাদের আবিষ্কারের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। তাদের নাম অনুসারে Law এর নামকরণ করে তা মেনে নিচ্ছে বিনাপ্রশ্নে। অথচ যিনি এ নিয়ম করে দিলেন, সে বিধাতার আইন (Law) না বলে বা তাঁর কথা স্মরণ না করে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করান নানা অভিযোগ। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? মহান স্রষ্টা বলেন-

اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ـ (الاعراف : ٢٨، يونس : ٦٨)

"তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?"

(সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ২৮, সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬৮)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ـ

(لقمن : ٢٠)

"মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

(সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ২০)

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ
(ط) اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ (حم السجدة : ٥٣)

"আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করিব, বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই

www.nagorikpathagar.org

(আল-কুরআন) সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত? (সূরা হা-মীম- আস-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৫৩)

মহাবিশ্বের আরম্ভ ঃ এটা কি প্রথম থেকেই এমন ছিল? নাকি মহাবিশ্ব নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে অথবা কেউ একে সৃষ্টি করেছে? সৃষ্টি যদি হয়েই থাকে তবে কিভাবে বা কে একে সৃষ্টি করেছেন? সাম্প্রতিক আবিষ্কার এসব প্রশ্ন ও কল্প-কাহিনীর উত্তর দিয়ে কুরআনের কথাই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে বলা যায়, অতীতে গালাক্সিগুলো পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। এভাবে যদি ক্রমান্বয়ে অতীতের দিকে যাওয়া যায়, তবে দেখা যাবে এক সময় সমস্ত গ্যালাক্সি পরস্পরের সাথে মিলিত অবস্থায় ছিল। অতএব বৈজ্ঞানিকগণ যখনই দেখলেন এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে তখনই ব্যাখ্যা দিলেন, যেহেতু মহাবিশ্ব সর্বদা সম্প্রসারিত হচ্ছে সেহেতু কোন এক কালে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের খুব নিকটে ছিল। শুধু নিকটেই নয়, সৃষ্টির শুরুতে মাহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সবকিছু ধোঁয়া আকারে এক বিন্দুতে মিলিত ছিল যা এখন দূরে সরে যাচ্ছে। আল্লাহর ঘোষণা-

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ـ (حم السجدة : ١١)

"অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মন দিলেন তখন তাহা ধোঁয়া অবস্থায় ছিল; পরে তিনি আসমান ও যমিনকে বলিলেন, আস, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, তাহারা বলিল, আমরা একান্ত অনুগতভাবেই আসিলাম।"

(সূরা হা-মীম-আস-সিজদা ৪১ ঃ আয়াত ১১)

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ (الانبياء : ٣٠)

অর্থ ঃ অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সংযুক্ত ছিল; অতঃপর এদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি।

(সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৩০)

কুরআন নাযিলের সময় একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এসব জানা কি সম্ভব ছিল যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে সবকিছু ধোঁয়া আকারে এক বিন্দুতে মিলিত ছিল? উপরোক্ত আয়াত কি প্রমাণ করে না যে কুরআন মহান স্রষ্টারই বাণী?

www.nagorikpathagar.org

বিগ ব্যাংগ (Big Bang) কি?

বৈজ্ঞানিকদের মতে এখন থেকে ১৫ বিলিয়ন (মহাপদ্মকাল) বছর পূর্বে কিছুই ছিল না তখন বিরাজ করতো শুধু শূন্যতা। হঠাৎ এই শূন্যতার মাঝে এক মহাসূক্ষ্মতম সময়ে সংঘটিত হল এক মহাবিস্ফোরণ। একেই বিগ ব্যাংগ (Big - Bang) বলে। **কিভাবে বিগ ব্যাংগ বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বটির নামকরণ হল-**

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব প্রথম প্রস্তাব করা হয় ১৯২০ দশকে। কিন্তু তখন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সহ অনেকেই এর বিপক্ষে রায় দেন। কিন্তু রুশ গণিত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান এবং তারও ক'বছর পর ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেমাইত্রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে একদা মহাবিশ্ব এক বিন্দুতে আবদ্ধ ছিল। ঠিক এর দু'বছর পর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল দেখতে পেলেন দূরবর্তী নীহারিকা গুলোর আলো লাল তরঙ্গের দিকে সরে যাচ্ছে। আর লাল তরঙ্গের দিকে সরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নীহারিকাগুলো দূরে সরে যাওয়া, মানে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়া। এরপরও সবাই একথাটা মানল না। এমনকি ব্রিটিশ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফ্রেডহয়েল বিশ্বাস করতেন, যে মহাবিশ্বের কোন সূচনা ছিল না। এটা স্থির অবস্থায় রয়ে গেছে। বিস্ফোরণের আকারে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা তিনি ঠাট্টা করে নাম দিলেন "বিগ ব্যাংগ" (Big মানে বিরাট, Bang মানে আকস্মিক উচ্চ শব্দ)। আর এ নামটাই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হ'ল। এই বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল বস্তু, শক্তি ও সময়। বেলুনের মত ফুলতে ফুলতে প্রায় ২০ বিলিয়ন (মহাপদ্ম) আলোক বছর ব্যাসের আকার ধারণ করেছে বর্তমান মহাবিশ্ব। যেমন কোন বেলুনকে ফুলালে এর উপরের দাগ বা ফোটাগুলি দূরে সরে যায়। তেমনি এক একটি দাগ বা ফোঁটা যেন এক একটি ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। এমনিভাবে ছায়াপথগুলি (Galaxy) ও দূরে সরে যাচ্ছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ـ (الذريت : ٤٧)

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতার বলে এবং আমি অবশ্যই উহার সম্প্রসারণকারী।" (সুরা যারিয়াত ৫১ ঃ আয়াত ৪৭)

www.nagorikpathagar.org

কুরআন ও বিজ্ঞানের মতে ছয়দিনে (পর্যায়ে) মহাবিশ্বের সৃষ্টি

ভাবতেই অবাক লাগে (বিজ্ঞানের দাবী অনুসারে) এতবড় একটা মহাবিশ্ব যার কোন কুল-কিনারা নেই সেই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময় ব্যাস ছিল ১ লিখে তার সমানে ৩৩ টি শূন্য বসালে যে বিপুল সংখ্যা হয় তা দিয়ে ১ সেন্টিমিটারকে ভাগ দিলে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পাওয়া যায় তার সমান (১ সে. মি. ÷ ১০^{৩৩})

প্রথম পর্যায় (প্রথম ইয়াওম) ঃ এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে মহাবিশ্বের জন্ম নিতে যে সময় লেগেছিল তা হচ্ছে ১ সেকেন্ডকে ১ এর সামনে ৪৩টি শূন্য বসিয়ে ভাগ দিলে যে সময় হয় তার সমান অর্থাৎ ১ সেকেন্ড ÷ ১০^{৪৩}। অর্থাৎ ১টি পরমাণুর ১০ হাজার কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। এই মহাক্ষুদ্রতম মহাবিশ্বকে বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়েছে আদি অগ্নিগোলক (Primordial fire-ball) আর এতে যে তাপ তৈরি হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল ১০^{৩২} K (Kalvin) মানে ১ এর সামনে ৩২টি শূন্য বসালে যে কোটি কোটি ডিগ্রি কেলভিন তাপ হয় তার সমান। (0^{o}c = ২৭৩^{o} কেলভিন)

এভাবে জন্মের সূচনা হয় আদি মহাবিশ্বের। এটাই ১ম পর্যায়কাল (প্রথম ইয়াওম)।

দ্বিতীয় পর্যায়কাল (দ্বিতীয় ইয়াওম) ঃ ১ম পর্যায়ের পর শুরু হয় অতি তীব্র সম্প্রসারণ (ইনফ্লেশনারী ইপক)। এ সম্প্রসারণ শুরু হয় ১ সেকেণ্ডকে ১ এর সামনে ৩৫টি শূন্য বসিয়ে ভাগ দিলে যে মহাক্ষুদ্রতম সময় হয় তা থেকে এবং শেষ হয় ১ সেকেণ্ড কে ১ এর সামনে ৩২টি শূন্য বসিয়ে ভাগ দিলে যে সময় হয়, তখন (১ সেকেণ্ড ÷ ১০^{৩৫} থেকে ১ সেকেণ্ড ÷ ১০^{৩২})। এই সময়ে বস্তুর আদি ভিত্তির জন্ম হয় যার নাম কোয়ার্ক। কোয়ার্ক হল বস্তুর সবচাইতে ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা প্রোটনের আকারের চাইতেও বহুগুণ ক্ষুদ্র। এর ব্যাস হচ্ছে ১ সে. মি. কে ১ এর সামনে ২৪টি শূন্য বসিয়ে ভাগ দিলে যে মহাক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় তার সমান- (১ সে. মি. ÷ ১০^{২৪})।

তৃতীয় পর্যায়কাল (তৃতীয় ইয়াওম) ঃ এরপর মহাবিশ্বের বয়স বেড়ে যায় ১ সেকেণ্ডকে ১ এর সামনে ৬টি শূন্য লিখে ভাগ দিলে যে ক্ষুদ্রতম সময় পাওয়া যায় তার সমান। ১ সেকেণ্ড ÷ ১০^{৬} = ১ সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ। এই সময়ে মহাবিশ্বের আকার হয় সৌরজগতের সমান। এই পর্যায়ে কোয়ার্ক হতে প্রোটন ও নিউট্রন গঠিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

৪র্থ পর্যায় (চতুর্থ ইয়াওম) ঃ এরপর ৩ মিনিটে প্রোটন ও নিউট্রন মিলে বস্তুর নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং তাপমাত্রা কমে ১০^{৯} K ((১০০,০০,০০০০০) এ পৌঁছে।

৫ম পর্যায় (পঞ্চম ইয়াওম) ঃ সময় চলতে চলতে ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর, যুগ এভাবে পার হয় ১০ লক্ষ বছর। এই সময়ে ইলেকট্রন এসে নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্ত রচনা করে।

৬ষ্ঠ পর্যায় (ষষ্ঠ ইয়াওম) ঃ এই অবস্থায় মহাবিশ্ব দশ লক্ষ বছর সীমা পার হয়ে হাইড্রোজেন (H_2) ও হিলিয়াম (He) ৩ ঃ ১ অনুপাতে গঠিত হয়ে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্রহ, জীবন উপহার দেয়। এটাই সংক্ষেপে পৃথিবীসহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানের "পদার্থের অবিনাশীতাবাদ সূত্র" মতে পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংসও করা যায় না, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র। কাজেই বিগ-ব্যাংগ এর এই ব্যাখ্যা থেকে একটি বিরাট প্রশ্ন দেখা দেয়- একেবারে শূন্য হতে কিভাবে বস্তু তৈরি হল, যখন কিছুই ছিল না? কি করে বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এল? এতেও আবার দুটি বিষয় দেখা দিল। প্রথমত আদি বস্তু মূলত শূন্য হতে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় হল একদম শূন্য হতে সৃষ্টি হতে হলে একজন স্রষ্টার মাধ্যমেই তা সম্ভব আর অন্যকোন ভাবেই নয়। স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নিলে পরবর্তী ঘটনাগুলি বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোনই পার্থক্য নেই। পার্থক্য হচ্ছে আরম্ভটা।

فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ـ (المؤمن : ٦٨)

"যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।" (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ আয়াত ৬৮)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ـ (السجدة : ٤)

"আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।"

(সূরা আস-সাজ্‌দা ৩২ ঃ আয়াত ৪)

এখানে ৬ দিনের কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আরবিতে ইয়াওম অর্থ দিন এবং দ্বিবচনে ইয়াওমাইন আর বহুবচনে আইয়াম। শব্দটির প্রচলিত সাধারণ অর্থে দিন ছাড়া সময়কাল বা সময়ের দীর্ঘতাও বুঝিয়ে থাকে। যেমন- সূরা মা'আরিজে আল্লাহ পাক বলেন-

www.nagorikpathagar.org

تعرج الملئكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة .

(المعارج :٤)

"ফেরেশতাগণ ও আত্মাসমূহ (রূহ) তাঁহার নিকট পৌঁছায় এমন একদিনে যাহার পরিমাণ **পঞ্চাশ হাজার বৎসর**।"

(সূরা মা'আরিজ ৭০ ঃ আয়াত ৪)

وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون - (الحج : ٤٧)

"আর আপনার রবের নিকট (কিয়ামতের) একদিন তোমাদের হিসাবের **এক হাজার বৎসরের** সমতুল্য।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ৪৭)

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون - (السجدة : ٥)

"তিনি আসমান হইতে যমিন পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, অতঃপর প্রত্যেকটি বিষয় তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইবে এমন একটি দিনে, যাহার পরিমাণ তোমাদের গণনানুযায়ী **এক সহস্র বৎসর**।"

(সূরা সাজ্দা ৩২ ঃ আয়াত ৫)

يسئله من في السموت والارض كل يوم هو في شان - (الرحمن : ٢٩)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি **প্রত্যহ** গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।"

(সূরা আর রাহমান ৫৫ ঃ আয়াত ২৯)

ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা-

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية (ط) وان كثيرا من الناس عن ايتنا لغفلون - (يونس : ٩٢)

"অতএব, **আজ** আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নির্দশন সম্বন্ধে গাফেল।"

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৯২ আয়াত)

উপরোক্ত ৭০ ঃ ৪ আয়াতে দিন অর্থে ৫০ হাজার বছর, ২২ ঃ ৪৭ এবং ৩২ ঃ ৫ আয়াত দুটিতে দিন মানে ১ হাজার বছর এবং ৫৫ ঃ ২৯ ও ১০ঃ ৯২ আয়াত দুটিতে দিন অর্থে অতি সূক্ষ্ম সময়ের ধারণা দেয়। এ থেকে

www.nagorikpathagar.org

প্রতীয়মান হয় যে, মহান স্রষ্টার নিকট দিনের অর্থ একটি সময়কাল (A period of time)। এ সময়কাল দীর্ঘও হতে পারে অথবা ক্ষুদ্রও হতে পারে। পৃথিবীতেও একই দেশে শীতকালের দিন ও গ্রীষ্মকালের দিন সমান নয়। আবার গ্রীষ্মকালের বাংলাদেশের দিন এবং ইংল্যান্ডের দিন সমান নয়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের দিন একই সময়ে পার্থক্য অনেক। সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলির দিনের পরিমানের দিকে তাকালে আমরা পাই,

বুধের ১ দিন সমান পৃথিবীর ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা।

শুক্রের ১ " " " ১২১ দিন ১২ ঘণ্টা।

মঙ্গলের ১ " " " ১২ ঘণ্টা ১৮½ মিনিট।

এভাবে মহাবিশ্বে প্রতিটি গ্রহ ও উপগ্রহের দিনও সমান নয়। কাজী জাহান মিয়া তার আল-কোরআন দা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১) বইতে বলেন- "কোরআন 'ইয়াওম' বলতে অতি সূক্ষ্ম সময়, মধ্যম সময় ও বিশাল সময় ইত্যাদি সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। একচেটিয়াভাবে অতি বড় কিংবা অতি ছোট কোন সময়কালকে নয়।"

যাক আমিও দিন বলতে অতি সূক্ষ্ম সময় হতে অতি বৃহৎ সময়ের মেয়াদ (Period of time) কেই বুঝি।

এতো গলে ৬ দিবসের ব্যাখ্যা। কিন্তু ৪১নং সূরা হা-মীম আস্-সাজদাঃ এর ৯-১২নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا (ط) ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ (ط) سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ - ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ - فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (ط) وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا (ط) ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - (حم السجدة : ٩ - ١٢)

"বল, 'তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক! তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারি দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচ্‌নাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।' অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"

(সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ ৪১ ঃ আয়াত ৯-১২)

পৃথিবী সৃষ্টির জন্য ২ মেয়াদ, বাসিন্দাদের খাদ্য বিতরণের জন্য ৪ মেয়াদ এবং আকাশমণ্ডলকে সপ্তাকাশে পরিণত করার জন্য ২ মেয়াদ- মোট ৮ মেয়াদ। সুতরাং আগে যে ৬ মেয়াদের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে একটি স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। মনে রাখা উচিত যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কোনটির পর কোন্‌টি সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআনে কোন ক্রমিকতা দেয়া হয়নি। কাজেই এই সময়গুলি কোন ক্রমেই একটি ক্রমধারা নির্দেশ করে না। আবার কুরআনের কোথাও শুধু মহাবিশ্বকে একককভাবে ৬টি পর্যায়কালে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ নেই। হতে পারে ২টি ঘটনা একত্র হয়েছে অথবা পৃথিবীর জন্য ২টি সময়কাল আর বাকি (৬-২) = ৪টি সময়কাল লেগেছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে। মূলত ৪১ ঃ ১১ আয়াতের যে 'সুম্মা' শব্দটি এই বিরোধের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়, তার অর্থ অতঃপর , তখন, এতদভিন্ন ইত্যাদি ছাড়াও আরও একটি অর্থ হতে পারে। সেটি হল 'তৎকারণে বা 'তৎজন্য'। অনুবাদের সময় অতঃপর শব্দটি না প্রয়োগ করে তার পরিবর্তে, তৎকারণে, তৎজন্যে ব্যবহার করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আর কোনই বিরোধ থাকে না।

এখন কথা হল পৃথিবী কখন সৃষ্টি হয়েছিল? সুনির্দিষ্টভাবে, তা কোথাও উল্লেখ নেই। ৪১ ঃ ১১ আয়াতকে যদি আমরা পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ করি তৎকারণে তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন যাহা ছিল ধোঁয়ার সমষ্টি। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, "আমরা আসিলাম- অনুগত হইয়া।" ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ (الانبياء : ٣٠)

"কাফেররা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এক সাথে মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং

www.nagorikpathagar.org

প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি ইহারা ঈমান আনিবে না?" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৩০ আয়াত)

এই আয়াত থেকে বলা যায়- আকাশ ছিল ধোঁয়া অবস্থায় আর তার মাঝেই পৃথিবী বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর আহবানে তারা পৃথক হয়ে গেল।

মোটকথা বিজ্ঞান বলছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সবকিছু ৬টি মেয়াদে (ছিত্তাতা আইয়্যাম) সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের এই তথ্য মাত্র সেইদিনের অথচ পবিত্র কুরআন মজিদে ১৫০০ বছর পূর্বে একই কথা ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। তাছাড়া বিজ্ঞানের দাবি অনুসারে প্রথম অবস্থায় সবকিছু ছিল ধূম্রপুঞ্জ হিসেবে। কুরআনও অবিকল একই কথা বলছে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান কুরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই বর্তমানে এত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যা আবিষ্কার হয়েছে এবং আবিষ্কারকদেরকে নোবেল পুরষ্কারও দেয়া হয়েছে নতুন আবিষ্কার বলে, অথচ কুরআনের কাছে এ বাণী অতি পুরাতন। কি করে এ বক্তব্য কুরআনে এল ১৫০০ বছর পূর্বে, যদি তা সৃষ্টিকর্তার কথা না হত? এ কথাই প্রমাণ করে কুরআন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবিকৃত বাণী এবং কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি একেবারেই মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

মহাবিশ্বের সৃষ্টির বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেলের গরমিল

অনেক ইউরোপীয় ভাষ্যকারই মনে করেন সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা একই । এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা (কারণ কিতাব দুটোতে বর্ণনার পার্থক্য অনেক)। যেমন উভয় কিতাবেই ৬ দিনে সৃষ্টি কার্য সম্পাদিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে। শুনতে যত সহজ মনে হয় বিষয়গুলি কিন্তু মোটেও তত সহজ নয়, বেশ জটিল। বাইবেলের বর্ণনা মোতাবেক পরম স্রষ্টা ৬ দিন কঠোর পরিশ্রম করে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি ৭ম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। সেজন্যে গোটা ইহুদি সমাজ সপ্তাহের ৭ম দিনে সাবাথ (হিব্রু ভাষায় সাবাথ অর্থ বিশ্রাম) গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার স্রষ্টা কাজ করতে করতে ক্লান্ত (Tired) হয়েছেন? আর সেজন্যে তাঁকে বিশ্রামও নিতে হল- এমন কথাই ইহুদিদের বিশ্বাস। একি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যে স্রষ্টা ক্লান্ত (Tired) হয়েছেন। আবার বাইবেলে দুটি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়কে "একদিন" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দিন বলতে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর একবার পূর্ণ ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তাকে বুঝায়। কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর যখন পৃথিবী ও সূর্য সৃষ্টিই হয়নি তখন ঐ দিন এল কোথা থেকে? দিনের হিসাবই বা পাওয়া গেল কেমন করে? সুতরাং যুক্তি ও সম্ভাবনার মোকাবিলায় বাইবেলের এই বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে কুরআনের ৫০ ঃ ৩৮ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ـ (ق : ٣٨)

"আর আমি আসমানসমূহ ও যমিনকে এবং উহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করে নাই।"

(সূরা কা-ফ ৫০ ঃ আয়াত ৩৮)

একি প্রমাণ করে না যে কুরআন ছাড়া অন্য সব ধর্মগ্রন্থ বিকৃত ও মানব রচিত? কুরআনই মহান স্রষ্টার একমাত্র অবিকৃত বাণী।

দৃশ্য ও অদৃশ্যমান মহাবিশ্ব

আদি অন্তহীন বিশাল মহাকাশ। এরই মাঝে দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান বস্তু ও জ্যোতিষ্কসমূহ আবর্তিত হচ্ছে। মহান স্রষ্টা বলেন,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ (حم السجدة : ٥٣)

"শীঘ্রই মহাবিশ্বের দিগন্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করা হইবে। ফলে তাহাদের কাছে ফুটিয়া উঠিবে এ তথ্য অতি সত্য।" (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৫৩)

১৫০০ বছর পূর্বে কুরআন যখন নাযিল হয় তখন অদৃশ্যমান জগত বা বস্তু বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে ধারণা করা তো দূরের কথা, দৃশ্যমান জগতেরই বা কতটুকু খবর রাখত মানুষ? তখন মানুষের ধারণা ছিল ডাঙায় মানুষ, গরু-ছাগল, গাছপালা, কীটপতঙ্গ আর পানিতে মাছ, কুমির, হাঙ্গর এবং আকাশে চন্দ্র-সূর্য তারকারাজি অর্থাৎ খালি চোখে যা দেখা যায় তা নিয়েই বিশ্বজগত। কুরআন নাযিলের পর কত শতাব্দি পর্যন্ত মানুষ দেখতে পায় না এমন জগত বা বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারও কাছে একেবারেই ছিল অজানা। অথচ আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্যমান বস্তু বা জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম কুরআনই মানুষকে ধারণা দিয়েছে।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ (البقرة : ٣٣)

"আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ৩৩)

www.nagorikpathagar.org

এছাড়াও কুরআনের অনেক স্থানে বহু জগৎ বা জগৎসমূহের কথার উল্লেখ রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ (الفاتحة : ١)

"সকল প্রশংসা-ই জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।"

(সূরা ফাতিহা ১ ঃ আয়াত ১)

মহান স্রষ্টা কুরআনের প্রথম আয়াতেই যে মানুষকে জানিয়ে দিলেন তিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, - কোথায় সে জগৎসমূহ , কী তাদের রূপ এবং কী নিয়েই-বা তারা গঠিত? (একটু পরই তা জানতে পারবেন কুরআন নাযিলের এত সময় পরে এসে)

বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বদৌলতে আমাদের অতি কাছের অনেক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আর বহুদূরের অনেক বিরাট বিরাট তারকারাজি যথাক্রমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) ও দূরবীক্ষণের (Telescope) সাহায্যে দেখার সুযোগ হয়েছে। তা নাহলে অনেক কাছের এবং বহুদূরের অনেক কিছু আমরা কোনদিনই দেখতে পেতাম না। এছাড়া কোন প্রকারেই কোনদিনই আমরা দেখতে পারব না, আরও অনেক কিছু। বিজ্ঞান তা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাদের অস্তিত্ব সত্য বলে অনেক দলিল প্রমাণ ও দাঁড় করিয়েছে। যা অবিশ্বাস করার কোনই উপায় নেই। অথচ এ কথাই মহান স্রষ্টা মানব জাতিকে জানালেন এভাবে-

وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ـ (النحل : ٨)

"তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এমন অনেক কিছুই যাহা তোমরা অবগত নও।"

(সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ৮)

এখন, আমরা কতটুকু দেখি এবং কেন দেখি তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। আগে মনে করা হত চোখ থেকে আলো গিয়ে কোন বস্তুর উপর পড়লেই তা দেখা যায়। একথা মিথ্যা প্রমাণিত হল। কারণ আলোতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলোকিত বস্তু সহজেই দেখা যায়। দশম শতকের শেষের দিকে আরবি বিজ্ঞানী আল হাসান, যিনি ইউরোপে আল হ্যাজন নামে পরিচিত, তিনিই প্রথম প্রমাণ করলেন, যেকোন বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ করলেই বস্তুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখন প্রশ্ন থাকল আলো থাকা সত্ত্বেও আমাদের কাছের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু-পরমাণু, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং বহু দূরের অনেক বিশাল বিশাল তারকারাজি দেখার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত কেন? এ ছাড়াও আমরা দেখতে পাইনা বেশির ভাগ আলোও। অথচ শুধু

www.nagorikpathagar.org

কুরআন নাযিলের সময় কেন, যখন যেটা সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই এসব ছিল এবং থাকবে, কিয়ামত (ধ্বংস) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এবার আসুন অনেক আলো, কাছের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং বহুদূরের বৃহৎ বৃহৎ বস্তু না দেখার কারণ খুঁজে বের করি।

প্রথমেই ধরা যাক আলোর কথা- আলো নদীর ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গের মত করে চলে। স্পেকট্রস্কোপি (Spectroscopy) বা বর্ণালীবিক্ষণ বিদ্যার অগ্রগতির ফলে মানুষ জানতে পেরেছে, মহাকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক রয়েছে যারা অবিরাম নানারকম আলো দিয়ে যাচ্ছে। সব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক রকম নয়। আলোক রশ্মির ক্ষুদ্রতম তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির একশত কোটি ভাগের একভাগ, আবার দীর্ঘতম আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশ কয়েক মাইল। কিন্তু এ রশ্মিসমূহের বেশিরভাগই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যেসব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৩৮০ থেকে ৭৫০ নেনোমিটার তা-ই মানুষ দেখতে সক্ষম। এ নির্দিষ্ট সীমার (Range) বাইরে অর্থাৎ এর কম বা বেশি হলে আমরা দেখতে অক্ষম। আমাদের অতি পরিচিত অতিবেগুনী রশ্মি (Untraviolet-ray) ৩৮০ নেনোমিটারের কম এবং ইনফ্রারেড রশ্মি (Infrared-ray) ৭৫০ নেনোমিটারের বেশি হওয়াতে আমরা দেখতে পাই না। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন মহাবিশ্বের শতকরা একভাগেরও কম আলো আমরা দেখতে সক্ষম। বাকি ৯৯ ভাগের বেশি আলোই আমরা দেখতে অক্ষম।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ - (السجدة : ٦)

"তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"
(সূরা সাজ্দা ৩২ ঃ আয়াত ৬)

এক্স-রে (X-ray), গামা-রে (Gama-ray), লেসার-রে (Lesser -ray) ইত্যাদি কোন দিনই আমাদের দেখার সৌভাগ্য হবে না। অথচ এসব আলো ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বাস্তবে এর ব্যবহারও হচ্ছে। যেমন এক্স-রে রশ্মি (X-ray) মানুষের দেহের নরম অংশের মধ্য দিয়ে ভেদ করে যেতে পারে কিন্ত হাড় বা টিউমারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। কাজেই এই রশ্মি দিয়ে ফটো তুলে টিউমার বা হাড় ভাঙ্গা সম্পর্কে জানা যায়। লেসার রশ্মি (Lesser-ray) দিয়ে অনেক অপারেশন করা হয়। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি চামড়ার জন্য অনেক উপকারী।

আমরা যে বিদ্যুৎ (Current) দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি তা দেখতে কেমন, তার রূপ, আকার-আকৃতি কেমন, তা কি আমরা বলতে পারি? অথচ এর ব্যবহার অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কি? বিদ্যুৎ হচ্ছে এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি। যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে

লাগাই। অথচ বিজ্ঞান যতই উন্নততর হোক বা যতই প্রযুক্তি আবিষ্কার করুক না কেন বিদ্যুৎ (Current) চিরদিনই থেকে যাবে অদৃশ্য হয়ে মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (النمل : ٦٥)

বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।' (সূরা নাম্‌ল ২৭ ঃ আয়াত ৬৫)

এবার আসুন, অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু, ব্যাক্‌টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি না দেখার কারণ কি- তা নিয়ে একটু আলোচনা করি।

আমরা জানি, আলো তরঙ্গের ন্যায় চলে। কোন বস্তুর উপর যদি আলো পড়ে আর সেই বস্তুটি যদি আলোর তরঙ্গের চেয়ে বড় হয় তখন আলো- তরঙ্গ বস্তু থেকে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের চোখে ফিরে আসে তখন বস্তুটি আমরা দেখতে পাই।

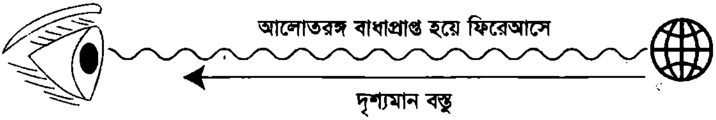

চিত্র

আবার বস্তুটি যদি আলোর তরঙ্গ থেকে ছোট হয় তখন আলোর তরঙ্গ ঐ বস্তুটিকে তরঙ্গের মধ্যে রেখে চলে যায় অর্থাৎ বস্তুটি আলোর তরঙ্গকে বাধা দিতে পারে না। ফলে বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে ফিরে আসে না। এজন্য অতি ক্ষুদ্র জিনিস আমরা দেখতে পাই না।

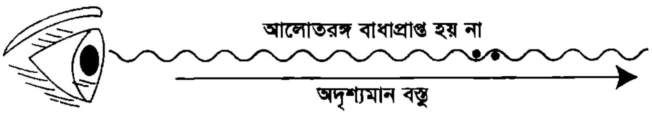

চিত্র

একটা উদাহরণ দিয়ে বললে, বুঝতে সহজ হবে, অপারেশন করার সময় মাথার উপর একই পাওয়ারের অনেকগুলি বাল্ব বিভিন্ন দিক থেকে লাগিয়ে (স্পেশাল লাইট) দিয়ে অপারেশন করা হয় বলে অপারেশনের স্থানে ডাক্তার বা নার্সদের শরীরের ছায়া পড়ে না। এখানে চতুর্দিক থেকে সমান আলো পড়ে বলে ছায়া তৈরি হয় না। তেমনি ক্ষুদ্র বস্তুকে আলোর তরঙ্গ চারিদিক থেকে ঘিরে

www.nagorikpathagar.org

ফেলে বলে ক্ষুদ্র বস্তুতে আলো বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই আলোও ফিরে আসে না। কাজেই ক্ষুদ্র বস্তুটি আমরা দেখতে পাই না।

এতক্ষণ যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অণু-পরমাণুর কথা বললাম- এসব যে পৃথিবীতে বিদ্যমান তা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কি?

অণু হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, যার মধ্যে পদার্থের গুণাগুণ বিদ্যমান। অণুকে ভাঙ্গলে পদার্থের গুণাগুণ থাকে না। একাধিক পরমাণু নিয়ে অণু গঠিত। অংক কষে দেখা গেছে কার্বন পরমাণু লিখতে 'র' এর নিচের বিন্দুটিতে (.) ২৫ হাজার কোটি কার্বন পরমাণু আছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০০ কোটির ৫০ গুণ। মনে করা হত পরমাণু (Atom) কে ভাঙ্গা যায় না। গ্রীক ভাষায় Atom শব্দের অর্থ অবিভাজ্য। (a = not, tom = divisible বা বিভাজ্য অতএব Atom অর্থ অবিভাজ্য।) কিন্তু এখন সে পরমাণুকেও ভাঙ্গা সম্ভব। এতে রয়েছে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস। আবার নিউক্লিয়াস গঠিত নিউট্রন ও প্রোটন নিয়ে। এরপর আবিষ্কৃত হয়েছে ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন এবং নিউট্রিনো, মেসন। এখানেই শেষ নয়। আরও আবিষ্কৃত হয়েছে লেপটন, কোয়ার্ক, এনটি কোয়ার্ক ও ফোটন। (আলোর কণা 'ফোটন' থেকে বস্তুকণা 'কোয়ার্ক', পরে কোয়ার্ক তৈরি করে 'প্রোটন ও নিউট্রন' এবং প্রোটন ও নিউট্রন মিলিত হয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস পরে ইলেকট্রন ধারণ করে সৃষ্টি করে পরমাণু।) এটমের মধ্যে এতকিছু থাকা সত্ত্বেও খালি জায়গাই বেশি। সৌর মণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি আবর্তিত হয় তেমনি এটমের মধ্যে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ও ফোটন আবর্তিত হচ্ছে। কাজেই পরমাণুকে পরমাণু না বলে পারমাণবিক বিশ্ব (Atomic World) বলাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। যে এটম সাধারণ অণুবীক্ষণ (Microscope) যন্ত্রে দেখা যায় না, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ২০ লক্ষ গুণ দর্শন ক্ষমতা বাড়িয়ে (পরমাণুকে) দেখা যায়। আর এর মধ্যে এত কিছু। সুবহান আল্লাহ! উপরে উল্লেখিত অস্তিত্ব সমূহ আসলেই অদৃশ্য এবং তাদের অস্তিত্বের কথা ইতিপূর্বে জানত না জগতবাসী। তাই মহান স্রষ্টা ঘোষণা দিলেন,

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ - (الحاقة : ٣٨ - ٣٩)

"অতঃপর আমি কসম করিতেছি উহার যাহা তোমরা দেখিতে পাও এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না।" (সুরা হা-ক্কাহ ৬৯ ঃ আয়াত ৩৮-৩৯)

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ - (سبا : ٣)

"তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচরে নহে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; ইহার প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।" (সুরা সাবা ৩৪ ঃ আয়াত ৩)

আরবি 'জাররাহ' শব্দের অর্থ পরমাণু (Atom) । পরমাণুর চেয়েও বৃহৎ হচ্ছে অণু (Molecule) এবং ক্ষুদ্রতম হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি।

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ
مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ (يونس : ٦١)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬১)

অতএব উল্লেখিত আয়াতসমূহ পরমাণু (Atom) এর চেয়েও ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন .... ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এক একটি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস মুহূর্তের মধ্যে সংখ্যায় লক্ষ কোটি গুণ হয়ে যেতে পারে। এদের নিয়ে কত যে গবেষণা চলছে রাতদিন; তার হিসাব ক'জন রাখে? এখনও আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস। ভবিষ্যতেও হয়ত আরও আবিষ্কার হবে। এদের জগৎ যে কত ব্যাপক তা কল্পনাও করা যায় না। প্রতিদিন বেড়েই চলছে এদের সম্পর্কে নিত্য নতুন জ্ঞান। আমাদের চারপাশে নদীনালা, খাল-বিল; বায়ুমণ্ডল এমনকি আমদের পেটের মধ্যেও রয়েছে অগণিত অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া। আমাদের লোমকূপের গোড়ায় যে ব্যাকটেরিয়া আছে তা যদি একবার মাইক্রোস্কোপে দেখতেন তা হলে ভয়ে আতঙ্কে আপনি হয়ত ঘুমাতেই পারতেন না। এক ফোঁটা দই এর মধ্যে যে কোটি কোটি ব্যাক্টেরিয়া থাকে, অনেকে মাইক্রোস্কোপে এদের নড়াচড়া (Movement) দেখলে দই খাওয়াতো দূরের কথা- এর কাছেও হয়ত যেতেন না। অবশ্য দইয়ের ব্যাকটেরিয়া আমাদের ক্ষতি করে না. বরং কিছুটা উপকারই করে থাকে।

আমাদের শরীর অসংখ্য অগণিত কোষ (Cell) দিয়ে গঠিত। একজনের শরীরে কোষের (Cell) সংখ্যা পৃথিবীর জন্ম থেকে এ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিওলাস, ক্রোমোসোম, ডি এন এ (DNA), আর এন এ (RNA) আরও কত কি!

www.nagorikpathagar.org

কোষ আবার কোষ-প্রাচীর (Cell wall) দিয়ে আবৃত। একেকটা কোষ একেকটা কাজ করে। এদের কাজের কথা বলে শেষ করা যাবে না। মোট কথা কোষ হচ্ছে একটা বিরাট কারখানা (Industry)। আমাদের শরীরে যে তরল রক্ত তার মধ্যেও রয়েছে লোহিত কণিকা (RBC), শ্বেত কণিকা (WBC) অনুচক্রিকা (Platelate) ইত্যাদি। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। আমাদের একজনের শরীরের রক্তে যে লোহিত কণিকা আছে তার সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীর লোকসংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু এসবই মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই শরীরে বিদ্যমান। এখন এদের সম্পর্কে জানার পর থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নতি সাধন করেছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ
اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۔ (حم السجدة : ٥٣)

"আমি উহাদের জন্য আমার নিদের্শনাবলি ব্যক্ত করিব, বিশ্ব জগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?" (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৫৩)

এবার কাছের পরিবেশ ছেড়ে নজর দেওয়া যাক আকাশের দিকে। পরিষ্কার দিনের আকাশে সূর্য এবং মাঝে মধ্যে চাঁদ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সূর্য আমাদের অতি নিকটে বলে এর উজ্জ্বলতার জন্য দিনের বেলায় অন্য কিছুতো দূরের কথা- সূর্য পরিবারের সদস্যদেরই আমরা দেখতে পাই না। অথচ এরা সারাক্ষণই দিনে রাতে আকাশে অবস্থান করে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে।

আকাশে কি কি দৃশ্য ও অদৃশ্যমান বস্তু থাকতে পারে এ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে আকাশবাসীদের সম্পর্কে কোনই ধারণা বা কিছুই বুঝা যাবে না। রাতের আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যায়, আসলে কিন্তু এরা সব তারা নয়। যে তারাগুলি মিট মিট করে না এবং আলোও তৈরি করতে পারে না এরা নক্ষত্র বা তারা থেকেই আলো পায়। এরা হচ্ছে গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। মনে হয় এরা সব সময় আলো দিচ্ছে। তারা মিটমিট করে জ্বলে নিভে তার কারণ তারা অনেক দূর থেকে আলো পাঠায়। এই আলো নানাপথ পার হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে আসে। যেসব স্তর পার হয়ে এ আলো আসে তাদের ঘনত্ব সমান নয়। আলো একই স্তরের মধ্যে সোজা পথে চলে। কিন্তু স্তর পরিবর্তন হলে পথ থেকে একটু সরে যায়। ফলে আলোতে কম্পন লাগে। তারার আলোতে কম্পনের ফলে মিটমিট করে। অন্যদিকে তারার তুলনায় গ্রহরা আমাদের অনেক কাছে আর সেজন্যই গ্রহদের আলো অনেক উজ্জ্বল দেখায়। তারার মতই এদের আলোও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

www.nagorikpathagar.org

পার হওয়ার সময় একটু সরে যায়। কিন্তু এদের উজ্জ্বলতা বেশি বলে আলোকরশ্মিতে যে কম্পন লাগে তা বুঝা যায় না। সেজন্য গ্রহের আলো মনে হয় স্থির এবং তারাদের আলোর মত মিটমিট করে না। আমাদের সূর্য পরিবারের মধ্যে আছে গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহাণু উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি। এরা সবাই সুর্য থেকে আলো পায়। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই।

গ্রহ (Planet) ঃ তারার চারপাশে যা ঘোরে তাকে গ্রহ বলে। সূর্যের গ্রহ ১০টি (অবশ্য অনেকের মতে ১১টি)।

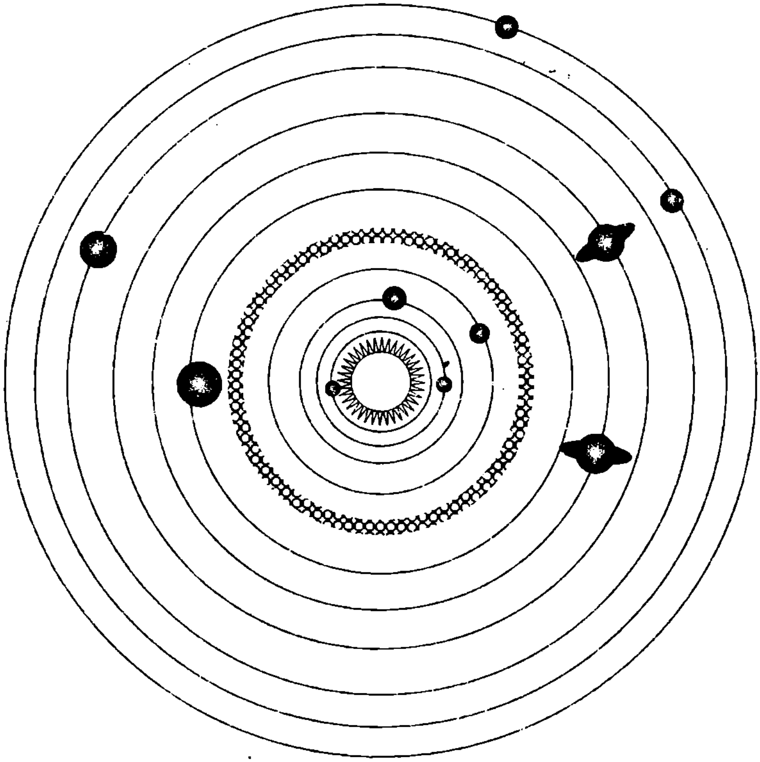

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, কোয়ার ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

কোয়ার ঃ সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ কোয়ার। সূর্য থেকে ৭৪০ কোটি কি, মি, দূরে অবস্থিত। এটি ৪ঠা জুন ২০০২ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী মাইকেল ব্রাউন ও তার সহকর্মী চাদ উইক ট্রাজিলো আবিষ্কার করেন। এটি প্লুটোর চেয়ে ১৫০ কোটি কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এটি ২৮৮ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

উপগ্রহ (Satellite) ঃ গ্রহদের চারপাশে যা ঘোরে, তাই উপগ্রহ। আমাদের পৃথিবীর একটিমাত্র উপগ্রহ-চাঁদ। এটি আমাদের অতি নিকটে বলে অনেক বড় ও উজ্জ্বল দেখায়। মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ১৬টি, শনির ২৩টি, ইউরেনাসের ৫টি, নেপচুনের ২টি এবং প্লুটোর ১টি উপগ্রহ আছে।

গ্রহাণু (Asteroid) ঃ বিভিন্ন আকারের অসংখ্য বস্তু পিণ্ড মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে অবস্থান করে সূর্যের চারপাশে ঘোরে, এরাই গ্রহাণু এবং এদেরকে একত্রে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroid - Belt.)

উল্কা (Meteor) ঃ মেঘমুক্ত রাতে প্রায়ই দেখা যায় হঠাৎ যেন তারার মত উজ্জ্বল একটা আলো আকাশ থেকে খসে পড়ে সাথে সাথে মিলিয়ে যায়। এমন ঘটনাকে বলে উল্কাপাত বা তারা খসা (Shooting star)। যে বস্তুগুলো এভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাদেরকে বলে উল্কা। উল্কা যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন বায়ুস্তরের সাথে ঘর্ষণের কারণে উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে উঠে উল্কাপাত ঘটায়। এটাই হচ্ছে উল্কাপাতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

উল্কা

কিন্তু আল্লাহ সোবহানাহুওয়াতায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ - وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ - (الحجر : ١٦، ١٨)

www.nagorikpathagar.org

"আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে সুশোভিত করিয়াছি দর্শকদের জন্য; এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্‌ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজ্‌র ১৫ ঃ আয়াত ১৬-১৮)

পবিত্র কুরআনে শয়তানকে উল্কা ছুড়ে তাড়ানোর কথা এসেছে একাধিকবার। বলা হয়েছে শয়তান ঊর্ধ্বজগতের তথ্য শুনতে আসলে তৎক্ষনাৎ প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ড তাদেরকে আঘাত হানে। এ জ্বলন্ত উল্কা যেন ফায়ার সার্ভিসের পুলিশের মত সারাক্ষণ নিজ নিজ কর্তব্য পালনে দণ্ডায়মান। শুধুমাত্র আদেশ (Order) এর অপেক্ষা। মুসলমানদের হজ্বের সময় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের বিধান, তা-ও শয়তানের প্রতি ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হল-৭ শতকে কুরআন নাযিলের সময় আকাশে ঝুলন্ত পাথরের অবস্থানের খবর খুবই আশ্চর্যজনক তথ্য, এমনি আরও এক অতিশয় আশ্চর্যজনক তথ্য হল পৃথিবীর জন্য সুরক্ষিত ও নিরাপত্তামূলক আকাশের প্রস্তাব। শয়তান যদি মহাকাশের কোন বিধান জেনে নিতে পারত তাহলে এতদিনে সে নভোচারীদেরকেও বিভ্রান্ত করে ছাড়ত এবং মানুষের পক্ষে মহাশূন্যে অভিযান হয়ত আদৌ সম্ভব হতো না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিরাট বাধার সৃষ্টি হত। আর সূরা আর-রাহমানে ঘোষণার সত্যতাও সম্ভব হত না।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۔ (الرحمن : ٣٣)

"হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়- আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম করিও। কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না, শক্তি (সামর্থ্য) অর্জন ব্যতিরেকে।" (সূরা আর রাহমান ৫৫ ঃ আয়াত ৩৩)

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔ (يونس : ٦٤)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।"

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬৪)

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ (ط) تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۔ (حم السجدة : ٤٢)

"কোন মিথ্যা উহাতে প্রবেশ করিবে না সম্মুখ হইতে কিংবা পশ্চাৎ হইতে। উহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।"

(সূরা হা-মীম- আস- সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৪২)

ধূমকেতু (Comet) ঃ এরা হচ্ছে অত্যন্ত হিমায়িত (ঠাণ্ডা) গ্যাসের সমষ্টি। বেশির ভাগ সময়েই সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে বলে ঠাণ্ডায় জমাট বাধা অবস্থায় থাকে। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের কাছে আসতে থাকলে গরম হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অনেকটা উজ্জ্বল গ্যাসে পরিণত হয়। এগুলো দেখতে অনেকটা লম্বাটে (ঝাঁটার মত)। এদের একটা মাথা ও লেজ আছে। এরা বিভিন্ন ব্যাসের হতে পারে। কোন কোনটা সূর্যের চেয়েও বড়। হ্যালির ধূমকেতু আসে প্রায় ৭৬ বছর পর পর। ১৯৮৬সালে এটি দেখা গিয়েছিল। এরপর আসবে ২০৬২ সালে। দীর্ঘ মেয়াদী ধূমকেতু কোহূতেক দেখা গিয়েছিল ১৯৭১ সালে। এরপর দেখা দেবে ৭৫,০০০ বছর পর।

আমাদের সূর্য পরিবারের ধূমকেতুর এলাকা (Area) হাজার হাজার কোটি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর সূর্যের আর কোন আধিপত্য নেই। তারপর আরম্ভ হয় অসীম মহাকাশ। মহাবিশ্বে অসংখ্য তারা এবং তাদের পরিবার ছাড়াও রয়েছে নীহারিকা, ব্লাকহোল, গ্যালাক্সি (Galaxy) কোয়াসার আরও কত কী!

নীহারিকা (Nebula) ঃ নীহারিকা অর্থ গ্যাস ও ধূলিকণায় গঠিত মেঘমালা। এ থেকে জন্ম নেয় তারা বা নক্ষত্র। আকৃতি অনুযায়ী নীহারিকাদের বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে- কালপুরুষ, কর্কট, অশ্বমণ্ডল, নীহারিকা ইত্যাদি।

ব্লাকহোল (কাল গহ্বর) ঃ তারাগুলি প্রধানত হাইড্রোজেনের তৈরি। হাইড্রোজেন অহরহ হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং এ সময় কিছু আলো ও তাপ উৎপন্ন হয়। এভাবে বৃহৎ আকারের তারার মধ্যে জ্বালানি হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেলে বিকট বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারার মধ্যে যা থাকে তা বাইরের অসীম দূরে ছিটকে পড়ে। তখনই শূন্যস্থানে তৈরি হয় একটি ব্লাকহোল। একটি সিরিঞ্জের মধ্য থেকে বায়ু বের করে শূন্য সিরিঞ্জের মধ্যে যেমন তরল ঔষধ ঢুকানো হয় তেমনি ব্লাকহোল তার শূন্যস্থানে আশপাশের তারা, গ্রহ-উপগ্রহ সবকিছু টেনে ভিতরে নিয়ে যায় প্রচণ্ড টানে। ব্লাকহোল থেকে কোন আলোই বের হয়ে আসতে পারে না। কাজেই ব্লাকহোলের ভিতরটা মানুষ কোনদিনই দেখতে পাবে না। এ হল সংক্ষেপে ব্লাকহোলের ধারণা। (পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে)

وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ۔ (النحل : ٨) ۔

"তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যাহা তোমরা অবগত নও।"

(সূরা নাহ্ল ১৬ ঃ আয়াত ৮)

গ্যালাক্সি (Galaxy) ঃ অসংখ্য অগণিত তারা ও তাদের পরিবার নিয়ে গঠিত হয় গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। আমরা খালি চোখে যে তারকারাজি দেখি এসবই আমাদের গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের গ্যালাক্সির নাম ছায়াপথ (Milky Way Galaxy) । আমাদের

www.nagorikpathagar.org

গ্যালাক্সির ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। ১ আলোকবর্ষ হচ্ছে আলো ১ বছরে যতটুকু পথ অতিক্রম করে তা। আলো ১ সেকেন্ড অতিক্রম করে ১, ৮৬,০০০ মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার। অতএব ১ বছরে অতিক্রম করে-

(১,৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫) মাইল

= ৫৮,৬৫,৬৯৬০ × ১০০,০০০ মাইল

= ৫৮,৬৫.৯,৬০,০০,০০০, মাইল

আমাদের গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা ১০ হাজার কোটি (১,০০,০০০, ০০০, ০০০)। তার মধ্যে সূর্য অত্যন্ত অনুল্লেখযোগ্য তারা বা নক্ষত্র যা গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরের কোন এক স্থানে (সীমানায়) পড়ে আছে। অনেক তারা আছে যা সূর্যের তুলনায় লক্ষ কোটি গুণ বড়। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র বা তারা প্রক্সিমা সেঞ্চুরী পৃথিবী থেকে ৪ আলোক বর্ষ দূরে। এ পর্যন্ত দৃশ্য গ্যালাক্সির যে সংখ্যা জানা গেছে তা ১০০ কোটির মত। একটি গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সির গড় দূরত্ব ৩৩ লক্ষ আলোকবর্ষ। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে গড় নক্ষত্রের সংখ্যা ১০,০০০ কোটি। আমাদের ছায়াপথের (মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির) নক্ষত্রসমূহ একটি অপরটি থেকে গড়ে ৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। সূর্যের মতই মহাবিশ্বে তেমন কোন স্থান নেই আমাদের ছায়াপথেরও। আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি হচ্ছে 'এন্ড্রোমিডা।' প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আর তাতে নক্ষত্রের সংখ্যা আমাদের ছায়াপথের ৩ গুণ অর্থাৎ ত্রিশ হাজার কোটি। অন্য গ্যালাক্সির তুলনায় এটিও অতি ছোট্ট ও নগণ্য। আমরা যদি এ মুহূর্তে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি দেখার সুযোগ করতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পাব ২২ লক্ষ বছর পূর্বের অবস্থা। আর বর্তমান অবস্থা দেখা যাবে ২২ লক্ষ বছর পর। কারণ এটা হতে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ২২ লক্ষ বছর।

অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে আমাদের দৃশ্য জগতের শেষ সীমা ১১০০ কোটি আলোকবর্ষ। বৈজ্ঞানিক হাবেলের হিসাব মতে ১১ শ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে কোন গ্যালাক্সির অবস্থান হলে সেই গ্যালাক্সিটির সরে যাওয়ার গতিবেগ হবে আলোর গতির সমান। অর্থাৎ ১ সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে গ্যালাক্সিটি দূরে সরে যাচ্ছে। এই গতিবেগ প্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে আর কোন আলোই সে গ্যালাক্সি হতে আমাদের দিকে ছুটে আসবে না। ফলে গ্যালাক্সিটি হারিয়ে যাবে অসীমের সীমাহীন অদৃশ্য অঞ্চলে। এমনিভাবে কত গ্যালাক্সি সৃষ্টির সময় থেকে এ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে আমরা তা কখনই জানতে সক্ষম হব না। কোন উপায়েই কোনদিন তা আমরা দেখতেও পাব না। দৃশ্য জগতের ব্যাপকতাই এত বিশাল, যার সীমা-পরিসীমা নেই। অথচ অদৃশ্য জগতের তুলনায় এও সসীম, অতি নগণ্য।

www.nagorikpathagar.org

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا (يونس : ٢٠)

"বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে।"

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ২০)

ক্লাস্টার ঃ অনেকগুলি পরস্পর নিকটবর্তী গ্যালাক্সিকে একত্রে ক্লাস্টার বলা হয়। একটি ক্লাস্টারে সহস্রাধিক গ্যালাক্সি থাকতে পারে। যে গ্যালাক্সিগুলির প্রতিটিই হতে পারে মিল্‌কিওয়ে গ্যালাক্সির মত বা এর চেয়েও বিশাল। আমাদের মিল্‌কিওয়ে যে ক্লাস্টারে অবস্থিত তার নাম লোকাল গ্রুপ। এ লোকাল গ্রুপ ক্লাস্টারটি ২০টি গ্যালাক্সির সমন্বয়ে গঠিত। বিশাল আকৃতির এমন সব ক্লাস্টার আছে, যার গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। যেমন হারকিউলাস ক্লাস্টার।

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَٰتٍ طِبَاقًا (ط) مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ (ط) فَارْجِعِ الْبَصَرَ (٧) هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ - ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ - (الملك : ٣ - ٤)

"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না; তুমি আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।" (সূরা মূলক ৬৭ ঃ আয়াত ৩-৪)

কোয়াসার ঃ এটা দেখতে তারার মত অথচ তারা নয়। সৌর জগতের নিকটতম কোয়াসার 3C 273 থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ১৫০ কোটি বছর আর 3C 9 কোয়াসার থেকে (আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগে) এক হাজার কোটি বছর। পৃথিবীর বয়স এখন ৪৬০ কোটি বছরের মত। তাহলে 3C 9 এর প্রথম আলো পৃথিবীতে পৌঁছবে আরও (১০০০-৪৬০) ৫৪০ কোটি বছর পরে। বর্তমানে এক হাজারের মত কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত জানা বস্তুদের সবচাইতে দূরবর্তী কোয়াসার হল 0Q-172, কমপক্ষে ১০০ টি বিশাল বৃহৎ গ্যালাক্সি সমশক্তি সম্পন্ন। সূর্যের তুলনায় এর উজ্জ্বলতা ১০ লক্ষ কোটি গুণ বেশি। এত বিশাল আকার এবং এত বিশাল উজ্জ্বলতা নিয়ে 0Q-172 কোয়াসারটি চিরদিন আমাদের দৃষ্টির বাইরে পড়ে থেকে কুরআনের অদৃশ্য দাবি পূরণ করছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কেন তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আকাশে কোন অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে এমন কোন ধারণাই ছিল না মানুষের। দৃশ্য জগতের তুলনায় অদৃশ্য জগত যে কত সুবিশাল, বিজ্ঞানীরা তা এখনও পরিপূর্ণভাবে জানতে বা অনুমান করতে

www.nagorikpathagar.org

সক্ষম হয়নি। আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীরা মনে করেন দৃশ্য বস্তু অদৃশ্য বস্তুর (ভরের) মোট পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগেরও কম। অর্থাৎ ৯০ ভাগেরও বেশি পরিমাণ বস্তুই অদৃশ্য। আবার মহাবিশ্বের ৯৯% এর বেশি আলোই দৃষ্টি শক্তির বাইরে। অদৃশ্য ও নিরাকার মহান স্রষ্টা আল্লাহর উপর যাদের বিশ্বাস নেই এবং যারা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে পরিহাস করেন, বিজ্ঞানের এই সুদৃঢ় তথ্যগুলির মোকাবিলায় তারা কী উত্তর দিবেন?

إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

(الحجرات : ١٨)

"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।"

(সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ আয়াত ১৮)

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আবিষ্কৃত এত বিশাল অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে ১৫০০ বছর পূর্বে মহান স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা বা বলা কি সম্ভব ছিলো?

قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْأَرْضِ ـ (يونس : ١٨)

বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ প্রদান করিবে যাহা তিনি অবগত নহেন? (১০ ঃ ১৮)

মহান আল্লাহই জগৎসমূহের প্রতিপালক (৪০ ঃ ৬৪)

অদৃশ্য জগতসমূহের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। ১০ ঃ ২০

তিনি মানুষকে জ্ঞাত করিয়াছেন ইতিপূর্বে সে যাহা জানিত না। (৯৬ ঃ ৫)

সিরিয়াস (Serius) ঃ রাতের আকাশে উজ্জ্বলতম যে তারাটি দেখা যায় তার নাম সিরিয়াস। আল কুরআনে এ তারাটির নাম এসেছে এভাবে -

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ـ (النجم : ٤٩)

"আর নিশ্চয়ই তিনি সেহরা নক্ষত্রের মালিক।"

(সূরা নজম ৫৩ ঃ আয়াত ৪৯)

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ـ (لقمن : ٣٠)

"এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ৩০)

www.nagorikpathagar.org

তাহারা কি সূক্ষ্ম সতর্কতার সঙ্গে কুরআনকে অনুধাবন করে না? যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন উৎস হইতে অবতীর্ণ হইত, তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে পাইত বহু অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতা। (৪ ঃ ৮২)

দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না।

(৬৭ ঃ ৩)

ইহা এমন গ্রন্থ, যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

(২ ঃ ২, ৩২ ঃ ২)

ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। (১৪ ঃ ৫২)

আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে একমাত্র তিনিই আল্লাহ (৬ ঃ ৩)

তিনিই এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে অবগত (৬৪ ঃ ৪)

তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্তকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (২৬ ঃ ২৪)

মহাবিশ্বের পরিণতি / কিয়ামত (মহাধ্বংস)

বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। একদিন এই সম্প্রসারণ থেমে যাবে এবং ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্ব কেন্দ্রের দিকে সংকোচিত হতে থাকবে। যেমন- ছোট ছোট কচুরিপানা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ একটি পুকুরের মাঝখানে যদি একটি ঢিল ছুঁড়ে মারা যায় তখন দেখা যাবে কচুরিপানাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। কিছুদূর সরে যাবার পর আবার মাঝখানের দিকে ফিরে আসছে এবং খালি জায়গাটুকু সরে যাওয়া কচুরিপানা দিয়ে পুনরায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি এরকমই। এ সংকোচনের ফলে সবকিছুই একটার সাথে আরেকটার ধাক্কা লাগবে। এই ধাক্কাধাক্কির ফলে মহাবিশ্বের সবকিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে শেষ হয়ে যাবে। তখন আর কিছুই থাকবে না। এ সম্পর্কে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ বা দ্বিধা নেই। অথচ, মহাধ্বংস বা কিয়ামত সম্পর্কে সর্বপ্রথম মানুষ জানতে পারে ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেই। যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তারা ছাড়া আর সবার কাছে এতদিন কিয়ামত ছিল অজানা বা অবিশ্বাস্য। কিন্তু কখন কিভাবে মহাধ্বংস বা কিয়ামত হবে এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। আর এ মত পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ স্বয়ং মহান স্রষ্টাই এ সম্পর্কে বলেন-

www.nagorikpathagar.org

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا (ط) قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ (ج) لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ (ط) ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (ط) لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً (ط) يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا (ط) قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (الاعراف : ١٨٧)

তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহা প্রকাশ করিবেন; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে। আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে।' তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।'

(সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ১৮৭)

কিয়ামত কখন হবে সেই মুহূর্তটি না জানালেও মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের পূর্বের কিছু আলামত ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন। "সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?' যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে।" (৭৫ ঃ ৬-৯) "যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে।" (৭৭ ঃ ৮-১০) "যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে, সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে।" (৮২ ঃ ২-৩)

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'লার অনেক ঘোষণাই বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে ফেলেছেন। এসব প্রমাণের কিছু কিছু তথ্য নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

সূর্য সহ ছোট তারার পরিণতি (ধ্বংস)

বৈজ্ঞানিকদের মতে সব তারাই প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরি। প্রতি নিয়ত এই হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে তৈরি হয় হিলিয়াম। ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণু (Atom) একত্র হয়ে তৈরি করে এক পরমাণু হিলিয়াম (He) এবং কিছু আলো ও তাপ।

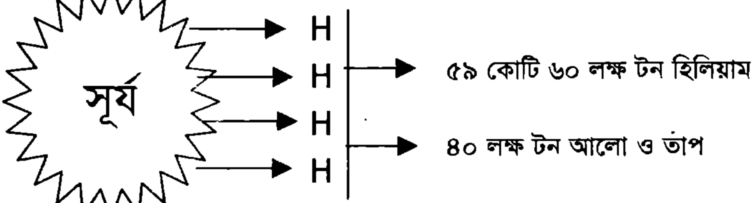

www.nagorikpathagar.org

আমরা সূর্য থেকে যে তাপ পাই তা আলোর মাধ্যমে আসে। সেজন্য ছায়াতে তাপ কম। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর পরিধিতে (চারপাশে) তাপমাত্রা ৬ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

সূর্যের ভিতরে এত তাপ যা কল্পনাই করা যায় না। যে প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরিবর্তন হয়ে হিলিয়াম হয় সেই প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়েছেন নিউক্লিয়ার ফিউশন (Nuclear fusion)।

মহাবিশ্বের অন্যান্য তারকার মত এই ক্ষুদ্র তারকা সূর্যটিতে প্রতি সেকেন্ডে ৬০ কোটি টন H_2 গ্যাস হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। এর মধ্যে ৪০ লক্ষ টন আলো ও তাপে আর বাকি ৫৯ কোটি ৬০ লক্ষ টন সম্পূর্ণটাই হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। যে ৪০ লক্ষ টন আলো এবং তাপে রূপান্তরিত হয় সে শক্তির (Energy) পরিমাণ কত তা জানেন কি? তা নিম্নলিখিত ফরমূলা থেকে পাওয়া যায় -

$E = Mc^2$ (E = শক্তি, M= পদার্থের ভর, C = প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতি)

বা, E (শক্তি) = M (পদার্থের ভর) × c^2 (আলোর গতি)^২

বা, E (শক্তি) = ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর × ১,৮৬,০০০ মা.

× ১৮৬০০০ মা.

বা E (শক্তি) = ???? ....।

(৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেনের ভর ৪০ লক্ষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি)

∴ শক্তি = অসীম।

কাজেই প্রতি সেকেন্ডে যে ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন গ্যাস সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হারিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তার পরিমাণ সূর্যের দেহের হাইড্রোজেন গ্যাসের ভরের তুলনায় অতি নগণ্য। মাত্র ১ সেকেন্ডে এই অতি নগণ্য বা অতি সামান্য গ্যাস যে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তার পরিমাণ পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সকল মানুষ যতটুকু শক্তি ব্যবহার করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। (সুবহানাল্লাহ!)

www.nagorikpathagar.org

যাক বলছিলাম, সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে একটু ভেবে দেখুন সূর্যের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত কত হাইড্রোজেন ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে? বাকি যে পরিমাণ হাইড্রোজেন এখনও মজুদ আছে তা সময় যাই লাগুক না কেন একদিন সব হাইড্রোজেনই শেষ হয়ে যাবে। যখনই হাইড্রোজেনের মজুদ শেষ হয়ে আসবে তখনই সূর্যের আয়তন ও উজ্জ্বলতা অনেক বেড়ে যাবে এবং লাল রং ধারণ করবে। এই অবস্থায় তারাটিকে বলা হবে "লাল দানব" (Red giant)।

সূর্যসহ আরও অনেক তারা যখন লাল রং ধারণ করবে তখন সবকিছু লালচে দেখাবে। মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ـ (الرحمن : ٣٧)

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে তখন উহা রক্তিম বর্ণ ধারণ করিবে।"

(সূরা আর-রাহমান ৫৫ ঃ আয়াত ৩৭)

বর্তমানে সূর্যের রং হলুদ। এ অবস্থায় যেকোন নক্ষত্র (তারা) দীর্ঘদিন যাবৎ থাকতে পারে। রং পরিবর্তন অর্থাৎ কোন তারা লাল দানবে পরিণত হওয়া মানেই হচ্ছে সেটি জীবনের অন্তিমলগ্নে পৌঁছে যাওয়া। তখন সূর্যের আয়তন এত প্রসারিত হবে যে, বুধ ও শুক্র এর ভিতরে চলে যাবে। এমনকি চন্দ্র এবং পৃথিবীও এর সাথে মিশে যাবে। মহান স্রষ্টা বলেন-

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ـ (القيمة : ٩)

"যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে।" (সূরা কিয়ামা ৭৫ ঃ আয়াত ৯)

লাল দানবের বাহিরের গ্যাসীয় আবরণ মহাশূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। বাইরের আবরণ চলে যাওয়ার পর বাকি যা থাকবে তা ছোট্ট সাদা বামনে (White dwarf) পরিণত হবে। তখন এর কোন আলো থাকবে না।

সূর্যেরই যখন কোন আলো থাকবে না তখন চাঁদের আলো থাকার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যেহেতু চাঁদের আলো সূর্য থেকেই প্রাপ্ত। মহান স্রষ্টা ঘোষণা দিলেন এভাবে-

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ـ (التكوير : ١)

"সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হইবে।" (সূরা তাকভীর ৮১ ঃ আয়াত ১)

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ـ (القيمة : ٨)

"এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন।" (সূরা কিয়ামা ৭৫ ঃ আয়াত ৮)

ছোট তারার সাদা বামনও ঠাণ্ডা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর পরিণতি (ধ্বংস)

পৃথিবীর পরিণতি জানার আগে এর গঠন সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার। আপনারা জানেন, পৃথিবী অনেকটা বলের-মত। বলের উপরটা চামড়া, তার নিচে রাবারের ব্লাডার, সর্বোপরি ভিতরে থাকে বাতাস। পৃথিবীরও তেমনি উপর থেকে নিচের দিকে ৪টি স্তর আছে।

১. ভূ-ত্বক (crust) ঃ এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৭-৪৮ কিঃ মিঃ
এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে ১০ কি মি, পর্যন্ত পুরু

লিথোস্ফিয়ার ১০০ কি, মি, পুরু।

উপরের অংশ

২. ম্যানটেল (Mantale) ঃ

ভিতরের অংশ (এসথিনোস্ফিয়ার)। এটা তরল।

বাহিরের কোর

৩. কোর (Core) ঃ

ভিতরের কোর

গরম ম্যাগমা (Hot Magma)

৪. ম্যাগমা ঃ

ঠাণ্ডা ম্যাগমা (Cooler Magma)

ভূত্বক ও ম্যানটেলের উপরের অংশ নিয়ে লিথোস্ফিয়ার গঠিত।

এ স্তর শীতল ও কঠিন। ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে ১০০ কিঃ মিঃ পুরু। এটি (লিথোস্ফিয়ার) ৭টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খণ্ড তরল এসথিনোস্ফিয়ারের উপর ভর করে চলে। এগুলোকে প্লেট বলে। প্লেটগুলো হচ্ছে ইউরেশিয়ান প্লেট, এ্যারাবিয়ান প্লেট, অস্ট্রালো ইন্ডিয়ান প্লেট, এ্যান্টার্কটিকা প্লেট, প্যাসিফিক প্লেট, উত্তর আমেরিকান প্লেট ও দক্ষিণ আমেরিকান প্লেট।

সহজে বুঝার জন্য প্লেটগুলোকে কলা গাছের ভেলার মত মনে করতে পারেন। মানুষ যেমন ভেলায় চড়ে পানির উপর দিয়ে চলতে পারে তেমনি মহাদেশসমূহ ৭টি প্লেটের উপর ভর করে ধীর গতিতে চলে। প্রতি বছরে মাত্র ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার করে অগ্রসর হচ্ছে। এক সময় মহাদেশগুলি একত্রে একদিকে আর সমুদ্রগুলি অন্যদিকে ছিল। অর্থাৎ পানি একদিকে আর ভূমি আরেক দিকে। পরে আস্তে আস্তে প্লেটগুলির চলনের ফলে ভূভাগ মহাদেশসমূহে এবং পানি মহাসাগরে বিভক্ত হয়ে গেছে। মহাদেশগুলি সরে যাওয়ার কারণে যমীন প্রসারিত হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ـ (الرعد : ٣)

www.nagorikpathagar.org

"তিনি ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সূরা রাদ ১৩ ঃ আয়াত ৩)

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভূমির প্রসারণের কথা প্রথম বুঝতে পেরেছে ১৬২০ সালে। বর্তমানে এ তত্ত্বের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। একে "থিওরি অব প্লেট টেকটোনিক্স" (Theory of plate techtonics) বলা হয়। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে সহজেই অনুমান করা যায় সবগুলি মহাদেশ কাছে আনলে যেন খাপে খাপে মিলে যায়।

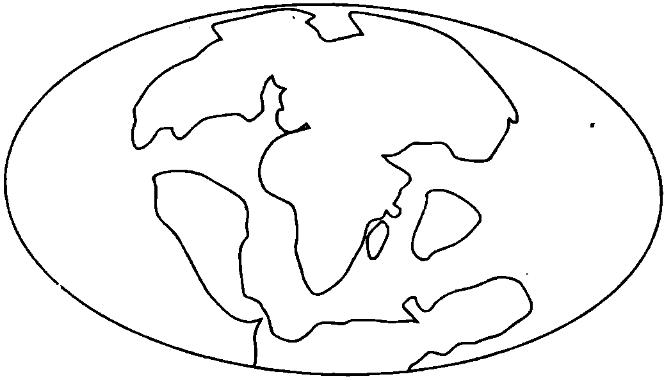

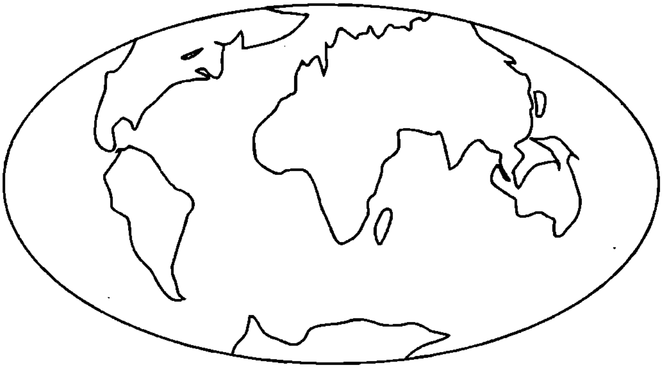

পৃথিবীর মানচিত্র

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ আমেরিকা ১৩.৫ মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকা থেকে সরতে শুরু করেছিল। আর এভাবে আটলান্টিক মহাসাগর তৈরি হতে থাকে। ৪ কোটি বছর আগে অস্ট্রেলিয়া অ্যানটার্কটিকা মহাদেশ থেকে ছুটে এসেছে। মহাদেশগুলি সরে যাওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠ খণ্ড খণ্ড হয়ে ৭টি মহাদেশে বিভক্ত হওয়াতে সমুদ্র থেকে মহাদেশের মধ্যভাগের দূরত্বও কমে গেছে। আর অধিক পরিমাণ ভূখণ্ডের কিনারা সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে এসেছে এবং মাটির নিচের পানি (ground water level) উপরে উঠেছে। তা না হলে মরুভূমির পরিমাণ অনেক বেশি হত এবং উর্বরা অঞ্চলের পরিমাণ অনেক কমে যেত।

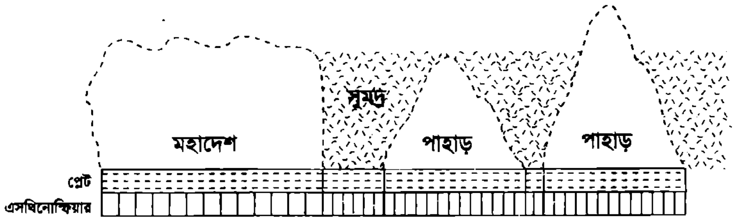

চিত্র

প্লেটগুলি যখন চলতে থাকে তখন একটা প্লেট আরেকটা প্লেটকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার ফলে প্লেটের কিনারা বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছে। প্লেটের অন্যান্য প্রকার বিক্রিয়ার কারণে যেমন- ভূমিকম্প, অগ্নোৎপাত ইত্যাদির ফলেও পর্বতমালা সৃষ্টি হয়। কাজেই পাহাড়ের উৎপত্তি ভূ-পৃষ্ঠের ১০০ কিঃ মিঃ নিচের প্লেট থেকেই। কাজেই ছোট বড় প্রায় সব পাহাড়েরই এমন কি সমুদ্রের মধ্যের পাহাড়ের গোড়া (Root) ও প্লেটের উপর অবস্থিত। বিল্ডিং করার সময় যেমন সব পিলারের গোড়া (Base) মাটির নিচে একই লেভেল (level) থেকে ভিত্তি দেয়া হয় যাতে করে বিল্ডিংয়ের ভ্যালান্স (Balance) বা ভারসাম্যতা ঠিক থাকে এবং ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে বিল্ডিং বাঁকা হয়ে বা ধ্বসে পড়ে না যায়। চেয়ার-টেবিলের পায়াগুলোও একই উচ্চতায় রাখা হয় যাতে করে ঠক্ ঠক্ বা টলমল না করে। তেমনিভাবে পৃথিবীর পাহাড়গুলির গোড়া (Base) নিচে একই লেভেলে থাকাতে পৃথিবী ইচ্ছামত নড়া-চড়া করতে বা বাঁকা হয়ে এদিক সেদিক চলে যেতে বা টলমল করতে পারে না। পাহাড়গুলি মূলতঃ পৃথিবীর খুঁটি।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ (النباء : ٦ ـ ٧)

www.nagorikpathagar.org

"আমি কি ভূমিকে বিছানা ও পর্বতকে কীলক[৩] (পেরেক) সদৃশ্য করি নাই?" (সূরা নাবা ৭৮ ঃ আয়াত ৬ -৭)

وَالْقَىٰ فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَاَنْهَرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔

(النحل : ١٥)

"এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।"

(সূরা নহল ১৬ ঃ আয়াত ১৫)

Circus এ দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ছাতা বা অন্য কিছু ধরে রাখা হয় ভ্যালান্স ঠিক রাখার জন্য। তেমনি পাহাড়ের উচ্চতাও পৃথিবীর ভ্যালান্স ঠিক রাখে।

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۔ ۔ (الانبياء : ٣١)

"এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত, যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক চলিয়া না যায়।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৩১)

পাহাড় পর্বত থেকে পানি প্রবাহিত হতে হতে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে জমির প্রসারণ, উর্বরা বৃদ্ধি ও সর্বত্র পানি পাওয়ার ফলে গাছপালা, তৃণ-লতা জন্মেছে।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۔ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۔ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۔
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۔ (النزعت : ٣٠-٣٣)

"এবং তারপর তিনি যমীনকে বিছাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা হইতে পানি ও গাছপালা জন্মাইয়াছেন এবং তাহাতে পর্বতসকল দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্য।"

(সূরা নাযিয়াত ৭৯ ঃ আয়াত ৩০-৩৩)

এবার পৃথিবীর পরিণতির আলোচনায় আসা যাক। সূর্য যখন লাল দানবে পরিণত হয়ে বুধ শুক্রকে গ্রাস করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন পৃথিবীর উপরিভাগের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। আর সেই সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, পানি, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি। এছাড়াও অতি দ্রুত গতিতে মহাদেশের নিচের প্লেটগুলিও একে অপরের গায়ে ভয়ংকরভাবে ধাক্কা মারবে

---

[৩] (কীলক হচ্ছে তাঁবু টানার দড়ি বাঁধার জন্য মাটিতে পোতা খুঁটা)

www.nagorikpathagar.org

যেমন কয়েকটা ভেলা পুকুরে চলার সময় একটির সাথে আরেকটির ধাক্কা লাগে। ধাক্কার কারণে পৃথিবী কাঁপতে থাকবে এবং এ কম্পন হবে বিরামহীন ফলে পাহাড় পর্বত ও একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করবে এবং পৃথিবীর উপরাংশের সবকিছু অতি উত্তাপে পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হবে। আল্লাহ্ বলেন,

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ـ (النمل : ٨٨)

"তুমি পর্বতমালা দেখিতেছ, মনে করিতেছ, উহা অচল, অথচ উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চারমাণ (মেঘমালার ন্যায় উড়িতে থাকিবে)।"

(সূরা আল নাম্‌ল ২৭ ঃ আয়াত ৮৮)

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ـ (المعارج : ٩)

"এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙিন পশমের মত।"

(সূরা মায়ারিজ ৭০ ঃ আয়াত ৯)

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ـ (المرسلت : ١٠)

"আর যখন পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া হইবে।"

(সূরা মুরসালাত ৭৭ ঃ আয়াত ১০)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ـ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ـ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ـ

(الواقعة : ٤-٦)

"যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে, ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।"

(সূরা ওয়াকিয়া ৫৬ ঃ ৪-৬ আয়াত)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (ط) وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (ط) إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ـ (النحل : ٧٧)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ৭৭)

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ـ (الحاقة : ١٤)

"পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" (সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯ ঃ আয়াত ১৪)

www.nagorikpathagar.org

উপরে কুরআনের এতসব বাণী যা বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে হুবহু এক। তা কি প্রমাণ করে না যে ১৫০০ বছর পূর্বে বর্ণিত একথা কোন প্রকারেই মানুষের বক্তব্য হতে পারে না?

সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে ১০ গুণ বড় তারার পরিণতি

যে তারার ভর যত বেশি তার আয়ু তত কম। কারণ এরকম তারাগুলি অধিকতর দ্রুত হারে তাদের জ্বালানি হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ করে ফেলে। হাইড্রোজেন থেকে প্রথমে হয় হিলিয়াম ও পরে হিলিয়াম পুড়ে কার্বন ও অক্সিজেন তৈরি হয়। কার্বন ও অক্সিজেন পুড়ে সিলিকন এবং সিলিকন পুড়ে লোহা তৈরি হয়।

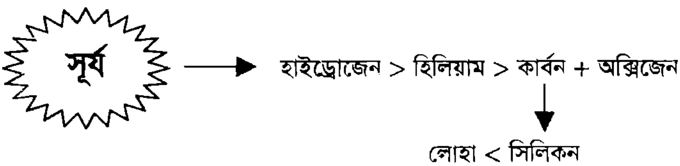

তারার কেন্দ্রে লোহায় পরিপূর্ণ হওয়ার মানেই তারাটির সর্বশেষ পর্যায়, কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। লোহা তাপ বের করে দেয়ার পরিবর্তে তাপ শোষণ করে নিয়ে যায়। ফলে তারার কেন্দ্রে চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপে কেন্দ্রের (কোর) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। তাপ বৃদ্ধির ফলে পারমাণবিক চুল্লী তৈরি হয়ে তাপ আরও বৃদ্ধি হতে থাকে। এক কথায়, এরূপ তারকার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে কেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ জনিত সংকোচনের ফলে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এ উত্তাপের ফলে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে। এর নাম সুপার নোভা (Super Nova) বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয় কোটি কোটি মাইল এবং বিস্ফোরণের শক্তি তারার বাইরের অংশ অসীম মহাবিশ্বের দূরে নিক্ষেপ করে দেয় অতি সূক্ষ্ম ধূলির আকারে। আমদের পৃথিবী যদি এই বিস্ফোরণের এলাকার (Area) মধ্যে পড়ে তাহলে তার বায়ুমণ্ডল জ্বলে উঠবে। ধুলি আর গ্যাসের ঘর্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে সমস্ত আকাশ। আকাশে দেখা যাবে শুধু আগুন আর আগুন। বহিরাগত মেঘ ও ধুলির তাপের কারণে গলিত ধাতুর ন্যায় দেখাবে।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ - (المعارج : ٨)

"সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর ন্যায়।"

(সূরা মায়ারিজ ৭০ ঃ ৮)

সূর্যের চেয়ে বড় তারাগুলো সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে যখন বাহিরের অংশ টুকরো টুকরো হয়ে অসীম মহাশূন্যের দুর দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে

তখন তারাটি ওজন হারিয়ে ফেলে। ফলে এ স্থানে তৈরি হয় নিউট্রন স্টার বা পালসার অথবা ব্লাকহোল (কাল গহ্বর)।

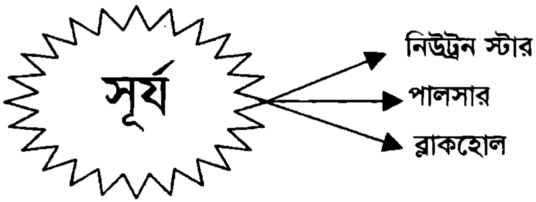

ব্লাকহোলের পরিণতি

সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে ১০ গুণ বড় তারা সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর নিউট্রন স্টার বা পালসার না হয়ে একটি ব্লাকহোল তৈরি করে। ব্লাকহোল আশ-পাশের সবকিছু- গ্রহ, উপগ্রহ, তারকারাজি, অন্য ব্লাকহোল সবই- প্রচণ্ড টানে ভিতরে শোষণ করে ধ্বংস করে ফেলে।

ব্লাকহোল কখনও দেখা যায় না। কারণ এর ভিতর থেকে কোন আলোই বের হয়ে আসতে পারে না। কোন বস্তু যদি ব্লাকহোলের প্রচণ্ড টানে এর পরিধিতে এসে পৌঁছে তখন বস্তুটি চাপের করণে খুবই ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে ব্লাকহোলে প্রবেশ করে। ব্লাকহোলে ঢুকার সময় রঞ্জনরশ্মি (X-ray) ত্যাগ করে ভিতরে বস্তুটি অদৃশ্য হয়ে যায়। যেহেতু ব্লাকহোল দেখা যায় না এজন্য রঞ্জন রশ্মি এর উৎপত্তি থেকেই ব্লাকহোলের অস্তিত্ব জানা যায়। ব্লাকহোল থেকে কোন তথ্যই প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। অথচ এই ব্লাকহোলের মধ্যেই নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যা ১৫০০ বছর পূর্বে মহান স্রষ্টা জানিয়ে দিয়েছেন।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ . (الواقعة : ٧٦،٧٥)

"শপথ সে পতন স্থানের যেখানে নক্ষত্রসমূহ (তারা) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদি তোমরা জানিতে উহা অবশ্যই এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ।"

(সূরা ওয়াকিয়া ৫৬ ঃ আয়াত ৭৫-৭৬)

আগেই বলেছি, ব্লাকহোল থেকে কোন আলোক রশ্মিই বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু লক্ষ কোটি বছর পর ব্লাকহোল থেকে গামা রশ্মির বিকিরণের ফলে ব্লাকহোলও বিলীন হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। আবার মহাবিশ্বের সৃষ্টিতেও আমরা দেখেছি বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে । এখানেও অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্ব (বিলীন) হয়ে যাবে। ফলে বস্তুর অবিনাশিতাবাদ ধর্ম [৪] আর টিকল না। এটিই প্রমাণ করে শূন্য (০) থেকে বস্তুর সৃষ্টি আর বস্তু থেকে শূন্য (০)।

---

৪ (বস্তু ধ্বংস ও করা যায় না সৃষ্টি ও করা যায় না, কেবল এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে অথবা বস্তু থেকে শক্তি তৈরি করা যায়।)

www.nagorikpathagar.org

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ـ (القصص : ٨٨)

"আল্লাহর অস্তিত্ব (সত্ত্বা) ব্যতীত সবকিছুই নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" (সূরা কাছাছ ২৮ ঃ আয়াত ৮৮)

এতক্ষণ পৃথক পৃথকভাবে পৃথিবী ও তারাসমূহের পরিণতির কথা জানতে পারলাম। কিন্তু একত্র সারা মহাবিশ্বের পরিণতি কি হবে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

এ মহাবিশ্বে দুটি শক্তি কাজ করে-

১. সম্প্রসারণ শক্তি এবং ২. মহাকর্ষ শক্তি।

সম্প্রসারণ শক্তির কারণে প্রতিটি তারা ও গ্যালাক্সি একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আবার মহাকর্ষ শক্তির কারণে প্রতিটি গ্যালাক্সি একে অপরকে আকর্ষণ করে (কাছে টানে)। তবু এরা পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে পারে না। কারণ সম্প্রসারণ শক্তি মহাকর্ষ শক্তির চেয়ে বেশি।

↓ **মহাকর্ষ শক্তি** ⇄ **সম্প্রসারণ শক্তি** ↑↑

কাজেই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। আস্তে আস্তে সম্প্রসারণ শক্তির ক্ষমতা কমে যেয়ে মহাকর্ষ শক্তির ক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে গ্যালাক্সিসমূহ কাছে ছুটে আসতে থাকবে।

↓↓ **মহাকর্ষ শক্তি** ⇄ **সম্প্রসারণ শক্তি** ↑

সময় যতই অতিক্রান্ত হবে, গ্যালাক্সিগুলির পরস্পরের দিকে ছুটে আসার গতিও ততই বাড়তে থাকবে। একটি ফোলানো বেলুনের বাতাস বেরিয়ে যেতে থাকলে যেমন সংকোচিত হতে থাকে তেমনি মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের পরিবর্তে কেন্দ্রের দিকে সংকোচিত হতে থাকবে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের উল্টা দিকে দৌড়াবে। Video ক্যাসেটকে রি-ভিউ (Review) করলে লক্ষ করবেন, শেষের দিকের ঘটনা প্রথম দিকে উল্টা চলছে মানে শেষ ঘটনাটা আরম্ভ আর আরম্ভটা হবে শেষ। কথা বলার সময় মুখ খুলে কথা বলে কিন্তু রিভিউয়ের সময় মনে হবে খোলা মুখ বন্ধ করা হচ্ছে। তেমনি সংকোচনের সময় কোটি কোটি মাইল দূরের গ্যালাক্সি ও তারকারাজি কেন্দ্রের দিকে চলে আসতে থাকবে। সেজন্য পৃথিবীও সূর্যের কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসতে আরম্ভ করবে, কিয়ামতের পূর্বে সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদয় হবে।

সহীহ্ মুসলিম শরীফের রিওয়াতে হুযায়ফ ইবনে উসায়েদ বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ ততদিন কেয়ামত হবে না- (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (২) দুখান তথা ধোঁয়া (৩) দাব্বা (৪) ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব (৫) ঈসা (আ) এর অবতরণ (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধস (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব

www.nagorikpathagar.org

উপদ্বীপে ভূমিধস (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

সমস্ত ব্লাকহোল, গ্যালাক্সি ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব মহাবিশ্বের কেন্দ্রের উপর পতিত হবে। ইহাকে আমেরিকান বিজ্ঞানী Freeman Dyson নাম দিয়েছেন Big Crunch. তার দাবি, পুনরায় মহবিশ্ব এক বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে। আর এটাই হলো- Close Big Bang বা Big Crunch.

বর্তমানে Closed Big Bang যা দাবি করছে, আল কুরআনে তার বর্ণনা অনেক আগেই এসেছে।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ـ (الحج : ١)

"হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে। কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ১)

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ـ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ـ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ـ

(الحاقة : ١٣ـ١٦)

"যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, একটি মাত্র ফুৎকার। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর সেইদিন উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।"

(সূরা আল হাক্কাহ ৬৯ ঃ আয়াত ১৩-১৬)

১৫০০ বছর পূর্বে কুরআন যখন নাযিল হয় তখন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশের অন্যান্য তারকারাজি, গ্যালাক্সি, ব্লাকহোল সম্পর্কে মানুষের কি ধারণাই বা ছিল? সীমাহীন মহাবিশ্বের এত ব্যাপকতার কথাতো একেবারেই ছিল অজানা। এমনকি বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগেও কতজন নিখুঁত জ্ঞান রাখেন মহাবিশ্ব সম্পর্কে? অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন বদ্ধমূল ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, একদিন এই মহাবিশ্বের কোন চিহ্নই থাকবে না। এই মহাবিশ্ব একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আবার বিস্ফোরণের মাধ্যমেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর নিঃশেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের যে পরিবর্তন হবে বলে দাবি করেন তা হুবহু কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলির সাথে মিল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও সময় ব্যয় করে যা নতুন

www.nagorikpathagar.org

আবিষ্কার বলে দাবি করেছেন কুরআনের কাছে তা পুরনো বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কুরআন যখন নাযিল হয় তখন পৃথিবীর কোন মানচিত্র ছিল না। এমনকি তখনও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা এন্টার্কটিকা মহাদেশ আবিষ্কারও হয় নি। অথচ আমরা দেখলাম পৃথিবীর প্লেটগুলো মহাদেশকে বহন করে চলার ফলে মহাদেশ, মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা সৃষ্টি আর যমীন সম্প্রসারিত হয়ে উর্বরা হয়েছে যার ফলে নানা রকমের ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এসব বক্তব্য কুরআনের একই আয়াতে বা পরপর কয়েক আয়াতে কিভাবে বর্ণনা এলো? যেমন, আল্লাহ পাক বলেন-

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ـ (الحجر : ١٩)

"আর ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করিয়াছি এবং তাহাতে (ভারি-ভারি) পর্বতসমূহ স্থাপন করিয়াছি এবং তাহাতে সব রকমের বস্তু এক নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিয়াছি।" (সূরা হিজর ১৫ ঃ আয়াত ১৯)

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ـ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ـ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ـ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ـ (النزعت : ٣٠-٣٣)

অর্থ ঃ এবং তারপর তিনি যমীনকে বিছাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা হইতে পানি ও গাছপালা জন্মাইয়াছেন এবং তাহাতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছেন তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারের জন্য।

(সূরা নাযিয়াত ৭৯ ঃ ৩০-৩৩)

কিয়ামতের পূর্বে চন্দ্র-সূর্য একত্র হয়ে আলোহীন হয়ে পড়বে, নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে ইত্যাদি ঘটনাসমূহ যা বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কার অথচ এসব কথা এসেছে পবিত্র কুরআনে ১৫০০ বছর পূর্বে। সে যুগে এমন কথা মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কারো পক্ষে বলা কি সম্ভব ছিল? জ্ঞানবান ছাড়া কেউ কি এসব বুঝতে পারে? তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

"এইরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।" (৭ ঃ ৩২) "এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।" (২৯ ঃ ৪৩) "ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।" (২৭ ঃ ৫২)

এটা কি প্রমাণ করে না কুরআন আল্লাহর কালাম? এরপরও কি সন্দেহ থাকতে পারে?

www.nagorikpathagar.org

মানব সৃষ্টি

পৃথিবীতে মানুষের প্রথম সৃষ্টি বা আগমন সম্পর্কে কুরআন, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এবং বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে অনেক।

কুরআনের মতে, প্রথমে মাটি ও পানি থেকে একজন পুরুষ (আদম আ) আর সেই পুরুষ থেকে একজন নারী (হাওয়া আ) পরে সেই পুরুষ ও নারীর বিবাহের ফলে পরবর্তী বংশধারা {হযরত ঈসা (আ) ছাড়া} একই নিয়মে চলে আসছে। আদম (আ) এর পর সরাসরি আর মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে না। কুরআন ও বিজ্ঞানের মতে মানব সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার আগে বর্তমানে বহুল আলোচিত ডারউইনের "মানব বিবর্তনবাদ" তত্ত্বটি সম্পর্কে একটু বলা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্ব

ডারউইন মনে করেন, বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, এটি তার ধারণা বা মতবাদ (Hypothesis), প্রমাণিত কোন কিছু নয়। এখানে তর্কে না গিয়ে যদি মেনেও নেয়া হয়, মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা হলে বানর হয়েছে কোথা থেকে? বানর থেকে যদি মানুষ হত তবে মানুষ থেকেও এতদিনে অন্য কোন জীব হত। আবার সর্বপ্রথম কিভাবে বানর বা অন্য প্রাণীর উৎপত্তি হল? জীববিজ্ঞানীদের মতে, জড় পদার্থ থেকে অ্যামিবা (Amoeba), ভাইরাস ও বিভিন্ন জীবকোষ সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে। তাহলে প্রথম যদি এরা জড়বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েই থাকে তবে আজও কেন নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হচ্ছে না? আর প্রথম শুরুটাই বা করলেন কে? যাক বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডারউইনের মতবাদটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ব্যাখ্যায় টিকছে না বিধায় বাতিল করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র কিছু নাস্তিক এখনও এ তত্ত্বটিকে একশ ভাগ সত্য বলে মেনে নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি মিথ্যা (তত্ত্বের অবাস্তবতা) প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। যেমন-

ক. যদি মানুষ বানরের বিবর্তনের ফলেই হয়ে থাকে, তবে এখনও কেন বানর বিবর্তন হয়ে মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে না? আবার মানুষ থেকেই বা অন্য কিছু হচ্ছে না কেন?

খ. বানরের একটি লম্বা লেজ ও সারা শরীর লোমে আবৃত। মানুষের কেন এমনটি নেই?

গ. মানুষ ও বানরের ক্রোমোসোম সমান নয়। মানুষের ক্রোমোজোম ৪৬টি আর বানরের ৫৪ থেকে ৭৮টি।

www.nagorikpathagar.org

ঘ. মানুষ যদি বানর থেকে বিবর্তিত হয়েই থাকে তবে মানুষ ও বানরের রক্তের গ্রুপ একই হওয়ার কথা। তাহলে অতি সহজেই বানরের রক্ত মানুষের শরীরে দেয়া যেত। অথচ রক্তের গ্রুপের ভিন্নতার কারণে কোনদিনই বানরের রক্ত মানুষের শরীরে দেয়া যাবে না।

ঙ. মানুষের ব্রেইন বা মস্তিষ্কে প্রত্যেকটা কাজের জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্র (Centre) রয়েছে। কথা বলার জন্য বানর, গরিলা বা অন্য কোন প্রাণীর মস্তিষ্কে এ ধরনের কেন্দ্রের (Centre) সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া মানুষের বিচার ক্ষমতা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি, নতুন নতুন আবিষ্কারের ক্ষমতা ইত্যাদিও কি বিবর্তনের ফল? অথচ এসব বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

মানুষ যে দেখতে ঠিক মানুষেরই মত, বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মত নয়-তার কারণ মানুষের DNA (DeoxyRibo Nucleic Acid) ওদের DNA থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীরই রয়েছে তার নিজস্ব পরিচায়ক সংবলিত আলাদা আলাদা DNA। আমরা জানি প্রাণীদের দেহ অনেকগুলি কোষ (cell) নিয়ে গঠিত। DNA থাকে প্রত্যেকটি কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে। জীবনের শুরু অবশ্যই DNA থেকে। DNA এর গঠনপদ্ধতি খুবই জটিল। এ DNA ই প্রাণের মৌলিকতম অণু বা বংশগতির বাহক। চুলের, গায়ের এবং চোখের রং, কথা বলার স্বর, লম্বা, চিকন, মোটা দেহ ইত্যাদি সবই DNA নির্ধারণ (Control) করে। মাত্র সেদিন DNA এর গঠন আবিষ্কার করেন জেমস্ ওয়াটসন (James Watson) এবং ফ্রাংসিস-গ্রিক (Francies-Grick)। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে DNA তৈরি করে প্রাণের উৎস আবিষ্কার করার জন্য দিনরাত কাজ করলেন। এ পরীক্ষা চালিয়ে তারা হতাশ হলেন। কারণ DNA তৈরি হল ঠিকই কিন্তু এতে প্রাণ আসল না। মূলত DNA এমন একটি জটিল অণু যা সহজে পরিবর্তন হয় না। সেজন্য দেখা যায় একজন মানুষের আঙ্গুলের রৈখিক বিন্যাস আরেকজনের সাথে কখনও মিলে না। (পরে এ ব্যাপারে আলোচনা থাকবে।) আঙ্গুলের অগ্রভাগে যে রৈখিক বিন্যাস ফুটে উঠে তার প্রতিলিপি থাকে DNA এর মধ্যে। তাই DNA কে বলা হয় "The Hereditary blueprint for life."

এটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আর এই DNA মলিকিউলের (Molecule) একমাত্র রূপকার প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। ডারউইনের "অন দি অরিজিন অব স্পেসিস" বইতে সে নিজেও মানুষের বিবর্তনের বিষয়টা হালকভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি এ তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন অনেকটা প্রস্তাবনা কিংবা সুপারিশের আকারে।

www.nagorikpathagar.org

ফুলের পরাগরেণু কীটপতঙ্গ, বাতাস বা অন্য কোন বাহকের মাধ্যমে (একই ফুলের বা একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি) ফুলের গর্ভমুণ্ডের সাথে লেগে যায়। একে পরাগায়ন বা পলিনেশন (Pollination) বলে। এর ফলে ফল ও বীজের সৃষ্টি হয়। কীটপতঙ্গসমূহের ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে বা বাতাসের সাহায্যে কোন এক জাতির ফুলের পরাগ রেণু অন্য কোন অতি কাছাকাছি প্রজাতির ফুলের গর্ভকেশরে বা গর্ভমুণ্ডে প্রতিস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এবং দু'য়ের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বংশ রূপান্তর ঘটে না। অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রজাতির কোন পরিবর্তন হয় না বরং তা একই এবং অপরিবর্তনীয় থাকে।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - (الروم : ٣٠)

"আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই।" (সূরা রূম ৩০ ঃ আয়াত ৩০)

এম ভারনেট তার সুবিখ্যাত "ইভ্যূলিউশন অব দি লিভিং ওয়ার্ল্ড" পুস্তকে ডারউইনের একটি চিঠির বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এম ভারনেট প্যারিস থেকে প্রকাশিত তার ঐ পুস্তকে ডারউইনের এ চিঠিটির ফটোকপি পর্যন্ত মুদ্রিত করেছেন। এম ভারনেট মন্তব্য করেছেন, ডারউইনের ঐ চিঠির মূল কপি সংরক্ষিত রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (সূত্র ঃ এ, ডি, এম, এস, ৩৭,৭২৫ এফ ৬)। ১৮৬১ সালে টমাস থর্টন স্কয়ারকে লিখিত সেই পত্রে ডারউইন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, তিনি বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় সত্যই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া ১৮৬০ সালের ২২ শে মে তারিখে ডারউইন তার থিওরিকে অসম্পূর্ণ বলে গ্রেকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ডারউইনের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রিটিশ রাজকীয় ডাকঘর একটি ডাকটিকেট চালু করেছিল। তাতে দেখা যায়, ডারউইনের ছবির দু'পাশে দুটি সরীসৃপ। আর এ দুটি সরীসৃপ ডারউইনকে যেন বলছে, "জনাব, মেহেরবাণি করে শুনুন। আপনার থিওরীকে এড়িয়ে এই যে আমরা কোটি কোটি বছর যাবত আদিকালের সেই একই প্রজাতি হিসেবে রয়ে গেছি। .... ।"

অথচ এখনও অনেকে ডারউইনের মতবাদকে বাস্তব সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করেন, যার কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নেই।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে মানব প্রজনন

চিকিৎসাবিজ্ঞান বর্তমানে কিভাবে সন্তান জন্ম নেয়, সন্তান জন্ম নিতে পুরুষ ও মহিলাদের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অংশগ্রহণ করে এবং মাতৃগর্ভে কিভাবে ভ্রূণ তৈরি হয় আর ভ্রূণ কি কি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়- তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক ও নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করেছে।

সন্তান জন্ম নিতে মহিলাদের ডিম্বাশয়, জরায়ু এবং কিছু কিছু হরমোন অংশগ্রহণ করে। সন্তানের অবস্থানের জন্য মহিলাদের তলপেটের মাঝখানে জরায়ু নামক একটা আবাসস্থল আছে।

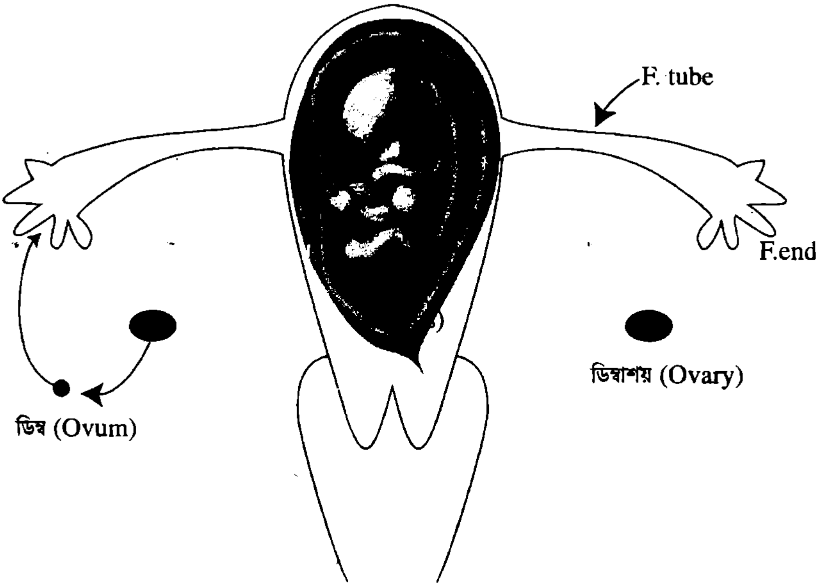

জরায়ু

জরায়ুর দুই পাশ থেকে দুটি Fallopian tube দুদিকে চলে গেছে। F. Tube এর দুই প্রান্তকে Fimbriated end বলে। F-tube এর দুই পাশে দুটি ডিম্বাশয় (Ovary) আছে। সাধারণত মহিলাদের প্রতিটি মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে একপাশের ডিম্বাশয় থেকে ১টি মাত্র পরিপক্ক ডিম্ব (Ovum) এবং পরবর্তী মাসিকের সময় অন্যপাশের ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্ব বের হয়ে তলপেটে চলে আসে। ১টির বেশি ডিম্ব বের হলে একাধিক সন্তান জন্ম হতে পারে। ডিম্বটি ডিম্বাশয় থেকে বের হওয়ার পর F-end এর মধ্য দিয়ে F-tube এর মধ্যে প্রবেশ করে। ডিম্বটি ডিম্বাশয় থেকে বের হওয়ার ৪-৫ দিনের মধ্যে পুরুষ স্ত্রীর মিলনের ফলে পুরুষের কাছ থেকে আসা শুক্রকীটের

www.nagorikpathagar.org

(Sperm) সাথে মিলিত হতে পারলে সন্তান জন্ম নেয়। সন্তান জন্ম নিলে আর কোন ডিম্ব তৈরি হয় না এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত মাসিকও বন্ধ হয়ে যায়। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব বের হওয়ার ৪/৫ দিনের মধ্যে শুক্রকীটের সাথে মিলিত হতে না পারলে ডিম্বটি মরে যায় এবং পুনরায় মাসিক (Cycle) আরম্ভ হয়ে যায়। এভাবে মহিলাদের মাসিকের চক্র (Cycle) চলতে থাকে প্রায় ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত। মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে ডিম্ব তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়া। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ম্যানোপজ বলে। তখন মহিলাদের সন্ত ান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা আর থাকে না। এতো গেল সংক্ষেপে মহিলাদের কথা। এবার দেখা যাক পুরুষের ক্ষেত্রে কী ঘটে? পুরুষ অঙ্গের নিচে ২টি অণ্ডকোষ থাকে। এই অণ্ডকোষের মধ্যে তৈরি হয় শুক্রকীট (Sperm).

একটিমাত্র শুক্রকীট ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রূণ (zygote) তৈরি করে। অণ্ডকোষে বীর্য তৈরি হওয়ার পর এই বীর্য মজুদ রাখার জন্যও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়- প্রয়োজনে সে বীর্য মজুদ স্থান থেকে বের হয়ে আসার জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট নালীপথ। এই নালীপথে বের হয়ে আসার সময় বিভিন্ন গ্ল্যান্ডস (Glands) থেকে বহুবিধ তরল পদার্থ বীর্যের সাথে মিশ্রিত হয়। কাজেই পুরুষের বীর্য হচ্ছে এমন একটি তরল পদার্থ যাতে রয়েছে শুক্রকীটের সাথে কয়েক প্রকার তরল পদার্থের সংমিশ্রণ। বীর্যের সাথে এসব তরল পদার্থ নির্গত হয় নিম্নলিখিত গ্ল্যান্ডস থেকে- (ক) অণ্ডকোষ (খ) সেমিনাল ভেসিক্যাল্স (গ) প্রস্টেট গ্ল্যান্ডস্ এবং (ঘ) মূত্রনালীর বিভিন্ন গ্ল্যান্ডস্‌সমূহ।

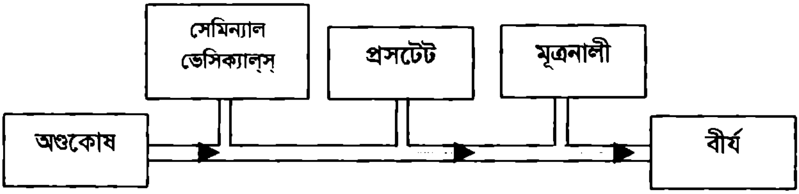

এই মিশ্রিত তরল পদার্থসমূহ শুক্রকীটকে নারীর ডিম্বের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু ভ্রূণ তৈরি করতে অংশগ্রহণ করে না। সাধারণত ভ্রূণ তৈরি হয় ডিম্বের ভিতরে ১টি শুক্রকীট প্রবেশের মাধ্যমে F.Tube এর মধ্যে। এখান থেকে ভ্রূণ চলে যায় জরায়ুতে। সেখানে ৫/৬দিন ঘোরার পর ভ্রূণটি জরায়ুর যেকোন স্থানে লেগে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞান এর নাম দিয়েছে ভ্রূণের রোপণ (Anchor)। জরায়ুর গায়ে লাগার স্থানে তৈরি হয় গর্ভফুল (Placenta)। এর মাধ্যমেই মায়ের শরীর থেকে সন্তান খাদ্য গ্রহণ করে। প্রথমে ভ্রূণটি জরায়ুর গায়ে দৃঢ়ভাবে আটকানো অবস্থায় ঝুলানো থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে দৃঢ়ভাবে আটকানোর পর প্রায় ২০দিন পর্যন্ত ভ্রূণটি চিবানো লম্বা গোশতের মত দেখায় এবং জোকের

www.nagorikpathagar.org

আকৃতি ধারণ করে। জোক যেমন প্রাণীর রক্ত চোষে তেমনি ভ্রূণও মায়ের রক্ত থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

এভাবে প্রায় নয় মাস দশ (২৮০) দিন পর শিশুটি জরায়ুর জীবন অতিবাহিত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে এই হল সংক্ষেপে মানব শিশুর জন্মের ইতিহাস। যা কুরআনের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ১৫০০ বছর পূর্বে কার পক্ষে এত বিস্তারিত "মানব প্রজনন" সম্পর্কে বলা সম্ভব তা একটু ভেবে দেখবেন কি?

কুরআনের আলোকে মানব প্রজনন

কুরআন যখন নাযিল হয় তখন জীবনের উৎস বা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা ধরনের গল্প এবং উপকথার ছিল ছড়াছড়ি। তখনকার দিনে যখনই মানুষের বংশ বিস্তারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো তখনই সেখানে ভুল বিবরণ দেয়া হত। অবশ্য কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, বংশ বিস্তারের জটিল প্রক্রিয়া বুঝার জন্য মানুষকে প্রথমে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। আবিষ্কার করতে হয়েছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র। শারীরবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, প্রসূতি বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন করতে হয়েছে। এসবই বর্তমান ধাত্রীবিদ্যার আবিষ্কারের ফসল। অথচ ধাত্রীবিদ্যার এতসব জ্ঞান অর্জন করার বহু পূর্বেই এসব আবিষ্কারের হুবহু বর্ণনা এসেছে পবিত্র কুরআনে। ১৫০০ বছর আগে অবতীর্ণ কুরআনে মানব প্রজনন সংক্রান্ত কোন বর্ণনাতেই কোন রকম ত্রুটিবিচ্যুতি নেই। মানুষ সৃষ্টিতে পানি ও মাটির উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে বলে কুরআনে ব্যাপকভাবে উল্লেখ রয়েছে। কুরআনের ২১ নং সূরাতে আল্লাহ পাক বলেন-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ـ (الانبياء : ٣٠)

"এবং প্রতিটি প্রাণবান বস্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। তবুও কি তাহারা ঈমান আনিবে না?" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৩০)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য প্রমাণের দ্বারা এই সত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে, পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই এবং পানিই হচ্ছে জীবন্ত জীবকোষ গঠনের প্রধানতম উপাদান। মানুষের রক্তে ৭৫% আর সারা শরীরে ৪৫% ই হচ্ছে পানি।

পানি ছাড়া জীবন আদৌ সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় যখনই অন্য কোন গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হয় তখন প্রথমেই যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়, তা হল সে গ্রহে জীবন রক্ষার উপযোগী পর্যাপ্ত পানি রয়েছে কিনা।

www.nagorikpathagar.org

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (ط) وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۔ (الفرقان : ٥٤)

"এবং তিনিই মানুষকে পানি (শুক্র) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বংশগত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক। আর আপনার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমতাবান।"

(সূরা ফুরকান ২৫ ঃ আয়াত ৫৪)

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۔ (النور : ٤٥)

"আর আল্লাহ্ প্রত্যেক জীবজন্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

(সূরা নূর ২৪ ঃ আয়াত ৪৫)

সমুদ্রের পানিতে যেসব উপাদান বিদ্যমান তা রক্তের মধ্যেও পাওয়া যায়। কি করে রক্তের উপাদান সমুদ্রের পানির উপাদানের মত হল? আর একথা ১৫০০ বছর পূর্বে কার পক্ষে বলা সম্ভব যে সকল প্রাণীই তৈরি হয়েছে পানি থেকে? একটু ভেবে দেখুন, শুধু রক্তই নয় প্রতিটি কোষের বেশকিছু অংশই হচ্ছে পানি। এটা কি প্রমাণ করে না কুরআন মহান স্রষ্টার অবিকৃত সত্য বাণী?

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا (ج) وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔ (المؤمن ٦٧)

"তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর 'আলাকা' হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই। যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।"

(সূরা মু'মিন ৪০ ঃ আয়াত ৬৭)

পানি ছাড়া মানুষ তৈরি করতে মাটিও ব্যবহৃত হয়েছে বলে কুরআনের দাবি। মাটিতে যেসব উপাদান আছে মানুষের শরীরেও সে সব উপাদান বিদ্যমান।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۔ (المؤمنون : ١٢)

"আর আমি মানুষকে মাটির উপাদান (সারাংশ) থেকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

(সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ আয়াত ১২)

www.nagorikpathagar.org

এখানে আল্লাহ তায়ালা মাটির উপাদান (সারাংশ) "সুলালাহ মিন ত্বিন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাটির উপাদান হচ্ছে - সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), অক্সিজেন (O_2), হাইড্রোজেন (H_2), নাইট্রোজেন (N_2) ইত্যাদি। গাছ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে এগুলো চুষে নেয়। তারপর বৃক্ষ ফল দেয়। যেমন- আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, আঙ্গুর। আবার খেতের ফসল যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, যব, আলু ইত্যাদি। ফল ও ফসল মানুষ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এ খাদ্য থেকেই মানুষের দেহে তৈরি হয় ডিম্ব ও শুক্র। পরে ডিম্বের মধ্যে শুক্রকীট প্রবেশ করে তৈরি করে ভ্রূণ। এই ভ্রূণ মাতৃগর্ভে রূপান্তরিত হয়ে একজন পরিপূর্ণ মানব শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং "সুলালাহ" (মাটির সারবস্তু) ই হচ্ছে মানুষ তৈরির প্রধান উপাদান যা থেকে মানুষ তৈরি হয়। অর্থাৎ পিতা-মাতার শরীরের খাদ্যের উপাদান (মানে মাটির উপাদান) থেকেই ডিম্ব ও শুক্রকীট (নুৎফা) তৈরি হয়।

সামান্যতম শুক্রকীট (নুৎফা) থেকে মানুষ তৈরি

একবার মিলনের ফলে পুরুষের কাছ থেকে প্রায় ৩.৫ সি সি তরল পদার্থ (Semen) বের হয়। এর ১ সি, সির মধ্যে থাকে প্রায় ১২ কোটি (১২০মিলিয়ন) শুক্রকীট। অতএব ৩.৫ সি, সির মধ্যে থাকে প্রায় ৪২ কোটি শুক্রকীট (Gyton's Physiology)। যে কোটি কোটি শুক্রকীট একবারে বের হয় তার মধ্য থেকে একটি মাত্র শুক্রকীটই সন্তান জন্ম নিতে অংশগ্রহণ করে। এই ৪২ কোটি শুক্রের মধ্যে ১টি শুক্রকীটের অংশ অতি সামান্য। ১ টা শুক্রকীটের অংশ হচ্ছে ৪২ কোটি ভাগের এক ভাগ = $\frac{১}{৪২ \text{ কোটি}}$ অর্থাৎ ১ কে ৪২ কোটি দিয়ে ভাগ করলে তবেই ১টি শুক্রকীটের অংশ পাওয়া যাবে। ডিম্ব ও শুক্রকীট খালি চোখে দেখা যায় না। শুধুমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্যেই দেখা সম্ভব। কুরআন যখন নাযিল হয় তখন ডিম্ব ও শুক্রকীট এবং এদের ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ আদৌ অবহিত ছিল না। এ ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণরূপে মানুষের অজানা। অথচ সে যুগে কুরআন ঘোষণা দেয়-

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ . (النحل : ٤)

"(আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন সামান্যতম পরিমাণ শুক্র (নুৎফা) হইতে। অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।"

(সূরা নাহ্ল ১৬ ঃ আয়াত ৪)

www.nagorikpathagar.org

এখানে আরবি নুৎফা শব্দটির তরজমা করা হয়েছে "সামান্য পরিমাণ শুক্র।" এ শব্দটি যে ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে তার অর্থ হচ্ছে "ফোঁটা ফোঁটা করে বা টিপ টিপ করে পড়া।" কোন পাত্রের সবকিছু ঢেলে ফেলে দেয়ার পর তলায় যা কিছু থেকে যায়, তা বুঝাবার জন্যই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা তরল পদার্থের সামান্য পরিমাণ বুঝায়। আর তরল পদার্থ বলতে এখানে শুক্রকেই বুঝানো হয়েছে, কারণ আরেকটি আয়াতেও শুক্র শব্দের সাথেই ব্যবহৃত হয়েছে —

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ (القيمة : ٣٧)

"সে (মানুষ) কি অতি সামান্যতম শুক্র ছিল না- যা সজোরে নির্গত হইয়াছিল?" (সূরা কিয়ামাহ্ ৭৫ ঃ আয়াত ৩৭)

পুরুষ বীর্যে শুক্রকীটের অস্তিত্ব আবিষ্কার এবং তার ভূমিকা সনাক্ত করা হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। অথচ এর অনেক আগেই কুরআন এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করেছে যা আধুনিক যুগে এসে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সত্য বলে প্রমাণিত হল।

এখন থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে এত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছিল না। তখন কোন মানুষ যত জ্ঞানীই হোক না কেন যা খালি চোখে দেখা যায় না তা সম্পর্কে এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এসব কি প্রমাণ করে না যে, এ বর্ণনাগুলি কোন মানুষের নয়- এ হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'লার। যিনি স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী। তিনি বলেন-

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (المؤمن : ٥٧)

"মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।" (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ আয়াত ৫৭)

أَأَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا ـ (النزعت : ٢٧)

"তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।" (সূরা নাযি'আত ৭৯ ঃ আয়াত ২৭)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ (البقرة : ٢)

"ইহা এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২)

www.nagorikpathagar.org

বীর্য সংমিশ্রিত তুচ্ছ তরল পদার্থের সমষ্টি

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ - (الدهر : ٢)

"নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রিত তরল পদার্থ হইতে।" (সূরা দাহ্র ৭৬ ঃ আয়াত ২)

এখানে "আমসাজ" শব্দের দ্বারা "সংমিশ্রিত তরল পদার্থের" কথা বলা হয়েছে। আগেই বলেছি শুক্রকীট থাকে এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে। এই তরল পদার্থ তৈরি হয় অণ্ডকোষ ছাড়াও সেমিন্যাল ভেসিক্যাল্স্ (Seminal Vesicles), প্রস্টেট (Prostate) গ্ল্যাণ্ডস এবং মূত্রনালীর গ্ল্যান্ডস্সমূহ থেকে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানব জাতিকে ১৫০০ বছর পূর্বেই জানিয়ে দিলেন সামান্যতম সংমিশ্রিত তুচ্ছ তরল পদার্থ হতেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ - (السجدة : ٨)

"অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাহার (মানুষের) বংশধরকে তুচ্ছ তরল পদার্থের সার নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সূরা সাজদা ৩২ ঃ আয়াত ৮)

অনুরূপ আয়াত এসেছে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে।

পুরুষের বীর্য বের হয় তরল পদার্থের সাথে মূত্রনালী দিয়ে। যেহেতু মূত্র নাপাক আর এই তরল পদার্থও বের হয় মূত্রনালী দিয়ে, কাজেই বীর্যকেও তুচ্ছ তরল পদার্থ বলে দাবি করা হয়েছে। আবার স্রেফ শুক্রকীটই সন্তান জন্ম নিতে অংশগ্রহণ করে। শুক্রকীট ছাড়া বাকি তরল পদার্থ শুক্রকীটকে চলতে সাহায্য করে মাত্র কিন্তু সন্তান জন্ম দিতে কোন ভূমিকাই পালন করে না। তাই বলা হয়েছে, তুচ্ছ তরল পদার্থের সার নির্যাস- শুক্রকীট থেকে মানুষ তৈরি করা হয়েছে। কুরআন নাযিলের সময়ে কে জানত শুক্রকীট ছাড়া বীর্যের সাথে মিশ্রিত তরল পদার্থ সন্তান জন্ম নিতে অংশ গ্রহণ করে না? এখানেই প্রশ্ন- কুরআন নাযিলের যুগে কারো পক্ষে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানা কি সম্ভব ছিল? আসলে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনে বর্ণিত ১৫০০ বছর পূর্বের ওহীকে নতুন করে সত্য বলে প্রমাণ করছে? এ কথাতো কারো অস্বীকার করার উপায় নেই, ভ্রূণতত্ত্বের এত কিছু আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হয়েছে কুরআন নাযিলের হাজার বছর পরে, মাত্র কদিন আগে। আধুনিক যুগে এসে। সুতরাং বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কার আমাদেরকে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। আর তা হ'ল- কুরআনের এসব বক্তব্য কিছুতেই কোন মানুষের বাণী বা বক্তব্য হতে পারে না। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে মহান স্রষ্টারই বাণী বা ওহী। এরপরও কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তবু কি ঈমান আনবেন না?

www.nagorikpathagar.org

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্যস্থিত নির্গত তরল পদার্থ হতে

আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আ'রাফে ঘোষণা দিয়েছেন-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ـ (الاعراف : ١٧٢)

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরদিগকে বাহির করেন।" (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ১৭২)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ـ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ـ (الطارق : ٥-٧).

"অতএব, মানুষের লক্ষ করা উচিত যে তাহাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে; তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে স্ববেগে নির্গত তরল পদার্থ থেকে যা নির্গত হয় পিঠের মেরুদণ্ড (Backbone) ও বুকের হাড়ের (Ribs) মধ্য হইতে।" (সূরা তারিক ৮৬ ঃ আয়াত ৫-৭)

ইবনে কাসীর "তারিবার" অর্থ করেছেন পাজরের নিচের ৪টি হাড়, উভয় স্তনের মধ্যবর্তী স্থান বা পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থান।

- আমরা জানি পুরুষের শুক্রকীট তৈরি হয় অণ্ডকোষে এবং ডিম্ব তৈরি হয় মহিলাদের তলপেটের ভিতরের ডিম্বাশয়ে। আর এই দুইয়ের মিলনের ফলে তৈরি হয় সন্তান। অথচ এখানে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন যে তরল পদার্থ হতে মানুষ তৈরি হয় তা আসে বুক ও পৃষ্ঠদেশের মধ্য থেকে। কোথায় অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় আর কোথায় বুকের পৃষ্ঠদেশ। এক স্থান শরীরের অতি উপর অংশে আরেক স্থান শরীরের অতি নিচে। দুস্থানের মধ্যে বেশ দূরত্ব। তবে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ভুল করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ্)। যিনি তৈরি করেন, তিনিই তো ঠিকমত বলতে পারেন।

প্রতিটি সন্তানের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হয় এককোষী ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে। সে মতে অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় তৈরি হয়, বুকের (ভিতরের) শেষের ৩টি ১০, ১১ ও ১২ নং বাঁকা হাড় (Ribs) যা পিঠের মেরুদণ্ডের হাড়ের (Backbone বা Vertibral colum) সাথে যে স্থানে লাগানো থাকে সেখানকার মেসোনেফ্রন্স (Mesonephrons) থেকে। প্রকাশ থাকে যে, মানুষের বুকের এক পার্শ্বে ১২টি এবং অপর পার্শ্বে ১২টি মোট ২৪টি লম্বা বাঁকা হাড় থাকে। উপর থেকে নিচের দিকে ১,২,৩, করে ক্রমান্বয়ে ১১, ১২ নাম্বার দিয়ে হাড়গুলি গণনা করা হয়। এগুলোকে পাঁজরের হাড় (Ribs) বলে।

www.nagorikpathagar.org

মাতৃগর্ভের ২ মাস বয়স থেকে পুরুষ সন্তানের অণ্ডকোষ আর মেয়ে সন্তানের ডিম্বাশয় উপরোক্ত মেসোনেফ্রন্স থেকে নিচে নামতে থাকে এবং জন্মের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এগুলি নিচে নেমে আসলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত যে, এদের নার্ভ (স্নায়ু) কন্ট্রোল উৎপত্তি স্থান মানে ১০, ১১ ও ১২ নাম্বার (Segment T_{10}, T_{11}, T_{12} of the spinal cord) বুকের হাড় (Ribs) মেরুদণ্ডের (Vertibra) যে স্থানে লাগানো থাকে সে স্থান থেকে যে নার্ভ বের হয়ে আসে সে নার্ভের মাধ্যমে। এ নার্ভই উত্তেজনা, মিলনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং বীর্য নির্গত করে। যদি কোন কারণে এই নার্ভ কাজ না করে বা অকেজো (Paralysis) হয়ে যায় তখন স্বাস্থ্য যতই ভাল থাকুক না কেন সঙ্গম করতে অক্ষম হয়ে যায়। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষত্বহীনতা (Impotance) বলে।

ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কে জানতো যে অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডের সাথে বুকের হাড়ের মিলন স্থানের "মেসোনেফ্রন্স" থেকে তৈরি হয় এবং মানুষের উত্তেজনা, মিলনের কার্যক্রম ওখান থেকে উৎপন্ন নার্ভের উপরই নির্ভরশীল। অথচ ১৫০০ বছর পূর্বে যখন মানুষ ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কিছুই জানত না তখন পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিচ্ছে, "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরদের সৃষ্টি করেন।"

সাধারণভাবে বলা হয়, পুরুষের পাঁজরার হাড় থেকে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক সময় কুরআন-হাদিসের বক্তব্য হিসেবেও এ ধারণাকে চালিয়ে দেয়া হয়। আসলে, এ বক্তব্য বাইবেলের (দেখুন, পুরাতন নিয়ম, ২ অধ্যায়, বাণী নং ২২)। সেখানে বলা আছে ঃ "সদা প্রভু আদম হইতে গৃহীত সেই পিঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন"- ইত্যাদি। অথচ বুখারী শরীফের 'বিবাহ' অধ্যায়ে, বলা আছে, শেষ নবী (সা) বলেছেন ঃ "স্ত্রীলোকেরা পাঁজরার (হাড়ের) মত; যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে যাবে-সুতরাং বাঁকা অবস্থায় তা থেকে ফায়দা গ্রহণ কর।" [৫] এখানে কোথায়ও 'পুরুষের পাঁজরা' থেকে 'নারী সৃষ্টির' কথা নেই; এমনকি হযরত আদম (আ) কিংবা বিবি হাওয়ার (আ) কথাও নেই। বরং সাধারণভাবে সর্বকালের স্ত্রী জাতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

---

[৫] {আরবিসহ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদিসটির জন্য দেখুন, সহী আল-বুখারী' ৫ম খণ্ড, প্রকাশনা- মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৭০।}

www.nagorikpathagar.org

জরায়ুতে ভ্রূণের পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ

কুরআনে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিশেষ বিশেষ পর্যায় সম্পর্কে যে বর্ণনা, তার সাথে ভ্রূণের ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত আজকের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞান পুরোপুরিভাবে মিলে যায়। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে কুরআনের এমন একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যায়নি যা ভ্রূণবিদ্যার সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে অমিল হয়েছে। বরং এতদসংক্রান্ত কুরআনের সব বর্ণনাই একদম সঠিক ও নির্ভুল। অথচ কুরআন নাযিলের সময় এসব বিষয় ছিল মানুষের একান্ত অজানা। এমনকি কুরআন নাযিলের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রজনন সংক্রান্ত এসব বিষয়ে মানুষ তেমন সঠিক কোন ধারণাতে পৌঁছতে পারেনি। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা মাতৃগর্ভে কিভাবে ভ্রূণ তৈরি হয় এবং ভ্রূণ কি কি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং এসম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ (العلق : ١ ـ٢)

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এমন কিছু (আলাক) হইতে যাহা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে।"

(সূরা আলাক ৯৬ ঃ আয়াত ১-২)

'আলাকের' প্রতিটি অর্থই ভ্রূণের জন্য প্রযোজ্য। যেমন- ঝুলে থাকা, জোঁকের মত, চুষে খাওয়া ও চিবানো বস্তু (চুইংগামকে দাঁতের মধ্যে রেখে চিবালে যেমন এর মধ্যে দাঁতের দাগ পড়ে এবং লম্বা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি)। যা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, কুরআনের এই বর্ণনা ডিম্বাণুর বাস্তব অবস্থার সাথেও পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ (المؤمنون : ١٣)

"অতঃপর উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।"

(মু'মিনুন ২৩ ঃ আয়াত ১৩)

রিয়াদে একদল মুসলিম টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূণবিদ্যার প্রফেসর ড. কিথ-মুরের নিকট কুরআনে বর্ণিত ভ্রূণ সম্পর্কীয় সব আয়াত একত্র করে উপস্থাপন করে এর সঠিকতা সম্পর্কে জানতে চান। ড. মুর শুধু অধ্যাপকই নন, তিনি ভ্রূণবিদ্যার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বই এর লেখক (Author of Text Book of The Developing Human)। তিনি সব আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, ভ্রূণ প্রথম দিকে কি করে

www.nagorikpathagar.org

'জোঁকের' আকৃতির রূপ নেয়। ভ্রূণ যে এক পর্যায়ে এই অবস্থা হয়, এটা তার আদৌ জানা ছিল না। কারণ তখনও এ তত্ত্ব আবিষ্কার হয়নি। তিনি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে এর সত্যতার কিছুই পেলেন না। পরে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে (২০ লক্ষ গুণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে) ভ্রূণকে অবিকল 'জোঁকের' আকৃতির ন্যায় লম্বা দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তার ভ্রূণবিদ্যা বই এর ৩য় সংস্করণে "আমাদের জন্মের পূর্বে" (Before We Are Born) এই অধ্যায়ে এমন কিছু যোগ করলেন যা প্রথম দুই সংস্করণে ছিল না। এমনকি তিনি পরে The Developing Human with Islamic Addition নামে নতুন ভ্রূণবিদ্যার (এমব্রায়োলজি) বই বের করেন। টরেন্টোতে এটি প্রকাশিত হওয়ার পর সারা কানাডায় আশ্চর্য রকম সাড়া পড়ে গেল। পত্রিকাগুলোতে হেডলাইন-এ খবর প্রকাশিত হতে লাগল। তন্মধ্যে একটি পত্রিকার হেড লাইন ছিল- Surprising thing found in ancient prayer book (পুরনো প্রার্থনার বই এ আশ্চর্য বিষয় পাওয়া গেছে)। এক পত্রিকা ড. মুরকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন না আরবরা হয়ত এ ব্যাপারটি অনেক আগে থেকেই জানত?" উত্তরে ড. মুর বললেন, "১৪০০ বছর পূর্বে কেউ এটি বলতে হলে তার এ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ থাকতে হবে। কেউ হয়ত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করে মুহাম্মদ (সা) কে ভ্রূণের সকল অবস্থা দেখানোর পর এ যন্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন অথবা ভেঙ্গে ফেলেছেন। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?"

ড. মুরের The Developing Human with Islamic Addition বইটি বর্তমানে দশটির ও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলছে।

যাহোক জোঁকের আকৃতি (আলাক) অবস্থার পর শুরু হয় ভ্রূণের আরেকটি পর্যায়। এ পর্যায়ে তৈরি হয় হাড়। পরে তা আবৃত হয় গোশত দিয়ে। ভ্রূণবৃদ্ধির জন্য দু'ধরনের গোশতের কথা উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে দুটি ভিন্ন শব্দ দ্বারা -

১. চিবানো গোশতের জন্য মুদগা যা থেকে হাড় তৈরি হয়

২. অক্ষত গোশতের জন্য লাহম যা শরীরের অন্য গোশতের মত।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ـ (المؤمنون :١٤)

"অতঃপর সে শুক্রবিন্দুকে দৃঢ়ভাবে আটকায়ে রাখি জরায়ুতে; পরে সেই দৃঢ়ভাবে আটকানো আলাক বস্তুটাকে পরিণত করি চিবানো গোশতের

পিণ্ডরূপে এবং সেই চিবানো গোশতের পিণ্ডকে রূপ দেই হাড়ে এবং সেই হাড়ের উপর আবরণ দেই অক্ষত গোশত দ্বারা।" (সুরা মুমিনুন ২৩ ঃ আয়াত ১৪)

শুরুতে ভ্রূণটি একটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডের আকারে থাকে এরপর ভ্রূণটি এমন এক পর্যায় অতিক্রম করে যা চিবানো মাংসের মতো দেখায়। এ মাংসের মধ্যেই হাড়ের কাঠামো গড়ে উঠে এবং হাড় পরে আবৃত হয় গোশত দ্বারা। তাছাড়া ভ্রূণের পরিবর্তনের সময় কোন কোন অঙ্গ পূর্ণাকৃতি আর কোন কোন অঙ্গ অপূর্ণাকৃতি অবস্থায় থাকে। পরে এ থেকেই পূর্ণাকৃতি এবং কিছু কিছু বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মহান স্রষ্টা বলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ ـ (الحج : ٥)

"হে মানুষ! উত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর আমি তোমাদিগককে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর 'আলাক' হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে- তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।

(সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ৫)

মাতৃগর্ভে শিশুটি একপ্রকার তরল পদার্থের (Amniotic fluid) মধ্যে ডুবে থাকে। এ তরল পদার্থসহ শিশুটি একটি পর্দায় (Amniotic membrane) মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মাতৃগর্ভে তিনটি স্তরের মধ্যে শিশুটি অবস্থান করে। يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ـ (الزمر : ٦)

"তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সূরা যুমার ৩৯ ঃ আয়াত ৬)

ড. মুরের মতে, অন্ধকার ৩টি যথাক্রমে- ১. পেটের দেয়াল (Abdominal wall) ২. জরায়ুর দেয়াল (Uterine wall) ৩. ভ্রূণ ও তরল পদার্থের আবরণ (Amniotic membrane)। এ তিনটি পর্দা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে এবং একটা থেকে আরেকটার ভিতরের দিকে

www.nagorikpathagar.org

ক্রমশ অন্ধকার বেড়ে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে মানুষ এই তিনটি পর্দার কথা জানতে পেরেছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা পুরুষের থাকে একটামাত্র পর্দা- পেটের দেয়াল। তাদের জরায়ু থাকে না বলে দ্বিতীয় পর্দা নেই। আবার সকল মহিলাদেরই দুটি পর্দা থাকে- ১. পেটের দেয়াল ও ২. জরায়ুর দেয়াল। কিন্তু যারা গর্ভবতী নয় তাদের তৃতীয় পর্দা (Amniotic membrane) থাকে না। যা বাচ্চা পেটে আসার সময় তৈরি হয় আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে বের হয়ে চলে যায়। তা হলে কিভাবে গর্ভবতী মহিলার বাচ্চা তিনটি পর্দার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তা ১৫০০ বছর পূর্বে কুরআনে আসল অথচ গর্ভবতী নয় এমন মহিলার তিনটা পর্দা থাকে না।

মোট কথা হচ্ছে, মানুষের আদি উৎস তথা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য প্রমাণ একদিকে যেমন ডারউইনের বানর তত্ত্বকে বাতিল করে দিচ্ছে, তেমনিভাবে তা সর্বশেষ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাপনা ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআনের তথ্য ও বক্তব্যকে করছে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিল্ডিং যেমন ইট, সিমেন্ট, বালি, লোহা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয় তেমনি মানুষ ও পানি, মাটির সার নির্যাস (উপাদান) ইত্যাদির তৈরি যা বিজ্ঞান আজ অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উদ্‌ঘাটন করল। অথচ যা বিনা পরীক্ষায় সহজ-সরল ভাষায় এসেছে কুরআনের পাতায় ১৫০০ বছর পূর্বে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ (واقعة : ٦٢)

"তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?" (সূরা ওয়াকি'আ ৫৬ ঃ আয়াত ৬২)

মানুষের দেহের উপাদান ও ভ্রূণতত্ত্বের এত বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন নাযিলের সময় কোন মানুষের পক্ষে জানা কি সম্ভব?

"কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না, না সামনের দিক থেকে না পিছনের দিক থেকে। উহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাময় আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।" (সূরা হামীম-আস্‌-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৪২)

"ইহা এমন এক কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা এক মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

"উহারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে।" (৬১ ঃ ৮)

"নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। " (১৫ ঃ ৭৫)

www.nagorikpathagar.org

জীবন এবং রূহ এক নয়

জীবন (হায়াত), আত্মা / প্রাণ (রূহ) ও মৃত্যু (মওত)

জীবন ঃ আপনারা জড় ও জীব কি এবং এ দুয়ের পার্থক্য ভালভাবে জানেন। যে খাদ্য গ্রহণ করে, ছোট থেকে বড় হয়, বংশ বাড়ায়, শ্বাস নেয় এবং এক সময়ে মৃত্যুবরণ করে তাকে জীব বলে। এদের জীবন আছে। জীবন সম্পর্কে মহান স্রষ্টা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ (ط) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ (ط) ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ - (الانعام : ٩٥)

"আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে?"

(সূরা আনআ'ম ৬ ঃ আয়াত ৯৫)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ط)وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ - (الملك : ٢)

"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনিই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

(সূরা মূলক ৬৭ ঃ আয়াত ২)

রূহ ঃ আত্মা বা রূহ বস্তুটি কী? নিদ্রাকালে বা অজ্ঞান অবস্থায় এটা কি দেহে থাকে, না দেহ ত্যাগ করে চলে যায়? অদৃশ্য রূহ কি জিনিস মানুষ তা দেখতে পারে নি বা দেখতে পাবেও না কোনদিন। এ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ বিশেষ। তা পদার্থও নয় শক্তিও নয়। বিজ্ঞানের এত বিপুল অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান রূহ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি এবং পারবেও না। নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহই এর সত্যতার দলিল। রূহ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে -

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (ط) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا - (بنی اسرائیل ٨٥)

"ইহারা আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে আপনি বলিয়া দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট এবং তোমাদিগকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭ ঃ আয়াত ৮৫)

www.nagorikpathagar.org

ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

(ط) (السجدة : ٩)

"অতঃপর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে নিজের পক্ষ হইতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু, অন্তকরণ প্রদান করিয়াছেন?" (সূরা সাজ্‌দা ৩২ ঃ আয়াত ৯)

আধুনিক প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ্ আল বুখারী ২য় খণ্ডের ৩০৮৬ নং হাদিসে বর্ণনা এসেছে- "মাতৃগর্ভে ১২০ (৪০ + ৪০ + ৪০) দিনের দিন রূহ ফুঁকে দেয়া হয়।" এতে বুঝা গেল মাতৃগর্ভে প্রথম ৪ মাস সন্তানের দেহে রূহ থাকে না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এ সময় সন্তান কি জীবিত ছিল না? অথচ মৃত শুক্র ও মৃত ডিম্ব সন্তান জন্ম দিতে পারে না। ভ্রূণ আরম্ভ হয়েছেই জীবিত শুক্র ও জীবিত ডিম্ব দিয়ে। অতএব, ভ্রূণ প্রথম থেকেই জীবিত কিন্তু রূহহীন। সন্তানের দেহে এটা ফুঁকে দেয়া হয় (মাতৃগর্ভে) ৪ মাস বয়সের সময়। কাজেই রূহ ও জীবন পৃথক সত্ত্বা- এক জিনিস নয়।

মৃত্যু ঃ দেহ থেকে রূহ চলে গেলে তাকে মৃত্যু বলে। ঘুমের সময়ও অজ্ঞান অবস্থায় দেহ থেকে রূহ চলে যায় বলে এটাও এক প্রকার ক্ষণস্থায়ী মৃত্যু। কিন্তু ঘুমের পর রূহ আবার দেহে ফিরে আসে বলে তা প্রকৃত মৃত্যু নয়। মহান স্রষ্টা বলেন-

(وَ) هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى (ع) ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (الانعام : ٦٠)

"তিনিই, রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যাহাকিছু কর তাহা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন; যাহাতে নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণ হইয়া যায়।"

(সূরা আন'আম ৬ ঃ আয়াত ৬০)

এতে বুঝা গেল ঘুমের সময় রূহ দেহে থাকে না। দেহ থেকে চলে যায় কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু ঘুমন্ত ও অজ্ঞান ব্যক্তি জীবিত। এ অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল এবং দেহের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে যায় না। অতএব জীবন ও রূহ কিছুতেই এক হতে পারে না।

পৃথিবীর জীবনে দেহ থেকে রূহ একেবারে (Permanently) চলে গেলে এবং আর ফিরে না আসলে ঐ অবস্থাকেই প্রকৃত মৃত্যু বলা হয়। তখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্ত চলাচল, শ্বাস-প্রশ্বাস, দেহের সজীবতা, অনুভূতি শক্তি

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি আর থাকে না। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির শরীরে স্থাপন (Transplant) করলে কাজ করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিজের শরীরের বা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির দেহে স্থাপন করলে কাজ করে না কেন? এর উত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নেই। কিন্তু কুরআন হাদিসে এর উত্তর পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর দেহে সবই থাকে, থাকে না শুধু রূহ। এটা কবয্ করে নেয়া হয়। কাজেই মৃত ব্যক্তির দেহে রূহ থাকে না বলে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থাপন (Transplant) করলে কাজ করে না। আর এসবই প্রমাণ যে রূহ্ ও জীবন এক নয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানও মৃত্যুকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। যথা-

১. শারীরিক মৃত্যু (Somatic death) : মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করে না ঠিকই কিন্তু যে সব কোষ নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত সে সব কোষ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত কর্মক্ষমতা হারায় না। এ সময় মৃতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরেকজনের শরীরে স্থাপন (Transplant) করলে কাজ করে।

২. অণুতে অণুতে মৃত্যু (Moleculer death) : মৃত্যুর কিছুক্ষণ পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষসমূহ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং পচন ধরে। এ অবস্থায় কাউকেই কোন অঙ্গ দেয়া বা কোন কাজে লাগানো যায় না।

মৃত্যুর সময় কি ঘটে এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের কোনই ব্যাখ্যা নেই। বিজ্ঞান এ ব্যাখ্যা দিতে পারবেও না কোনদিন। কারণ বিজ্ঞানের অদৃশ্যের জ্ঞান নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে বেশকিছু বক্তব্য রয়েছে।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ـ وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ـ (النزعت : ١ـ٢)

"শপথ তাহাদের (ফেরেশতাদের) যারা নির্মমভাবে (অবিশ্বাসীদের রূহ্) উৎপাটন করে এবং যারা নেককার ও পরহেজগার বান্দাদের রূহ মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয়।" (সূরা নাযিআত ৭৯ ঃ আয়াত ১-২)

মাতৃগর্ভে প্রথম ৪ মাস, অজ্ঞান বা ঘুমের সময় দেহে রূহ্ থাকে না। অথচ সে সময় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবিত। যাক আমাদের মূল আলোচনা ছিল জীবন ও রূহ (আত্মা) এক নয়। মহান স্রষ্টা জীবনকে হায়াত আর আত্মাকে রূহ নামে অভিহিত করেছেন। কাজেই এ দুটো বিষয় কিছুতেই এক হতে পারে না।

لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ (يونس : ٦٤)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা এক মহাসাফল্য।"

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬৪)

www.nagorikpathagar.org

পরকাল ও পুনরুত্থানের প্রমাণ

জন্মিলেই মরতে হবে। সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এ ব্যাপারে কেউই কোন প্রশ্ন তুলছে না। বিনা প্রমাণে সকলেই এটা মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। মৃত্যুকে অস্বীকার করে এমন একজন লোকও পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ মৃত্যুর পরের জীবন যার আরম্ভ আছে, শেষ নেই এ নিয়েই যত বিশ্বাস আর অবিশ্বাস।

মৃত্যু পৃথিবীর জীবনের সমাপ্তি বটে কিন্তু জীবনের শেষ নয়। পৃথিবীর জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়। পরকালে আবার আমরা জীবন ও আত্মা ফিরে পাব। আসল ও অনন্ত জীবন হচ্ছে পরকালের জীবন। পরকালের জীবন একমাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না বা যাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তাদের জন্য পবিত্র কুরআনে রয়েছে অসংখ্য অগণিত দলিল। পরীক্ষাগারে (Laboratory-তে) Test করে যেমন রোগজীবাণু সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় তেমনি পুনরুত্থান সম্পর্কেও মহান স্রষ্টা এমন সব পরীক্ষার ফলাফলের বর্ণনা দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে যাতে পুনরুত্থান সম্পর্কে কোনই সন্দেহ না থাকে। আমি তা অতি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ্। শুধুমাত্র আমার একান্ত অনুরোধ একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে অধ্যয়ন করবেন আর বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন পরকালের জীবনের সত্যতা বা সঠিকতা সম্পর্কে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা পুনরুত্থানের প্রমাণ দিতে যেয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে বেশিরভাগ উদাহরণই দিয়েছেন মানুষের জন্মের ইতিহাসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে। যেমন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ـ (الحج : ٥)

"হে মানুষ! উত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তবে অনুধাবন কর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তারপর শুক্র হইতে, তারপর আলাক হইতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড হইতে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি। তারপর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে

www.nagorikpathagar.org

বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে তাহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে তাহারা সজ্ঞান থাকে না।" (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ৫)

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى - وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى - (النجم : ٤٥-٤٧)

"আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল- পুরুষ ও নারী- শুক্রবিন্দু হইতে, যখন উহা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষেপ করা হয়, আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই।" (সূরা নাজম ৫৩ ঃ আয়াত ৪৫-৪৭)

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى - فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى - (القيمة : ٣٦-٤٠)

"মানুষ কি মনে করে যে তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়? অতঃপর সে 'আলাকায়' পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী। তবু কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনরুর্জীবিত করিতে সক্ষম নহে?

(সূরা কিয়ামা ৭৫ ঃ আয়াত ৩৬ -৪০)

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ - ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ - ثُمَّ اِذَا شَاۤءَ اَنْشَرَهٗ : (عبس :١٨-٢٠)

"তিনি উহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? শুক্রবিন্দু হইতে, তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন। ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।"

(সূরা 'আবাসা ৮০ ঃ আয়াত ১৮-২0)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ পুনরুত্থান সম্পর্কে বলতে যেয়ে কেন মানুষের প্রথম সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখ করেছেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মানুষের সৃষ্টির ধারাবাহিকাতার সাথে পুনরুত্থানের কোনই মিল নেই। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা এমনিতেই এ উদাহরণসমূহ দিয়েছেন বিনা কারণে? তা কিছুতেই হতে পারে না?

www.nagorikpathagar.org

চলুন, বিষয়টি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি। পুরুষের একটি শুক্রকীট স্ত্রীর একটি ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে সন্তান জন্ম নেয়। শুক্রকীট তৈরি হয় অণ্ডকোষে। একবার মিলনের সময় প্রায় ৪২ কোটি শুক্রকীট বের হয়, তাহলে অণ্ডকোষে শুক্রকীটের সংখ্যা কত একবারও তা ভেবে দেখেছেন কি? অসংখ্য অগণিত কোটি কোটি শুক্রকীট ছোট্ট অণ্ডকোষের মধ্যে গাদাগাদি করে থাকে। আর ডিম্ব তৈরি হয় ডিম্বকোষে। একজন মহিলা প্রায় ৪৫ বছর বয়স মানে মাসিক একেবারে বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি পরিপক্ব ডিম্ব তৈরি করতে পারে। যদি কেউ এই ডিম্বকোষে এবং অণ্ডকোষে যেয়ে ডিম্ব ও শুক্রকীটকে কানে কানে বলে দেয় যে একদিন তাদেরকে এই ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে জরায়ু নামক একস্থানে গিয়ে এদের মধ্যে একজন আরেকজনের সাথে একত্র হয়ে বসবাস করবে আর কেউ থাকবে না সেখানে এবং সে স্থানটা তার বর্তমান অবস্থান থেকে অনেক বড়। তা ডিম্ব বা শুক্রকীটের বিশ্বাসে আসতে চাইবে না। কারণ ছোট্ট একটি ডিম্বকোষের মধ্যে অনেকগুলি ডিম্ব আর অণ্ডকোষের মধ্যে অসংখ্য অগণিত শুক্র মিলেমিশে বসবাস করছে। অথচ এর চেয়েও বড় স্থান জরায়ুতে গিয়ে মাত্র দুজনে মিলে একটি উপাদানে পরিণত হয়ে জীবনযাপন করবে কিভাবে? আবার যদি কেউ জরায়ুতে গিয়ে উক্ত শিশুকে কানে কানে বলে দেয় একদিন তোমাকে এ স্থান ছেড়ে যেতে হবে পৃথিবী নামক বিরাট স্থানে, তখনও তার এ খবর বিশ্বাসে আসতে চাইবে না। সে ভাববে এই স্থানে আমি একা কত আরামে আছি। খেলছি, লাফাচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া করছি কোনই চিন্তাভাবনা নেই। কিন্তু একদিন এক শুভলগ্নে ঠিকই জরায়ুর মায়া ছেড়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে পৃথিবীতে আসতেই হল। এখন পৃথিবীতে আসার পর আমাদেরকে আবার বলা হচ্ছে- একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে পরকাল নামক এক স্থানে। যাদের কর্মফল ভাল তারা এই পৃথিবীর চেয়েও অনেক বড় এক বেহেশত পাবে। সেখানে শুধু আরাম আর আরাম, খাওয়া-দাওয়ারও নেই কোন চিন্তা, সবকিছুই চাওয়ামাত্র পাওয়া যাবে। পায়খানা পেশাবেরও নেই কোন ঝামেলা। একথাগুলো আজকে আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। যেমন নাকি শুক্র/ডিম্ব এবং জরায়ুর শিশু তাদের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারে নি। যদি আমাদের জীবনকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. ডিম্ব ও অণ্ডকোষের জীবন।
খ. জরায়ুর জীবন।
গ. পৃথিবীর জীবন।
ঘ. পরকালের জীবন।

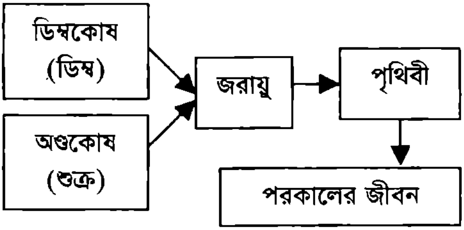

www.nagorikpathagar.org

এর মধ্যে প্রথম ৩টি জীবন আমরা যারা জন্মগ্রহণ করেছি সবার জন্যই প্রকাশ্য দিবালোকের মতই সত্য। অবিশ্বাস করার কোনই উপায় নেই। আর প্রত্যেকটি আবাসস্থলই পূর্ববর্তী স্থান থেকে ক্রমান্বয়ে বড় এবং প্রত্যেকটি স্থান ত্যাগ করাটা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনি। এখন বাকি মাত্র চতুর্থ জীবনটা যা মৃত্যুর মাধ্যমে আরম্ভ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা কি বুঝলাম? সেই মহান স্রষ্টার পুনরুত্থান সম্পর্কে মানুষের জন্মের ইতিহাসের উদাহরণ ঠিক হয়েছে কি ঠিক হয় নি? চতুর্থ জীবনটা সত্য হতে পারে কি পারে না? মহান স্রষ্টা সূরা হাজ্জ এর ৫ নং আয়াতে পুনরুত্থানের উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং পরবর্তী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম আয়াতে জানিয়ে দিলেন-

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا (لا) وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ (الحج : ٦-٨)

"ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান; এবং কিয়ামত আসিবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্থিত করিবেন। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।"

(সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ৬-৮)

১৫০০ বছর পূর্বে এভাবে কার পক্ষে বলা সম্ভব? এসব কি প্রমাণ করে না কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহরই বাণী? পরকাল অবশ্যই সত্য? পুনরুত্থান হতেই হবে? পালাবার কোনই পথ নেই। আলোচনা এখানেই শেষ নয়। পুনরুত্থান সম্পর্কে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা কিয়ামায় দাবি করেন-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ - بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ - (القيمة : ٣-٤)

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না? বস্তুত আমি উহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।"

(সূরা কিয়ামাহ ৭৫ ঃ আয়াত ৩-৪)

www.nagorikpathagar.org

এবারও প্রশ্ন আসতে পারে পুনরুত্থানের সাথে আঙ্গুলের অগ্রভাগ তৈরির সম্পর্ক কি? কোথায় পুনরুত্থান আর কোথায় আঙ্গুলের অগ্রভাগ?

একজন মানুষের চেহারা সাধারণত অন্যজনের সাথে মিল থাকে না। কিন্তু জমজ সন্তানদের মধ্যে মিল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে একজনের আঙ্গুলের দাগ বা রৈখিক বিন্যাস এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে অন্যজনের দাগের সাথে কোনই মিল নেই। এমনকি জমজ সন্তানদের মধ্যেও। চিকিৎসাবিজ্ঞান হাতের আঙ্গুলের ছাপকে বলে "ডেকটাইলোগ্রাফি" (Dectylograpy)। মাত্র সেদিন মানুষ জানতে পেরেছে এ সম্পর্কে। বর্তমানে লোক চিহ্নিত (Indentification) করার জন্য হাতের আঙ্গুলের ছাপই (Finger print) হচ্ছে উত্তম পন্থা। আঙ্গুলের দাগ এর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে অনেক রোগেরও চিকিৎসা করা হয়, ধরা হয় অনেক চোর-ডাকাত।

সাউথ এম্পটন ইউনিভার্সিটির গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল রিসার্স কাউন্সিলের ডাইরেক্টর ড. ডেভিট বারকার এবং তার সহকর্মী গডফ্রে সহ আরও তিনজন গবেষক (Researchers) ইন্ডিয়াতে ২টি এবং হাওয়াইতে ১টি পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আঙ্গুলের রৈখিক বিন্যাসের সাথে উচ্চ রক্ত চাপ (High blood pressure) ও হার্ট অ্যাটাক (Heart attack) এর বেশ মিল রয়েছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ সন পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম ইংল্যান্ডের প্রিটসনে, শেরোগ্রিন হাসপাতালে ১৩৯ জন পুরুষ ও মহিলার উপর পরীক্ষা করে ১৯৮০ সালে এক রিপোর্টে তারা বলেন যৌবন কালের রক্তের উচ্চ চাপ (High blood pressure) আঙ্গুলের দাগের উপর ভিত্তি করে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থাতেই নির্ধারণ করা সম্ভব। ডাক্তারদের এ কমিটি (Team) আরও ঘোষণা করেন, আঙ্গুলের দাগ তৈরিতে জিনের (gens) তেমন কোন প্রভাব নেই। কারণ দুই জমজের আঙ্গুলের দাগ ভিন্ন রকম। অথচ তাদের শরীরে মায়ের কাছ থেকে একই রক্ত প্রবাহিত হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই, আঙ্গুলের দাগ মাতৃগর্ভে ৪ মাস বয়সের সময়ে তৈরি হয়। যা শিশুর বিভিন্ন রোগ ও শরীর বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত।

ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ ـ (السجدة : ٩)

"পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ।" (সূরা সাজ্‌দা ৩২ ঃ আয়াত ৯)

বুখারী শরীফের ৩০৮৬ নাম্বার হাদিসের মাধ্যমেও জানা যায় যে, মাতৃগর্ভে ১২০ (৪০ + ৪০ + ৪০) দিনের দিন রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। আর ঐ সময়ই সন্তানের আমল, মৃত্যু, রিযিক (এবং পাপী না নেককার হবে) এসব লিখে দেয়া হয়। (এখানে প্রশ্ন আসতে পারে জন্মের পূর্বেই সন্তান পাপী হবে না

www.nagorikpathagar.org

নেককার হবে তা লিখে দেয়া হয়। তবে জন্মের পর ভাল কাজ ও ইবাদত করে লাভ কি? এ ব্যাপারে পরে আলোচনা থাকবে) কি রকম মিল বর্তমানে আবিষ্কৃত আঙ্গুলের দাগের সাথে এ হাদিসের। যাক বলছিলাম মহান স্রষ্টা দাবি করছেন তিনি আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ তৈরি করতে সক্ষম যা অতি কঠিন কাজ। তাহলে আল্লাহর পক্ষে পুনরায় মানুষ তৈরি করা তো অতি সহজ যা ১৫০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনের ঘোষণায় এসেছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে পেরেছেন যে, একজনের আঙ্গুলের দাগের সাথে অন্য কারও আঙ্গুলের দাগের মিল থাকে না এবং এ দাগের উপর ভিত্তি করে সন্তানের শরীর বৃদ্ধি ও রোগের কারণ জানা যায়। কে জানত ইতিপূর্বে একথা? এটা কি প্রমাণ করে না যে, কারও পক্ষেই এখন থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে একথা বলা সম্ভব নয় একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া?

মৃত্যুর পর মানুষকে আবার উঠানো হবে হাশরের মাঠে। আর দাঁড় করানো হবে বিচারের কাঠগড়ায়। মহান আল্লাহ হচ্ছেন এ দিবসের একমাত্র মালিক ও বিচারক।

"সেইদিন আল্লাহরই আধিপত্য; তিনিই তাহাদের বিচার করিবেন।"

(সূরা হাজ্জ ২২ ঃ আয়াত ৫৬)

এ বিচারকালে কারো পক্ষে থাকবে না কোন উকিল-মোক্তার, এ্যাডভোকেট-ব্যারিস্টার বা কোন সাক্ষী। দোষ স্বীকার না করার কোনই উপায় নেই। দোষ অস্বীকার করলেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সঠিক সাক্ষ্য দিবে।

"যেইদিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত ও তাহাদের চরণ তাহাদের কৃতকর্মের সম্বন্ধে।"

(সূরা নূর ২৪ ঃ আয়াত ২৪)

প্রতিটি মুহূর্তের কর্মই নিখুঁতভাবে রেকর্ড করা হয়েছে এ দুনিয়ার জীবনেই।

"আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ আয়াত ১২)

"আমি সবকিছুই সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।"

(সূরা নাবা' ৭৮ ঃ আয়াত ২৯)

সেখানে কেউ পাবে জান্নাত, আর কেউ পাবে জাহান্নাম। এটাই হচ্ছে পরকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে ইসলামী মতবাদ।

www.nagorikpathagar.org

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে স্রষ্টা ছাড়া যখন কিয়ামতের (মহাধ্বংসের) দিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে না কিছুই। তাহলে হাশরের দিনে বিচার হবে কিসের ও কোথায়? এর উত্তরে মহান স্রষ্টা বলেন-

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ - (الانبياء : ١٠٤)

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।"

(সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ১০৪)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ - إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

(يس : ٨١-٨٢)

"যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, অতিশয় জ্ঞানী। তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে হুকুম করেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।"

(সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ আয়াত ৮১-৮২)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

(ابرهيم : ٤٨)

"যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশমণ্ডলী এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহর সম্মুখে যিনি এক, পরাক্রমশালী।" (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ ঃ আয়াত ৪৮)

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ (ط) إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

(ابرهيم : ٥١)

"ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।"

(সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ আয়াত ৫১)

অতএব, বুঝা গেল ধ্বংসের পর আবার সবকিছু নতুন করে সৃষ্টি করে মানুষকে সেই নতুন পৃথিবীতে উঠায়ে আল্লাহ তাদের বিচার (ফয়সালা) করবেন। সেখানে সবাই সবাইকে দেখতে পাবে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন আসতে

পারে হাশরের মাঠে সবাই সবাইকে দেখতে পাবে কিভাবে? অথচ পৃথিবী গোলাকার, এবং এতে পাহাড়ও রয়েছে অনেক। এক পৃষ্ঠের লোক অপর পৃষ্ঠের লোকদের দেখা কি সম্ভব?

এ সম্পর্কে স্রষ্টার ঘোষণা নিম্নরূপ-

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ـ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ـ لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا ـ (طه : ١٠٥-١٠٧)

"আর মানুষ আপনাকে পাহাড় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, অতএব আপনি বলিয়া দিন, আমার রব উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিবেন; অতঃপর যমীনকে এক সমতল মাঠে পরিণত করিবেন, যাহাতে না তুমি অসমতা দেখিতে পাইবে, আর না উচ্চতা।" (সূরা ত্বোয়া-হা ২০ ঃ ১০৫-১০৭)

পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আগমন থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আসবে তাদেরকে কিভাবে পুনরুত্থান করবেন? অথচ তাদের শরীর মাটির সাথে একেবারেই মিশে গেছে।

قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ـ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ (ط) وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ـ (يس : ٧٨-٧٩)

"সে বলে যে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে, যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"

(সূরা ইয়াসিন ৩৬ ঃ আয়াত ৭৮-৭৯)

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ (لقمن : ٢٨)

"তোমাদের সকল সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ২৮)

হাশরের মাঠে সবাই নিজ নিজ আমলনামা হাতে পাবে এবং দেখতে পাবে পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের রেকর্ড।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۤئِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ (ط) وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ـ (بنى اسرائيل : ١٣)

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭ ঃ আয়াত ১৩)

www.nagorikpathagar.org

সবার আমলনামাই (পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কাজ) বা কি করে একত্রে দেয়া হবে? বর্তমানে কম্পিউটার (Computer) ও ভিডিও (Video) ক্যামেরা আবিষ্কারের ফলে এ ব্যাপারটাও বুঝতে একেবারে সহজ হয়ে গেছে। যদি একজনের পিছনে জন্ম থেকে সারাক্ষণ একটি ভিডিও ক্যামেরা ফিট করে রাখা হয় আর সেই ভিডিও-টি যদি জীবনের শেষ মুহূর্তে দেখার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তার সারা জীবনের কাজ দেখানো সম্ভব নয় কি? অন্যদিকে আবার কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে সারা জাহানের যে কোন তথ্য (Information) কম্পিউটারের একটি বোতাম (Button) টিপার মাধ্যমেই বের করা যায়। মানুষের পক্ষেই যদি এসব করা সম্ভব হয় তবে যিনি মানুষ ও কম্পিউটারসহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সেই মহান স্রষ্টার পক্ষে একমুহূর্তে সবার আমলনামা দেয়া ও দেখানো কি কোন কঠিন কাজ? Video ক্যামেরা ও কম্পিউটার আবিষ্কারের পূর্বে এসব মানুষের পক্ষে বুঝতে পারাটা খুবই কঠিন ছিল। তখন ঈমানদার ব্যক্তিগণ বিনা প্রমাণেই এসব বিশ্বাস করেছেন। আফসোস্, বর্তমানে এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বা বিশ্বাস করি না।

"তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনি দ্বিতীয়বারও তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইবে।" (সূরা আরাফ ৭ ঃ ২৯)

"নিশ্চয়ই তিনি পুনরুত্থান করিতে সক্ষম।" (সূরা তারিক ৮৬ ঃ ৮)

"আজ প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মানুসারে প্রতিদান পাইবে- কাহারও প্রতি অবিচার করা হইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে অতিশয় তৎপর।" (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ১৭)

"সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের, যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।" (সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩ ঃ ১০-১১)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেইদিনের যখন পিতা সন্তানের উপকারে আসিবে না এবং সন্তানও আসিবে না পিতার কল্যাণে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ৩৩)

"সেইদিন মানুষ নিজের ভাই হইতে পলায়ন করিবে এবং নিজের মাতা ও পিতা হইতে; এবং স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি হইতেও।"

(সূরা আবাসা ৮০ ঃ ৩৪ - ৩৬)

"ইহা এমন একদিন যেদিন কাহারও বাকস্ফুর্তি হইবেনা, এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না ওযর পেশ করার। সেইদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।" (সূরা মুরসালাত ৭৭ ঃ আয়াত ৩৫-৩৭)

www.nagorikpathagar.org

"আমি আজ ইহাদের মুখে মোহর (সিল) করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদের কৃতকর্মের।

(সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৬৫)

"নিশ্চয়ই, কান, চোখ ও অন্তর সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"

(সূরা বনী ইসরাইল ১৭ ঃ আয়াত ৩৬)

আমাদের এত আদরযত্নের প্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেদিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, কোন কিছুই লুকাবার কোনই উপায় থাকবে না। সৎকর্ম ছাড়া সবই আমাদের বিপক্ষে যাবে।

"সে বলিবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রীম পাঠাইতাম?"

(সূরা ফাজ্‌র ৮৯ ঃ আয়াত ২৪)

"এই দিবস সুনিশ্চিত; অতএব যাহার ইচ্ছা সে প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।"

(সূরা নাবা ৭৮ ঃ আয়াত ৩৯)

মহান স্রষ্টা আমাদের সহায় হউন। আমীন!! পরককাল সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাক। সুম্মা আমিন!!!

আল্লাহর বাণী, বিধান ও সৃষ্টির কোনোই পরিবর্তন নেই

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত না বুঝার কারণে কুরআনকে সত্য বলে মেনে নিতে অনেকের পক্ষেই সহজ নয়। আবার এমনও বহু আয়াত আছে যা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে পূর্বের তুলনায় আজকের দিনে বুঝতে অনেক সহজ। তাছাড়া এমনও অনেক আয়াত রয়েছে যা কুরআন নাযিলের যুগের আলোচিত কোন বিষয়ই ছিল না। কিন্তু সেসব বিষয় সত্য ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ধরা পড়েছে বর্তমান কালে। এমন কিছু আয়াত আপনাদের সামনে তুলে ধরব যা জেনে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। শুধু আয়াতের অর্থই নয়, আয়াতের মধ্যে শব্দের আগে পরে প্রয়োগ ও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

জাহান্নামের জ্বালানি কি ও কেন?

(মানুষ, মূর্তি ও পাথর হবে দোযখের জ্বালানি)

কিয়ামতের পর সকল মানুষকে একত্রে হাশরের মাঠে উঠানো হবে। সেখানে মানুষ তার নিজ নিজ আমলনামা হাতে পাবে এবং পৃথিবীর জীবনের

www.nagorikpathagar.org

সকল কৃতকর্ম পরিষ্কারভাবে ভিডিওর মত দেখতে পাবে কোন কিছুই গোপন থাকবে না সেখানে। আল্লাহ বলেন-

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (ط) لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ (المؤمن : ١٧)

"আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কোন যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"

(সূরা মু'মিন ৪০ ঃ আয়াত ১৭)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ (الزلزال : ٧ـ٨)

"অতঃপর কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করিলে সে তাহাও দেখিবে।"

(সূরা যিলযাল ৯৯ ঃ আয়াত ৭-৮)

পৃথিবীর বিচার পদ্ধতির চেয়ে আখিরাতের বিচার পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এখানে অনেক সময় একই বিচারে বিভিন্ন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন রায় দেন। তাছাড়া কোন কোন বিষয়ে সকল বিচারক একই রায় দিলেও অনেক ক্ষেত্রে সঠিক রায় দেয়া সম্ভব নয়। যেমন- একজন লোক যদি এক বা একাধিক খুন বা হত্যা করে তবে তাকে একবারই ফাঁসি দেয়া যায় বা দেয়া হয়। একটি খুন আর একাধিক খুনের একই শাস্তি। বাকী খুন গুলির শাস্তি থেকে সে রক্ষা পেয়ে যায় এবং তা বাকীই থেকে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে যে যতটা খুন করবে পরকালে তাকে সকল খুনের শাস্তি দেয়া হবে এক এক করে। পৃথিবীতে এমন ব্যবস্থা আছে কি? এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুবিচারক আল্লাহ বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا (ط) وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ـ (الانبياء : ٤٧)

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণও ওজনের হয় তবু উহা আমি উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৪৭)

দোযখের আগুনের তাপমাত্রা কত ডিগ্রী হবে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য কুরআন মজীদে নেই। তবে সে আগুনের তাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে খুব ভালভাবে বর্ণনা আছে। যা পড়লে গা শিহরিয়া উঠে। 'তারগীব ওরা তারহীব'

www.nagorikpathagar.org

কিতাবের এক বর্ণনায় এসেছে "জাহান্নামীগণ যদি পৃথিবীর আগুনের সংস্পর্শে আসত তাহলে সুখনিদ্রা এসে যেত।" জাহান্নামের এত প্রচণ্ড তাপ তৈরি করতে জ্বালানি হিসেবে মানুষ, পাথর ও প্রতিমা (মূর্তি) ব্যবহৃত হবে বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم : ٦)

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর, যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যাহারা অমান্য করে না তাহা, যাহা আল্লাহ তাহাদিগকে আদেশ করেন। আর তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।" (সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ আয়াত ৬)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - (البقرة : ٢٤)

"তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।"

(সূরা বাকারা ২ঃ আয়াত ২৪)

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ - (الانبياء : ٩٨)

"নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তোমরা সকলে দোযখের ইন্ধন হইবে, তোমরা সকলে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৯৮)

দোযখের আগুনে পাপী মানুষকে জ্বালানো হবে। কাজেই ঐ সকল মানুষও জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে। কারণ যে জ্বলবে সেও একটি জ্বালানি। কিন্তু পাথর ও প্রতিমা (মূর্তি) যে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

কুরআন যখন নাযিল হয় তখন মানুষ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করত খড়, কুটা, কাঠ ইত্যাদি। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মানুষ আবিষ্কার করল- কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি ও সৌর শক্তি (Solar energy)।

—৮

www.nagorikpathagar.org

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- কুরআন নাযিলের সময়ের বা বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের আবিষ্কৃত কোন জ্বালানির কথা না বলে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'লা এমন জ্বালানির কথা বললেন যা আজও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর কারণ কি হতে পারে?

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন গ্যাসভর্তি সিলিণ্ডারের মাধ্যমে নীলাভ আলো দিয়ে ওয়েল্ডিং করা হয়। এই নীলাভ আলো তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়- ক. অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন- যার তাপমাত্রা ২৮০০^0 C. অথবা-

খ. অক্সিজেনের সাথে অ্যাসিটিলিন-যার তাপমাত্রা ৩১০০^0 C থেকে ৩৩১৫^0 C । কিন্তু অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও অ্যাসিটিলিন পৃথকভাবে জ্বালালে এত তাপ তৈরি হয় না।

পাথরের মধ্যে অনেক ধরনের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের উপাদান বিদ্যমান। পাথরের কোন কোন উপাদানকে জ্বালাতে পারলে কল্পনাতীত তাপ সৃষ্টি হয়। আপনারা Atomic বা পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। আণবিক বোমায় ব্যবহার করা হয় 'ইউরেনিয়াম' যা পাথরের মধ্যেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এটমিক (পারমাণবিক) বোমা ফেলা হয়েছিল। তখন সেখানে কী ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল তা আপনাদের জানা। তার বিভীষিকা আজও শেষ হয়নি। সেখানে এখনও মানুষ পড়ে গিয়ে শরীরে ঘা হলে তা শুকায় না, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ক্ষত ক্যান্সারে পরিণত হয়। একটি এটমিক বোমারই এ প্রতিক্রিয়া (Action) যা বহু পূর্বে নিভে গেছে। তবে দোযখের অবস্থা কি হবে তা একবারও ভেবে দেখেছেন কি? সেখানে আগুন কখনও নিভে যেতে পারবে না। আল্লাহর ঘোষণা-

مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۔ (بنى ارسرائيل : ٩٧)

"উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে তখনই আমি উহাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।"

(সূরা বনী-ইসরাইল ১৭ ঃ আয়াত ৯৭)

দোযখের জ্বালানিতে যে পাথরই ব্যবহৃত হোক না কেন এ সম্পর্কে এমন একটি প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক। পাথরের মধ্যে যে উপাদান আছে মাটির মধ্যেও এর অনেক উপাদান বিদ্যমান। তবে কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা মাটির কথা না বলে পাথরের কথা বললেন? উত্তর হিসেবে বলা যায়- পাথরের মধ্যে উপাদানগুলি গাদাগাদি (Compact) অবস্থায় থাকে। এক টুকরা পাথরের মধ্যে যে উপাদান বিদ্যমান সেই পরিমাণ উপাদান ধারণ করার জন্য

www.nagorikpathagar.org

মাটির প্রয়োজন অনেক বেশি। অর্থাৎ সামান্য এক টুকরা পাথর যে তাপ দিবে, সমপরিমাণ অন্য কিছু সেই তাপ দিতে পারবে না। আল্লাহ মূর্তির কথাও বলেছেন যা পূজা করা হয় এর কারণই বা কি? প্রথমত যেহেতু মুশরিকগণ মূর্তি পূজা অর্চনা করে দাবি করে এ মূর্তিই তাদের খোদা যা পরকালে তাদেরকে শান্তি দিবে। তাই তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের সাথেই সেসব মূর্তিগুলোকে পুড়ানো হবে। দ্বিতীয়ত- মূর্তি ও সাধারণত মাটি বা পাথরের তৈরি। আগেই বলেছি মাটি ও পাথরের উপাদান অনেকটা একই। তাছাড়া মানুষের শরীর ও মাটির উপাদান দিয়ে তৈরি। কাজেই মানুষ, পাথর ও মূর্তি সবই একই উপাদানে গঠিত। অতএব জাহান্নামের জ্বালানি মানুষ, পাথর ও মূর্তি হওয়াতে জ্বালানির উপাদানের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। পাপী জ্বিনদেরকেও দোযখে শাস্তি দেয়া হবে।

قَالَ ادْخُلُوا فِى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ـ

(الاعراف : ٣٨)

আল্লাহ বলিলেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর।'

(সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ৩৮)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (ز) وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا (ز) وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا (ز) اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (ط) اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ـ (الاعراف : ١٧٩)

"আর আমি এমন অনেক জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি দোযখের জন্য যাদের অন্তর আছে কিন্তু তাহা দিয়া তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তাহা দিয়া দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে কিন্ত তাহা দিয়া শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায় বরং উহারা (তদপেক্ষা) অধিক বিভ্রান্ত। ইহারাই গাফিল। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ১৭৯)

কিন্তু মানুষ ও জ্বিন একই উপাদানে তৈরি নয়। মহান স্রষ্টা বলেন,

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ـ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ـ

(الرحمن : ١٤ـ١٥)

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পোড়ামাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে, আর জ্বিনকে ধোঁয়া ছাড়া অগ্নিশিখা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(সূরা আর রাহমান ৫৫ ঃ আয়াত ১৪-১৫)

www.nagorikpathagar.org

এখানেও প্রশ্ন আসতে পারে-

জ্বিন সম্প্রদায় আগুনের তৈরি তবে কেমন করে দোযখের আগুনে জ্বিনেরা শাস্তি পাবে?

আমাদের শরীরের তাপমাত্রা ৯৮.৪^{0} F. গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড তাপে কী ছটফট করি আমরা। অথচ শরৎ ও হেমন্ত কালে কত আরামবোধ করি। অতএব নিজের শরীরের চেয়ে অত্যধিক তাপমাত্রায় অবস্থান হলে জ্বিনরা অবশ্যই কষ্ট বা শাস্তি পাবে। আর দোযখের মত প্রচণ্ড আগুনে পড়লে যে কি অবস্থা হবে তা একটু চিন্তা করে দেখেছেন কি? পাপী মানুষ ও পাপী জ্বিন উভয়েই দোযখে শাস্তি ভোগ করবে। কুরআন নাযিলের সময়ে কে জানত পাথরই সর্বাধিক তাপ উৎপন্ন করার ক্ষমতা রাখে।

পরিশেষে একথা অবশ্যই বলা বা ধারণা করা যায়- নিশ্চয়ই যা দিয়ে সর্বাধিক তাপ উৎপন্ন করা সম্ভব সে পাথরকেই জাহান্নামের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবেন বলে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সত্য, তাঁর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই।

ব্যথার অনুভূতির কেন্দ্র চামড়াতেও বিদ্যমান

চিকিৎসাবিজ্ঞান এতদিন জেনে আসছে মানুষের সকল অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্কে (Brain) কিন্তু থাইল্যান্ডের ডা. তাগাশন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবিষ্কার করলেন মানুষের ব্যথার অনুভূতির কেন্দ্র (Centre) শুধু মস্তিষ্কেই নয়, এটা চামড়াতেও বিদ্যমান। চামড়ার প্রধানত দুটি স্তর। যথা-

ক. উপরে ইপিডার্মিস (Epidermis) বাইরের অংশ এবং

খ. নিচে- ডার্মিস (Dermis) ভিতরের অংশ।

কারো চামড়া পুড়ে গেলে ডাক্তারগণ প্রথমে পোড়াস্থানে তুলা দিয়ে স্পর্শ (Touch) করে দেখেন। রোগী তুলার স্পর্শ অনুভব করতে পারলে বুঝা যায় চামড়ার বাইরের স্তর (Superficial layer) ঠিক আছে। মানে চামড়ার তেমন কিছুই হয়নি। কিন্তু তুলা দিয়ে স্পর্শ করার পর অনুভব করতে না পারলে বুঝা যায় বাইরের স্তর পুড়ে গেছে। এরপর পিন বিঁধিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এতে অনুভব করতে পারলে বুঝা গেল- চামড়ার নিচের স্তরের কিছুই হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই নিচ থেকে চামড়া গজিয়ে উঠবে। কিন্তু পিন বিঁধালেও রোগী অনুভব করতে না পারলে বুঝতে হবে চামড়ার অভ্যন্তরীণ স্তর (Deep layer) সহ সকল স্তরই পুড়ে গেছে। তখন চামড়ার 'গ্রাফটিং" করতে হয়। অর্থাৎ শরীরের অন্য স্থান থেকে চামড়া এনে লাগাতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে বুঝা গেল ব্যথার অনুভূতির কেন্দ্র শুধুমাত্র মস্তিষ্কেই বিদ্যমান নয়, চামড়াতেও বিদ্যমান। রিয়াদে যখন ডা. তাগাশন উপরোক্ত ঘোষণা দিলেন তখন সেখানে উপস্থিত কিছু মুসলিম ভাই তাকে জানালেন, 'একথা কুরআনে আছে।' প্রথমে ডা. তাগাশন তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কিন্তু তখন তাকে সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াত দেখানো হল-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا (ط) كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (ط) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ـ

(النساء: ٥٦)

"যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চামড়া দগ্ধ হইবে তখনই উহার স্থলে নূতন চামড়া সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৫৬)

চামড়ার মধ্যে অনুভূতি যদি না-ই থাকত তবে কেন জাহান্নামবাসীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য চামড়া যতবার পুড়ে যাবে ততবারই নূতন চামড়া তৈরি করে দেয়ার কথা কুরআনে আসল? উপরোক্ত আয়াতে চামড়া তৈরির ব্যাপারে স্বয়ং মহান স্রষ্টাই জানালেন 'যাহাতে তারা শাস্তি ভোগ করে এজন্য নতুন চামড়া বার বার তৈরি করা হবে।' অথচ অন্য কোন অঙ্গ এভাবে তৈরির কথা বলা হয়নি।

তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলি দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে? (মুমিন ৪০ ঃ ৮১)

আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নাই। (সূরা নামল ২৭ ঃ ৭৫)

"আপনি দেখুন! আমি কি রূপে প্রমাণসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি, তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।" (সুরা আন'আম ৬ ঃ আয়াত ৪৬)

"মানুষের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাহাদের না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ।

(সূরা লুকমান ৩১ ঃ ২০)

"তিনিই দয়াময়; তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।" (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৫৯)

"আমি উহাদের জন্য আমার নির্দশনাবলি ব্যক্ত করিব, বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, উহাই

www.nagorikpathagar.org

সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত? (সূরা হামীম-আস-সাজদা ৪১ ঃ ৫৩)

"এইগুলিই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্চ, মহান।"

(সূরা লুকমান ৩১ ঃ ৩০)

এসব প্রমাণ যে, "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৬৪)

মাতৃগর্ভে প্রথমে কর্ণ ও পরে চক্ষু তৈরি হয়

আমরা সাধারণত উপরোক্ত দুটি অঙ্গ সম্পর্কে একত্র বলতে গেলে প্রথমে চক্ষু ও পরে কর্ণ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু মহান স্রষ্টা এদের সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে যেয়ে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা দিয়েছেন। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি প্রথমে শ্রবণশক্তি পরে দৃষ্টি শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এর ব্যতিক্রম একটুও করেননি। যেমন-

وَهُوَ الَّذِى اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ

(المؤمنون : ٧٨)

"তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।" (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ আয়াত ৭৮)

قُلْ هُوَ الَّذِى اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ـ (الملك : ٢٣)

"বল, "তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

(সূরা মূলক ৬৭ ঃ আয়াত ২৩)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ (النحل : ٧٨)

"এবং আল্লাহ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে। এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তিনি তোমাদিগকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়। যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা নাহল ১৬ ঃ আয়াত ৭৮)

www.nagorikpathagar.org

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ - (السجدة : ٩)

"তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা সাজ্‌দা ৩২ ঃ আয়াত ৯)

যেখানে কর্ণ ও চক্ষু তৈরির সম্পর্কে প্রথমে কর্ণ ও পরে চক্ষু শব্দটি ব্যবহার করেছেন অথচ পৃথিবীর জীবনে দেখা ও শোনার ব্যাপারে আল্লাহ প্রথমে দেখা ও পরে শোনার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا (ز) اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (ط) اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ - (الاعراف : ١٧٩)

"আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত। উহারাই গাফিল।"

(সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ১৭৯)

মাতৃগর্ভে চক্ষু ও কর্ণ কখন আরম্ভ হয় এবং কখন তা পূর্ণতা লাভ করে তা জানতে পারলেই আপনি বুঝতে পারবেন মহান স্রষ্টা কেন প্রথমে কর্ণ পরে চক্ষু তৈরির কথা বলেছেন। মাতৃগর্ভে প্রথমে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে না। আপনারা জানেন একটি ডিম্ব ওএকটি শুক্র একত্র হয়ে প্রথমে এককোষী একটি ভ্রূণ তৈরি হয়। পরে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের কোষের (cell) সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোষ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে একটি একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়। চক্ষু, কর্ণ এই দুটি অঙ্গের মধ্যে প্রথমেই তৈরি হয় কর্ণ।

কর্ণ ঃ এটা মাতৃগর্ভের দু'সপ্তাহ বয়সের সময় আরম্ভ হয়ে পঞ্চম সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।

চক্ষু ঃ এটা মাতৃগভে পঞ্চম সপ্তাহে আরম্ভ হয়ে সপ্তম সপ্তাহে পূর্ণতা লাভ করে।

বর্তমান যুগেও ক'জন জানে, মাতৃগর্ভে প্রথমে কর্ণ পরে চক্ষু তৈরি হয়। কুরআন নাযিলের যুগে কোন মানুষের পক্ষে এ সম্পর্কে জানা কি সম্ভব? কি করে কর্ণ প্রথমে ও চক্ষু তৈরির কথা পরে কুরআনে আসল যদি একথা মহান স্রষ্টার বাণী না হয়ে থাকে?

www.nagorikpathagar.org

وَفِى الارض ايت لِلموقنين . وفِى انفسكم افلا تبصرون . (الذريت : ٢١.٢٠)

অর্থ ঃ নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

(সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ আয়াত ২০-২১)

এটাই প্রমাণ যে আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই। "আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (৩০ ঃ ৩০)

অন্তরের ব্যাধি বা মানসিক রোগ
(Psychic disease)

যাদের অন্তর এবং বাহ্যিক আচার আচরণ দুরকম তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় মুনাফিক বলে। এদের বুঝা বা চেনা অনেক সময় দুরূহ হয়ে উঠে। কাফের ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। এদের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা সহজ কিন্তু মুনাফিক ঘরের শত্রু এদের ব্যাপারে সাবধান হওয়া সহজ নয়। তাই এরা অধিক ক্ষতিকর। এদের সম্পর্কে আল্লাহ জানালেন-

فِى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (ط) ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون . (البقرة : ١٠)

"তাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে; অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১০)

মুহাম্মদ (সা) এর জীবদ্দশায় কেউ কেউ মুখে ঈমানের দাবি করেও অন্তরে অন্তরে বেঈমানই রয়ে গেছে। এজন্যই মহান স্রষ্টা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে মুনাফিক সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, আল্লাহ যা বলেন তাই সত্য। কাজেই মানুষের অন্তরে বা মনেও রোগব্যাধি হতে পারে। মানসিক রোগ বলতে আদৌ যে একটা রোগ আছে তা কেউ জানতই না। অথচ এ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে- মানুষের মনেও রোগ আছে। দশম শতাব্দীতে মুসলিম চিকিৎসক আল রাযী ও ইবনে সিনা বহু মানসিক রোগীর চিকিৎসা করে সফল হন। মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে মানসিক ব্যাধি (Psychic disease) বিজ্ঞানীদের

স্বীকৃতি লাভ করে। এখন অনেক স্থানে মানসিক হাসপাতাল পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই। তবু কি বলবেন "ভারতের ইসলাম আর আরবের ইসলাম এক নয়?" কুরআনে বিশ্বাসের আহবান কি অবৈজ্ঞানিক?

শব্দ প্রয়োগের মর্যাদার আর একটি বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

(ع) (النساء : ٥٩)

তোমরা যাহারা ঈমান এনেছ,

আল্লাহর আনুগত্য কর

এবং আনুগত্য কর আল্লাহর রাসূলের।

এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (অর্থাৎ তোমাদের নেতাদের)। (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৫৯)

উপরের তিনটি আয়াতাংশ যা এবং (و) শব্দ দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া এ আয়াতে 'আতিউ' মানে আনুগত্য কর এই শব্দটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) এর পূর্বে এসেছে। কিন্তু "উলিল আমরি মিংকুম" (তোমাদের নেতাদের) এর পূর্বে আতিউ শব্দটি নেই্। আরবিতে একটি নিয়ম আছে কোন আয়াত যদি "ওয়াও" (এবং) দ্বারা সংযুক্ত হয় এবং ওয়াও এর পর কোন ক্রিয়াপদ না থাকে তখন পূর্বের ক্রিয়াপদের অর্থই ধরে নিতে হয়। একে 'আথ্ফ' বলে। কাজেই নেতাদের পূর্বে আতিউ শব্দটি না থাকলেও নেতাদের আনুগত্য কর এ অর্থই প্রকাশ করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাসূল (সা) এর পূর্বেও আতিউ শব্দটি না থাকলে সেখানেও আনুগত্য কর অর্থটি ধরে নিতে হত। তা'হলে উপরোক্ত আয়াতে আতিউ শব্দটি দু'বার ব্যবহার না হয়ে একবার ব্যবহৃত হলেই চলত। যেমন-

আনুগত্য কর আল্লাহর

ও আল্লাহর রাসূল (সা) এর

এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতাবান।

এমন হলেও একই অর্থ প্রকাশ করত। কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা) এর পূর্বে আতিউ শব্দটি থাকাতে তাহাদেরকে মানতে হবে বিনা প্রশ্নে (Without condition)। কিন্তু নেতাদেরকে মানার ব্যাপারটা শর্ত (Condition) সাপেক্ষ। যেহেতু তাদের পূর্বে আতিউ শব্দটি নেই অর্থাৎ ঐসব নেতাদেরকে মানবে যারা উপরোক্ত দু'জনকে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)কে মানে। যদি নেতাদের পূর্বেও 'আতিউ' শব্দটি থাকত তবে যেমন নেতাই

www.nagorikpathagar.org

হউক না কেন যথা ধার্মিক- অধার্মিক এবং যে আইন-ই সে করুক না কেন ইসলামী বা অনৈসলামী তা মেনে নিতে হতো। শুধু নেতাদের পূর্বে 'আতিউ' শব্দটি না থাকাতে ঐসব নেতাদেরকেই মানতে বাধ্য থাকতে হবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর রীতিনীতি ও আইনকানুন মেনে চলে। সুবহানাল্লাহ! এ আয়াতের মধ্যে একটা শব্দের ব্যবহার না থাকায় কি অর্থ ও দায়িত্ব প্রকাশ করে তা ভেবে দেখেছেন কি? মহান আল্লাহর বাণীর কোনই তুলনা বা পরিবর্তন নেই। ইহা এক মহা সাফল্য। "আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।" (৩৫ ঃ ৪৩)

কাহারো দু'টি হৃদপিণ্ড নেই

সূরা আহযাবে মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ـ (الاحزاب : ٤)

"আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই।"

(সূরা আহযাব ৩৩ ঃ আয়াত ৪)

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপ ঃ-

১. "জামিল ইব্ন মু'আম্মার আল ফাহ্‌রী নামক এক ব্যক্তি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল। সে যা শুনত তাহাই মনে রাখিতে পারিত এই জন্য তাহাকে দুই অন্তরের অধিকারী বলা হইত। ইহাতে সে নিজেও গর্ব করিত এবং রাসূল (সা) হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিত। আয়াতটিতে এই মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।" -- আসবাবুন-নুযুল।

২. "একজন লোক একই সঙ্গে মুমিন ও মুনাফিক, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং সৎ ও অসৎ হতে পারে না। তার বক্ষদেশে দুটি হৃদয় নেই যে, একটি হৃদয় থাকবে আন্তরিক এবং অন্যটিতে থাকবে আল্লাহর প্রতি বেপরোয়াভাব।" -- তাফহীমুল কুরআন।

৩. "বর্বর যুগে আরববাসীরা মানুষের বক্ষে দুটি অন্তঃকরণ আছে বলে যে বিশ্বাস করত এর যেমন ভিত্তি নেই তেমনি পালক পুত্রকে নিজের পুত্র ও জিহার[৬] করার কোন ভিত্তি নেই। এই উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

[৬] জিহার অর্থ পৃষ্ঠদেশ। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিত 'তুমি আমার মাতার পৃষ্ঠদেশ'; তা হলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। ইহাকে জিহার বলে।"

www.nagorikpathagar.org

এসব হচ্ছে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাযিল করেন না কেন যেহেতু আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই সেহেতু আজ পর্যন্ত এমন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই যার দুটি হৃদপিণ্ড (Two heart) আছে। অথচ হাজারও ব্যাতিক্রম (Abnormal) শিশু-ই তো জন্ম নিচ্ছে। কারো বাম পাশের পরিবর্তে ডানপাশে হৃদপিণ্ড (Heart) থাকে। একে Dextro-cardia বলে। আবার কারও কারও হৃদপিণ্ড (Heart) একেবারেই থাকে না (A-cardia)। (অবশ্য এমন সন্তান বাঁচে না।)

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই। কোন মানুষেরই দুটি হৃদপিণ্ড (Heart) নেই।

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?" (৫১ ঃ ২০-২১)

"কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে না সামনের দিক থেকে না পিছনের দিক থেকে। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (৩০ ঃ ৩০)

নারীদের চেয়ে পুরুষরা ক্ষমতাবান (শক্তিশালী)

আল্লাহর ঘোষণা-

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (ط) وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ (البقرة : ٢٢٨)

"কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২২৮)

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

(النساء : ٣٤)

"পুরুষ নারীর কর্তা, (নারীর চেয়ে ক্ষমতাবান), কারণ আল্লাহ তাহাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৩৪)

শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে জন্মগতভাবেই পার্থক্য অনেক। পুরুষ ও মহিলাদের হাড়ের মধ্যেও রয়েছে অনেক অমিল। পুরুষের হাড়সমূহ নারীদের চেয়ে অধিক শক্ত (More stronger)। পুরুষ ও নারীর শরীরের সব হরমোন (Hormon) এক নয়। এর মধ্যেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। যার জন্য মহিলাদের গোঁফ-দাড়ি জন্মায় না। আবার পুরুষেরও মাসিক হয় না। মায়ের স্তনে দুধ তৈরি হয়। পুরুষের স্তনে তা তৈরি হয় না।

www.nagorikpathagar.org

এসব আপনাদের জানা। তবে কিছু কিছু বিষয়ে এমন পার্থক্য আছে যা জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আল্লাহর বাণীর সত্যতা জেনে।

সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তাও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পুরুষের উপর। মানুষের দেহকোষ (Cell) ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোসোম (Chromosome) নিয়ে গঠিত। তন্মধ্যে ২২ জোড়া দেহগঠনে আর অবশিষ্ট ২৩তম জোড়া সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের কাজ করে। এই ২৩তম জোড়া পুরুষের বেলায় XY এবং মহিলাদের বেলায় XX। কাজেই পুরুষের শরীরে যে শুক্র তৈরি হয় তা X অথবা Y ক্রোমোসোম দিয়ে এবং মহিলাদের ডিম্ব তৈরি হয় শুধুমাত্র X ক্রোমোসোম দিয়ে। কারণ শুক্র ও ডিম্ব একটি মাত্র ক্রোমোসোম দিয়ে তৈরি। কাজেই মায়ের শরীর থেকে সন্তান শুধুমাত্র X ক্রোমোসোমই পেয়ে থাকে। যেহেতু তাদের শরীরে Yক্রোমোজোম নেই।

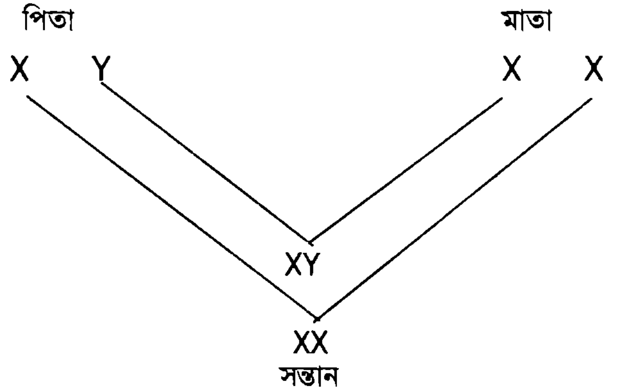

যে সন্তান মায়ের কাছ থেকে X এবং পিতার কাছ থেকেও X ক্রোমোসোম নিয়ে জন্মায় (XX) সে হবে মেয়ে। আর যে সন্তান মায়ের কাছ থেকে X এবং পিতার কাছ থেকে Y ক্রোমোসোম নিয়ে জন্মায় (XY) সে হবে ছেলে। ছেলের দেহে XY ক্রোমোসোমের মধ্যে Y ক্রোমোসোম প্রাধান্য পায় বলে সন্তান ছেলে হয়। একে চিকিৎসাবিজ্ঞান নাম দিয়েছে ম্যান্ডেলিয়ান ডমিনেন্ট (Mandalian dominant)। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ছেলের দেহে X ক্রোমোসোম প্রাধান্য পায় না কেন? এর উত্তর আল্লাহই ভাল জানেন। কাজেই ছেলে মেয়ে হওয়া পিতার শুক্রকীটের উপরই নির্ভরশীল। মায়ের এখানে কিছুই করার নেই। অথচ আমাদের দেশে মেয়ে হলে মাকেই দায়ী করা হয়। এমনকি অনেক সময় মাকে অপমান করতেও দ্বিধা করে না। তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) পর্যন্ত হয়ে যায়।

আপনি আরো আশ্চর্য হবেন শুক্রই ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রূণ তৈরি করে। কখনো ডিম্ব শুক্রের মধ্যে প্রবেশ করে সন্তান জন্মায় না। আবার অধিকাংশ পুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু মহিলারা সাধারণত ৪৫ বছর বয়সের পর সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মানে ডিম্ব তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। একে ম্যানোপোজ (Manopause) বলে।

যেসব মহিলাদের রক্তের গ্রুপ আর এইচ নেগেটিভ (Rh^-) তাদের সাধারণত প্রথম সন্তান বাঁচতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় .... সন্তান জন্মায় না বা বিকলাঙ্গ অথবা মৃত হয়। কিন্তু পুরুষদের রক্তের গ্রুপ আর এইচ নেগেটিভ (Rh^-) হলে সন্তানের উপর কোনই প্রতিক্রিয়া (Affect) হয় না। একি প্রমাণ করে না পুরুষ নারীর চেয়ে শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান? সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই। আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই। অনেকেই তা অনুধাবন করে না।

"আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব, বিশ্ব জগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া ইঠবে যে, উহাই সত্য।" (৪১ ঃ ৫৩)

সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

পবিত্র কুরআনে মহান স্রষ্টা ঘোষণা দেন-

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ـ (الذريت : ٤٩)

"আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা যারিয়াত ৫১ঃ আয়াত ৪৯)

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ـ (يس : ٣٦)

"পবিত্র মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না, তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।"

(সূরা ইয়াসিন ৩৬ ঃ আয়াত ৩৬)

وَخَلَقْنٰكُمْ أَزْوَاجًا ـ (النبا : ٨)

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায়।"

(সূরা নাবা' ৭৮ ঃ আয়াত ৮)

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ـ (زخرف : ١٢)

"আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন।"

(সূরা যুখরুফ ৪৩ ঃ আয়াত ১২)

www.nagorikpathagar.org

উপরের আয়াতে যুগল বা জোড়া বুঝাতে (زوج) বা (زوجين) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় শব্দের মূল (زوج) শব্দটি শুধু জোড়াই নয় স্বামী স্ত্রী (বিপরীত লিঙ্গ) ও বুঝায়। আবার সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় বলতে জড় এবং জীব কিছুই বাদ পড়ে না। জীব বা প্রাণীকে না হয় বোঝা গেল জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ উদ্ভিদও স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ হয়। তাছাড়া একই গাছের রেণুও দুই লিঙ্গের যা বাতাস, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় ও পশুপাখি দ্বারা স্থানচ্যুত হয়ে গর্ভধারণ করে। প্রশ্ন হচ্ছে জড় পদার্থের কোন ছেলেমেয়ে বা বংশবৃদ্ধি নেই। তবে কিভাবে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হল এসব? তাহলে কি আল্লাহ ভুল বলেছেন? (নাউযুবিল্লাহ)। আপনারা জানেন, প্রতিটি পদার্থই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু (Atom) দিয়ে গঠিত। একটি পরমাণুর ভিতর আছে ইলেকট্রন ও প্রোটন। ইলেকট্রন নেগেটিভ (-Ve). আর প্রোটন পজেটিভ (+Ve)। ইলেক্ট্রন হচ্ছে এন্টিপ্রোটন। একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। কাজেই পরমাণু জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রন ও প্রোটন নিয়ে গঠিত। এখানেই শেষ নয় এখন পরমাণুর মধ্যে আরো আবিষ্কার হয়েছে কোয়ার্ক ও এন্টিকোয়ার্ক, ডয়টেরন ও এন্টিডয়টেরন। এসব থাকে পরমাণুর মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় বিপরীত লিঙ্গে। আলহামদুলিল্লাহ! "আল্লাহর বাণীর কোনোই পরিবর্তন নাই। উহাই মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪) "আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই।" (৩০ ঃ ৩০) "এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি।" (৭ ঃ ৩২)

তিনি জড় ও জীব সবই সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, বিপরীত লিঙ্গে। এসব কি প্রমাণ করে না কুরআন স্রষ্টারই বাণী?

মহাবিশ্বে সবকিছুই ঘুরছে, কিছুই স্থির নেই

মহান স্রষ্টা বলেন-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

(الانبياء : ٣٣) .

"আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৩৩)

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ . (يس : ٤٠)

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

(সূরা ইয়াসিন ৩৬ ঃ আয়াত ৪০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'কুল্লু' শব্দটির অর্থ হলো সবকিছু, যাকিছু, প্রত্যেক ইত্যাদি। অণু, পরমাণু থেকে আরম্ভ করে অতি বিশাল বিশাল গ্যালাক্সি এই 'কুল্লু' শব্দটির আওতাভুক্ত। উপরোক্ত আয়াতসমূহে মহান স্রষ্টা ১৫০০ বছর পূর্বে ঘোষণা দিচ্ছেন সবকিছুই ঘুরছে। আর আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করছে মহাবিশ্বে অতি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে অতি বিশাল গ্রহ, তারা, গ্যালাক্সি কিছুই স্থির নেই। আপনি হয়ত বলবেন, কুল্লু (সবকিছু) বলতে তো কিছুই বাদ পড়ে না। এক টুকরা পাথর, মাটি, কাঠকেও বুঝায়। তবে এসব ঘুরছে কোথায়?

পাথর, মাটি ও কাঠ যাহাই বলুন না কেন সবই অতি ক্ষুদ্র পরমাণু (Atom) এর সমষ্টি। প্রতিটি পরমাণুতে অনেক কিছুর মধ্যে ইলেক্ট্রন ও ফোটন রয়েছে। এই ইলেকট্রন ও ফোটন পরমাণুর ভিতরে ঘুরতে থাকে। উপরের আয়াতগুলোর মধ্যে আরেকটি শব্দ হচ্ছে- 'ফালাক' যার অর্থ হচ্ছে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার। আমরা পদার্থের সর্বনিম্ন একক যে পারমাণুবিক কণার কথা জানি তার কক্ষপথ সত্যি সত্যিই গোলাকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকারও। অন্যদিকে মহাবিশ্বে গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি সবই ঘুরছে উপবৃত্তাকারে। "ইহাই প্রমাণ যে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪) "এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।" (৭ ঃ ৫৮)

চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই

সূর্য পরিবারের সব সদস্যই সূর্য থেকে আলো পায়। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই। এটা প্রমাণিত সত্য যে, সূর্যের আলো চাঁদের উপর পতিত হয়ে আলোকিত হয় বলে আমরা চাঁদকে দেখতে পাই। পবিত্র কুরআনে সূর্যের আলোকে বলা হয়েছে 'সিরাজ' বা কোথাও 'দ্বিয়া' আর চাঁদের আলোকে বলা হয়েছে 'মুনীর'। পবিত্র কুরআনের কোথাও সূর্যের আলোকে মুনীর আর চাঁদের আলোকে সিরাজ বা দ্বিয়া বলা হয় নাই। যেমন-

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۔ (نوح : ١٦)

"এবং চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ রূপে।" (সূরা নূহ ৭১ ঃ আয়াত ১৬)

وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب - (يونس : ٥)

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোর্তিময় করিয়াছেন এবং ইহার মন্‌যিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৫)

تبرك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا -(الفرقان : ٦١)

"কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।"

(সূরা ফুরকান ২৫ ঃ আয়াত ৬১)

সিরাজ অর্থ প্রদীপ- যে আলো দেয়। আমার মনে হয় আমাদের দেশে যে চেরাগ ব্যবহার করা হয় সে চেরাগ শব্দটি সিরাজ শব্দ থেকে এসেছে। এটা মিশরীয়দের উচ্চারণ। কারণ মিশরীয়রা 'জিম' কে 'গাইন' উচ্চারণ করে। আবার দ্বিয়া মানেও প্রদীপ-যে আলো দেয়। আমাদের দেশে হয়তো 'দ্বিয়া' শব্দ থেকেই 'দিয়াশলাই' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অন্যদিকে মুনীর অর্থ আলোকিত। যা আলো দেয় না। কুরআন নাযিলের সময় কে জানত যে, সূর্য নিজের আলোই ছড়িয়ে দেয় আর চাঁদ আলো পায় সূর্য থেকে। সুবহানাল্লাহ।

وفى الارض ايت للموقنين - (الذريت : ٢٠)

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে পৃথিবীতে।

(সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ আয়াত ২০)

"আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।"

চন্দ্র, সূর্য সময়ের নির্ধারক

প্রথম চন্দ্রোদয় থেকে পরবর্তী চন্দ্রোদয়ের আগ মূহূর্ত পর্যন্ত সময়কে চান্দ্রমাস বলা হয়। এরকম বারমাসে এক বছর। আবার ৩৬৫দিনে এক সৌরবছর। এক সৌরবছর থেকে চান্দ্র বছর ১১-১২ দিন কম। সৌর সময়ের সাথে মুসলমানদের নামায, রোযা আর চান্দ্র মাসের সাথে রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত

ও কুরবানি সম্পৃক্ত। উভয় প্রকার হিসাবই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। কারণ এসবই মহান স্রষ্টার সৃষ্টি।

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا (ط) ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - (الانعام : ٩٦)

"তিনি ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য, চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।"

(সূরা আন'আম ৬ ঃ আয়াত ৯৬)

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ (ط) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ - (البقرة : ١٨٩)

লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক'। (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৮৯)

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ - (التوبة : ٣٦)

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হইতে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি।" (সূরা তাওবা ৯ ঃ আয়াত ৩৬)

রাসূল (সা) যখন প্রথম মক্কায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করলেন তখন কুরাইশরা নবীজীকে মেনে নিবে কি নিবে না এতে বিব্রতবোধ করতে লাগল। তাই তারা নজর ইবনে হারেছ এবং ওকাবা ইবনে আবী মুরীতকে মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করেন রাসূল (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে জানার জন্য। ইহুদী পণ্ডিতরা তাদেরকে তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে বলে দিয়েছেন, তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নিবে, তিনি আল্লাহর রাসূল। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে-

১. "তাঁকে ঐসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা।"

২. "তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তাঁর ঘটনা কি?"

৩. "তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?"

তারা মদিনা থেকে ফিরে এসে মক্কার কুরাইশদেরকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলো জানিয়ে দিল। এসব প্রশ্নের মধ্যে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- প্রথম প্রশ্নটি। যেসব যুবকদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তাদেরকে "আসহাবে কাহফ" (গুহাবাসী) বলা হয়েছে। তাঁরা দীর্ঘদিন গুহার মধ্যে ঘুমন্ত ছিল। দীর্ঘদিন মানে কতদিন? এর উত্তরে সূরা কাহ্ফ এর ২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

—৯

www.nagorikpathagar.org

وَلَبِثُوا فِى كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ـ (الكهف : ٢٥)

"উহারা গুহায় ছিল তিনশত বৎসর আরো নয় বৎসর।"

(সূরা কাহফ ১৮ ঃ আয়াত ২৫)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একত্রে তিনশত নয় বছর না বলে কেন তিনশত বছর আরো নয় বছর অথবা তিনশত বছর অতিরিক্ত আরো নয় বছর বলা হলো? কোন কোন তাফসীরবিদ এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর বছরের প্রচলন ছিল। এই হিসেবে তিনশত বছর আর ইসলামী চান্দ্র বছর প্রচলিত। চান্দ্র বছর প্রতি একশ সৌর বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। অর্থাৎ সৌর একশ বছর সমান চান্দ্র একশ তিন বছর। কাজেই সৌর ৩০০ বছর সমান চাঁদের তিনশত বছরের চেয়ে ৯ বছর বেশি। দুই প্রকার বর্ষ বোঝাবার জন্য উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন শিখিয়ে দিয়েছেন ইহুদী পণ্ডিতগণ। কাজেই একই আয়াতে ইহুদী ও মুসলমান দুই পক্ষেরই উত্তর হয়ে গেল। (সুবহানাল্লাহ!)

আলোচনা এখানেই শেষ নয়। উক্ত সূরায় আসহাবে কাহ্ফদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ (ق) وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ـ

(الكهف : ١٨)

"তুমি মনে করিতে উহারা জাগ্রত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম ডানদিকে ও বামদিকে।" (সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ আয়াত ১৮)

এ সূরা, এমনকি কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে দীর্ঘদিন ঘুমন্ত লোককে ডানদিকে ও বামদিকে পরিবর্তন করানোর কথাটি বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হবে না। এতে না আছে পূর্বের সাথে পরের আয়াতের মিল, না আছে কোন প্রশ্নের উত্তর, আর না আছে কোন হেদায়াতের বা ইবাদতের কথা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এ কথাটি বলাই ছিল নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ কি বিনা কারণে কুরআনের মত ওহী গ্রন্থে এ বাণীর উল্লেখ করেছেন? আমি ডাক্তার হিসেবে এ আয়াতের অর্থ প্রথম পড়ার পর মনে হয়েছে- সারাজীবনও যদি সিজদায় পড়ে থাকি তাহলেও মানব জাতির জন্য এ শিক্ষার বিনিময় আদায় করা অসম্ভব। আমি নিজের অজান্তেই আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ পড়ে কতক্ষণ যে নিশ্চুপ হয়ে ছিলাম তা মনে নেই। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি, মানুষ দীর্ঘদিন অজ্ঞান (Senseless) বা অবশ (Paralysis) হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় যদি ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন

www.nagorikpathagar.org

করানো না হয় তাহলে শরীরের নিচের অংশে ঘা হয়ে পচন ধরে। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Bedsore বলে। দীর্ঘদিন অজ্ঞান বা অবশ রোগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়ে হয়তো রোগমুক্ত করা সম্ভব, কিন্তু Bedsore ভালো করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এমনকি রোগী রোগ মুক্ত হয়েও Bedsore এর জন্য মারা যায়। কাজেই ডাক্তারদের কাছে অজ্ঞান বা অবশ রোগীকে পার্শ্ব পরিবর্তন করানোটা কত যে মূল্যবান তা বুঝতেই পারেন। সে কারণে আমরা অজ্ঞান রোগীর জন্য নেই ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করার Special care। ভাবতে অবাক লাগে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অনেক আগেই অজ্ঞান বা অবশ রোগীকে পার্শ্ব পরিবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তাছাড়া পার্শ্ব পরিবর্তনের কথা যদি না বলতেন তাহলে আজ হয়ত অনেকেই প্রশ্ন তুলতেন আসহাবে কাহ্ফরা ঘুমন্ত অবস্থায় এত দীর্ঘকাল (পার্শ্ব পরিবর্তন ছাড়া) জীবিত থাকল কি করে? অতএব উপরোক্ত আয়াতটি কুরআনে উল্লেখের ব্যাপারটি আপনি কিভাবে নিবেন তা আপনার বিবেকের উপরই ছেড়ে দিলাম। এটা কি প্রমাণ করে না "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

"ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (১৪ ঃ ৫২)

"এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ তায়ালা সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

"আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না।" (৩৫ ঃ ৪৩)

উদয়াচল ও অস্তাচল কয়টি?

এমন অনেক লোক আছেন যাকে কোথাও তার নাম নিয়ে, কোথাও কারো জামাই বলে, কোথাও কারো বাবা বলে, আবার কোথাও কারো শ্বশুর বলে ডাকে। অথচ লোক একজনই। উদয়াচল ও অস্তাচল এর অবস্থাও তেমনি।

উদয়াচল ও অস্তাচল বলতে পৃথিবীর অবস্থানের সাথে সূর্য যে স্থান বরাবর উদয় হয় ও যে স্থান বরাবর অস্ত যায় তাকেই বুঝায়। সূর্য কিন্তু প্রতিদিন একই স্থান বরাবর উদয় ও অস্ত যায় না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে প্রতিদিনই স্থান পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মকালে আমাদের বাংলাদেশের সাথে সূর্যের অবস্থান থাকে উত্তর দিকে। প্রতিদিন একটু একটু করে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তন হতে হতে উত্তরদিকের একটা শেষ সীমানা বরাবর অবস্থান নেয়। তারপর সূর্যোদয়ের স্থান উত্তরে আর সরে না যেয়ে আবার দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে। অন্যদিকে যখন সূর্যোদয়ের অবস্থান আমাদের দেশের দক্ষিণে চলে যায় তখন শীত আরম্ভ হতে থাকে। পৃথিবীর সাথে সূর্যের অবস্থান যত দক্ষিণে বেশি হবে শীতের

www.nagorikpathagar.org

তীব্রতাও উত্তর গোলার্ধে তত বাড়তে থাকবে। এক সময় সূর্য সর্ব দক্ষিণে অবস্থান নেয়ার পর আবার উত্তরদিকে স্থান পরিবর্তন হতে থাকে। এমনিভাবে প্রতিদিনই অস্তাচলের অবস্থানও পরিবর্তন হতে থাকে। অতএব সূর্যের উদয় স্থান ও অস্তাচল কখনোই এক থাকে না। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় সূর্য একই সময়ে উদিতও হয় না। বরং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে উদিত হয় ও অস্ত যায়। এসব কারণে হয়তো পবিত্র কুরআনে উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহ বলা হয়েছে।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - (الصفت : ٥)

"যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বতী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।" (সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ আয়াত ৫)

فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ - (المعارج : ٤٠)

"আমি শপথ করিতেছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের অধিপতির। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।" (সূরা মা'আরিজ ৭০ ঃ আয়াত ৪০)

আরেক হিসেবে সূর্যের সর্ব উত্তরের উদয় স্থান ও সর্ব দক্ষিণের উদয়স্থান, এই দুই বিন্দুকে দুই উদয় স্থান বললে ভিতরের উদয় স্থানসমূহ এরই মধ্যে পড়ে যায়। এ হিসেবে সূর্যের উদয় স্থানকে দুই উদয়াচল অনুরূপভাবে দুই অস্তাচল বলা যায়। আবার পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন অপর গোলার্ধে উদিত হয়। এভাবেও দুটি উদয়াচল এবং দুটি অস্তাচল বলা যায়। একারণেই হয়তো সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে-

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ - (الرحمن : ١٧)

"তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।"

(সূরা আর রাহমান ৫৫ ঃ আয়াত ১৭)

অন্যভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মতো একটি দিক হলো পূর্ব। আর একটি দিক হলো পশ্চিম।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا - (المزمل : ٩)

"তিনিই পূর্ব ও পশ্চিম এর মালিক, তিনি ব্যতীত কোনই ইলাহ্ নাই। অতএব তাহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।

(সূরা মুয্যামল ৭৩ ঃ আয়াত ৯)

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনে কোথাও উদয়াচল ও অস্তাচল আবার কোথাও দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল এবং কোথাও উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহের কথা বলা হয়েছে। তা পরস্পরবিরোধী নয়। বরং সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছে। ১৫০০ বছর পূর্বে কে চিন্তা করেছে যে, সূর্য

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদিনই স্থান পরিবর্তন করে। সুবহানাল্লাহ! "নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে পৃথিবীতে (৫১ ঃ ২০)।" আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। আবার কখনো চিন্তা করে দেখেছেন কি? সূর্যোদয়ের অথবা সূর্যাস্তের দিকে নামায পড়তে বলা হয়নি। তাহলে প্রতিদিনই নামায পড়ার দিকও পরিবর্তন করতে হত। পরিবর্তন করতে হত মসজিদের দিকের (Direction) ও। বলা হয়েছে কাবার দিকে ফিরে নামায পড়তে। কাজেই পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে কাবার অবস্থান সব সময়ই এক। এর কোন পরিবর্তন নেই। নইলে কিরূপ সমস্যা দেখা দিত তা একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহ্ কত মেহেরবান। তিনি আমাদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছেন দ্বীন ইসলামকে। আল্লাহর ঘোষণা-

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের ক্লেশকর তাহা চাহেন না।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৮৫)

"কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?" (৫৪ ঃ ১৭)

"নিঃসন্দেহে ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।" (৩ ঃ ১৯)

"কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনো কবুল করা হইবে না।" (৩ ঃ ৮৫)

সূর্য ও পানির অবদান

যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতের মধ্যে বস্তু জগতে আমরা কোন জিনিসের উপর বেশি নির্ভরশীল?- এর সরাসরি উত্তর হবে সূর্য ও পানি। সূর্য থেকেই আমরা আলো ও তাপ পাই। আপনারা জানেন ভূপৃষ্ঠের পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে। পৃথিবীর বেশির ভাগ পানির অবস্থান হচ্ছে সমুদ্র। আর সমুদ্রের পানি খুবই লবণাক্ত। যা পান করাতো দূরের কথা মুখে নেয়াই যায় না। কাজেই জলীয় বাষ্পও লবণাক্ত হওয়ারই কথা। অথচ জলীয় বাষ্পে কোন লবণ নেই। কারণ পানি বাষ্প হওয়ার সময় লবণ সহ যাবতীয় জৈব ও অজৈব পদার্থ এবং রোগজীবাণু সবকিছু রেখে দিয়ে শুধুমাত্র পরিশোধিত ও বিশুদ্ধ (Pure) পানি বাষ্প হয়। এ জলীয় বাষ্প উপরে উঠে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে ঘনীভূত হয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়। ঠাণ্ডার কারণে এই পানি আর উপরে উঠতে পারে না। পরে তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে বৃষ্টির আকারে আবার পৃথিবীতে নেমে আসে।

পনেরশত বছর পূর্বে মহান স্রষ্টা জানালেন-

www.nagorikpathagar.org

وهو الذى ارسل الريح بشرا بين يدى رحمته (ج) وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسى كثيرا - ولقد صرفنه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا -

(الفرقان : ٤٨-٥٠)

"তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি- যাহা দিয়া আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে উহা পান করাই, এবং আমি এই পানি উহাদের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।"

(সূরা ফুরকান ২৫ ঃ আয়াত ৪৮-৫০)

افرءيتم الماء الذى تشربون - ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون - لونشاء جعلنه اجاجا فلولا تشكرون - (الواقعة : ٦٨-٧٠)

"তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করিয়াছ? তোমরা কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।" (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬ ঃ আয়াত ৬৮-৭০)

বৃষ্টির পানি পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, খাল-বিল ও উচ্চ শৃঙ্গে জমে। এতে ভূপৃষ্ঠে নানারকম উদ্ভিদ জন্মায়। উদ্ভিদের ফলমূল খেয়েই প্রাণীরা বেঁচে আছে।

বৃষ্টির পানি মেরুদ্বয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও পাহাড়-পর্বতে বরফ সৃষ্টি করে। এই বরফ গলে বৃষ্টিহীন সময়ও পানির সরবরাহ অব্যাহত রাখে। গলিত বরফ দিনের বেলায় সূর্যের তাপকে শুষে নিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা রক্ষা করে। আর কতিপয় অংশ বরফ হিসেবেই থেকে যায়। যা ভবিষ্যতে আবার বৃষ্টির পানিকে বরফ করতে সাহায্য করে। বৃষ্টির ফলেই পাহাড়-পর্বত ও দুর্গম অরণ্যে উদ্ভিদ জন্মায়। আমাদের খাদ্য ও বাসস্থান সবই সরাসরি (Directly) অথবা পরোক্ষভাবে (Indirectly) সূর্যের অবদান। সূর্যের আলোর ফলেই গাছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের খাদ্য তৈরি করে। আর বায়ুমণ্ডলে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন (O_2) সরবরাহ ও সমপরিবমাণ বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) গ্রহণ করে বায়ুকে পরিশোধিত করে। সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়। গরম মাটির ছোঁয়ায় ভূপৃষ্ঠের বাতাস ও গরম হয়। আর গরম বাতাস হালকা বলে তা উপরের দিকে চলে যায়। তখন চারিদিকের ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই ফাঁকা জায়গা ভরে ফেলে। কিন্তু সেই ঠাণ্ডা বাতাসও আবার গরম মাটির ছোঁয়ায় এসে গরম হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে

www.nagorikpathagar.org

সূর্যের তাপে বাতাসের প্রবাহ চলতে থাকে। এ বাতাসই পরাগরেণুকে ফুলের গর্ভকেশরে পৌঁছিয়ে দেয়। তা না হলে হয়তো উদ্ভিদের গর্ভধারণ হতো না। গর্ভধারণ না হলে জন্মাতো না লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ। যার ফলে ফলমূল ও খাদ্যভাণ্ডারের বিরাট ঘাটতি দেখা দিত। মরে যেত প্রাণিকূল। আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ـ (فاطر : ٩)

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি।"

(সূরা ফাতির ৩৫ ঃ আয়াত ৯)

وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ (البقرة : ١٦٤)

"বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৬৪)

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ (يونس : ٦٤)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬৪)

সূর্য ও চাঁদের অবদান

মহাবিশ্বে সবই সবকিছুকে টানছে। চাঁদ ও সূর্যের মিলিত টানে জোয়ার ভাটা হয়। তবে সূর্যের চেয়ে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে বলে চাঁদের প্রভাবটাই বেশি। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরার সময় পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে সে অংশের উপর চাঁদের আকর্ষণটা বেশি হয়। স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের উপর চাঁদের আকর্ষণের প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে চারিদিক থেকে পানি ঐ স্থানের দিকে ধাবিত হয়। ফলে চাঁদের কাছাকাছি অংশের পানি ফুলে উঠে এবং জোয়ার সৃষ্টি করে। অমাবস্যা আর পূর্ণিমার সময় জোয়ার বেশি হয়। কারণ, তখন সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই লাইনে অবস্থান করে। আবার জোয়ারের সময় মধ্যবর্তী দু'পাশের স্থান থেকে পানি সরে যায়। কাজেই চব্বিশ

www.nagorikpathagar.org

ঘণ্টায় দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাটা হয়। জোয়ার-ভাটা আমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। যেমন- জোয়ার-ভাটার দরুন-

১. নদীতে তলানী জমতে পারে না ফলে নদীও ভরাট হয় না।

২. অতি সহজে বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে গমনাগমন করতে পারে।

৩. নদীর আবর্জনা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায় এবং পানি নির্মল করে।

৪. নদীর পানি কিছুটা লবণাক্ত হয়। যার ফলে পানির ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে সহজে বরফ হয় না।

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (ط) كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى (ط) يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ـ(الرعد : ٢)

"আল্লাহ্ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।" (সূরা রা'দ ১৩ ঃ আয়াত ২)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।"

(১০ ঃ ৬৪)

দিন-রাতের অবদান

দিন-রাতের পরিবর্তনের উপর অনেকগুলি আয়াত রয়েছে পবিত্র কুরআনে। রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত এটা একটা সাধারণ নিয়ম। অথচ এ সাধারণ ঘটনাটি সম্পর্কে এতগুলো আয়াত নাযিল হয়েছে- বিনা কারণে? শুধু তাই নয় আরো দাবি করা হয়েছে- দিন রাতের পরিবর্তন জ্ঞানীদের চিন্তার বিষয়।

اِنَّ فِىْ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ـ (يونس : ٦)

"নিশ্চয়ই দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৬)

www.nagorikpathagar.org

انّ فى خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى
تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء
فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من* دابة (ص) وتصريف الريح
والسحاب المسخر بين السماء والارض لايت لقوم يعقلون - (البقرة : ١٦٤)

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহাদের মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৬৪)

কুরআনের বিরুদ্ধবাদীরা এমন কি আপনিও হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারেন দিন রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের কি আসে যায়? কেনইবা দিন-রাত হয়? দিন-রাতের পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টার বেশি বা কম হলে এবং সারা পৃথিবীতে শুধু দিন অথবা শুধু রাত হলে কি হত?- এসব প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে এ প্রবন্ধটি।

প্রথমেই সৌর পরিবারের সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা জানেন সূর্য ও তার দশটি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ নিয়ে মোটামুটি সূর্য পরিবার। এদের মধ্যে দিন রাতের পার্থক্য অনেক। সূর্যের কাছের কোন গ্রহের তাপমাত্রা দূরের গ্রহের চেয়ে কম। নিম্নে দিনের স্থায়ীত্বকাল ও তাপমাত্রা সহ বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও চাঁদের একটা ছক দেয়া হল- যাতে আপনি বুঝতে পারবেন গ্রহসমূহের মধ্যে তাপের পার্থক্য কত ও কেন? এবং তাতে কি সমস্যা দেখা দেয়-

গ্রহের নাম	পৃথিবীর তুলনায় দিনের স্থায়ীত্বকাল	দিনের বেলায় তাপ	রাতের তাপ
বুধ	২৯ দিন ১২ ঘণ্টা	৩৫০^{o}C	- ১৭০^{o}C
শুক্র	১২১ দিন ১২ ঘণ্টা	৪৮০^{o}C	- ৩৩^{o}C
মঙ্গল	১২ ঘণ্টা ১৮.৫ মিঃ	-৩১^{o}C	- ৮৬^{o}C
চাঁদ	২৭ দিন ৮ ঘণ্টা	১১৭^{o}C	- ১৬৩^{o}C

উপরোক্ত ছক থেকে দেখা যায় সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধে রাতের তাপমাত্রা -১৭০^{o}C। এ তাপমাত্রা থেকেই বুঝা যায় এখানে রাতে প্রচণ্ড শীত অন্যদিকে এর উল্টো পিঠে দিনে তাপমাত্রা ৩৫০^{o}C হলেও তার চেয়ে দূরবর্তী

www.nagorikpathagar.org

শুক্র গ্রহে দিনের বেলায় (আলোকিত পিঠে) তাপমাত্রা ৪৮০^{o}C। কিন্তু কেন? লক্ষ্য করে দেখুন, শুক্রের দিনের পরিমাণ বুধের প্রায় ৪ গুণ, অর্থাৎ শুক্র গ্রহ দূরে হলেও বুধের চেয়ে চারগুণ বেশি সময় সূর্যের আলো পায়। আবার শুক্র গ্রহ সূর্য থেকে বুধের চেয়ে দূরে বলে তাপ চারগুণ না হয়ে (৪৮০^{o}C - ৩৫০^{o}C) ১৩০^{o}C বেশি হয়েছে। কাজেই কোন গ্রহের তাপ নির্ভর করে সূর্য থেকে ঐ গ্রহের দূরত্ব ও কতক্ষণ সূর্যের আলো উক্ত গ্রহে স্থায়ী হয় অর্থাৎ দিনের দীর্ঘতার উপর। মঙ্গলে দিনের স্থায়ীত্বকাল প্রায় পৃথিবীর সমান হওয়া সত্ত্বেও দূরত্বের জন্য এতে তাপের পরিমাণ দিনের বেলায় -৩১^{o}C আর রাতের বেলায় -৮৬^{o}C। দিনের স্থায়ীত্বকাল সমান হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গল গ্রহ মানুষ বাসের অনুপযোগী। বুধ, শুক্র ও মঙ্গল থেকেই প্রমাণ হচ্ছে পৃথিবীতে যেভাবে দিন-রাতের পরিবর্তন ও তাপমাত্রা রক্ষা হচ্ছে এটাই প্রাণিদের বাঁচার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ـ (يس : ٣٧)

"উহাদের জন্য এক নির্দশন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ আয়াত ৩৭)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ

(الفرقان ٦٢)

"তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তাহার জন্য- যে উপদেশ গ্রহণ করিতে ও কৃতজ্ঞ হইতে চাহে।"

(সূরা ফুরকান ২৫ ঃ আয়াত ৬২)

আমাদের জানার বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। কুরআনে দিন-রাত সম্পর্কে যে কয়টি আয়াত এসেছে তাদের একটি বিশেষ দাবি হল রাত মানুষের বিশ্রাম ও ঘুমের জন্য উপযোগী। দিনের বেলায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায় আর রাত্রিতে তা কমতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টা মোটেও ততটা স্বাভাবিক নয়। আপনারা জানেন পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে দিন রাতের পরিবর্তন ঘটায়। যদি এটি চাঁদের মতো আরো আস্তে আস্তে ঘুরত তবে দিনের স্থায়ীত্বকাল বৃদ্ধি পেত। ফলে দিনের বেলায় তাপমাত্রাও অনেক বেড়ে যেত আর রাত্রিতে তাপমাত্রা অনেক কমে যেত। আবার যদি দিন রাতের পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টার কম হত তবে দিনের তাপমাত্রা অনেক কমে যেত। ফলে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। এছাড়াও যদি পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর না ঘুরত বা আস্তে আস্তে ঘুরত তবে এর আলোকিত পৃষ্ঠে তাপ বৃদ্ধি পেতেই থাকত এবং সূর্যের ক্রমাগত আলো ও তাপে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের সব

www.nagorikpathagar.org

কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) শুষে নিয়ে সারা দুনিয়া অক্সিজেন (O_2) দিয়ে ভরে ফেলত। অধিক অক্সিজেনের জন্য প্রাণীকূল মৃত্যুমুখে পতিত হত। অন্যদিকে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে দীর্ঘ রাত্রির ফলে সূর্যের আলোর অভাবে গাছ অক্সিজেন তৈরি করতে পারত না। বেড়ে যেত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড। আর কমে যেত অক্সিজেন। যার ফলে প্রাণিকূলের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকত না। দীর্ঘ রাত বা দীর্ঘ দিন কোনটাই জীবন রক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে পারত না। মহান আল্লাহ বলেন-

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ (ج) يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ ـ (الزمر : ٥)

"তিনিই যথাযথভাবে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা।" (সূরা যুমার ৩৯ ঃ আয়াত ৫)

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ـ (الاعراف : ٥٤)

"তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে ইহাদের একে অন্যকে দ্রুত অনুসরণ করে।" (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ৫৪)

চাঁদ নিজ অক্ষের উপর ঘুরার সাথে সাথে পৃথিবীর চারদিকেও ঘুরছে। চাঁদের বেলায় এই দুটো ঘূর্ণায়নকাল এক সমান। অর্থাৎ নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরতে আর পৃথিবীর চারদিকে পাক দিতে একই সময় লাগে। এটা একটা আশ্চর্যজনক মিল। এ মিলের জন্যে চাঁদের নিজ অক্ষের উপর পাক দেয়া আর পৃথিবীর চারদিকে ঘোরা এমনভাবে হয় যে, চাঁদের এক পিঠই পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। পৃথিবী থেকে কখনও অপর পৃষ্ঠ দেখা যাবে না। চাঁদের মত পৃথিবীও যদি সূর্যের দিকে আজীবন একই দিকে মুখ করে ঘুরত তাহলে একদিক হত চিরদিনের জন্য গরম আর গরম আর অন্যদিক হত অন্ধকার (রাত্রি) এবং ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ (ط) اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ـ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ (ط) اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ـ (القصص : ٧١-٧٢)

"বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে, যে

www.nagorikpathagar.org

তোমাদিগকে আলোক আনিয়া দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না? বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে। যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না?" (সূরা কাসাস ২৮ ঃ আয়াত ৭১-৭২)

আবার পৃথিবীর যেদিকে সূর্য আছে তার অপরদিকে যদি আরও একটি সূর্য থাকত তাহলে পৃথিবী যেভাবেই ঘুরত না কেন সবসময়ই পৃথিবীর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ থাকত আলোকিত এবং গরম আর গরম। অতি শীত ও অতি গরম এ উভয় অবস্থাতেই পৃথিবীতে কোন জীবজন্তুর বসবাস করা সম্ভব হত না। যেমন- চাঁদে কোন দিনই মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব হবে না। কারণ, একেতো ওখানে বাতাস নেই অধিকন্তু চাঁদের সূর্যের দিকের অংশে তাপমাত্রা ১১৭^{o}C। আর রাতের অংশে তাপমাত্রা -১৬৩^{o}C। অতএব এক পৃষ্ঠে অতি গরম, এবং অন্য পৃষ্ঠে অতি ঠাণ্ডা বিধায় মানুষের বসবাসের অনুপযোগী। প্রশ্ন উঠতে পারে নভোচারীরা কি করে চাঁদে ঘুরে এলো? নভোচারীরা যে পোশাক পরে চাঁদে ভ্রমণ করেছিলেন তা চাঁদের আবহাওয়ায় ক্ষতি হতে পারে না। এই ধরনের পোশাক পরে মানুষ কিছুদিন থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে অক্সিজেন, খাওয়া দাওয়া, টয়লেট সবকিছুর সুযোগসুবিধা বিদ্যমান। আর বর্তমানে এর মূল্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৬০ কোটি টাকা)। চাঁদে বসে এই পোশাক পরিবর্তনও করা সম্ভব নয়। পরিবর্তন করতে গেলেই মারা যাবে। কোন গ্রহের দু'পাশে দু'টি বা দুয়ের অধিক সূর্য থাকলে তবে সে গ্রহেও কোনদিনই রাত্রি হবে না। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। এ গ্রহের মতো অনেক গ্রহ আছে যেখানে কোন রাত্রি নেই। এমনি একটি উদাহরণ হল Betacygni যার দু'পাশে দু'টি সূর্য এবং Alpha centauri যার পাশে সূর্যের সংখ্যা ৩টি। অতএব পৃথিবী যদি উপরোক্ত অবস্থায় পতিত হত তাহলে আমাদের অবস্থা কি হত, একটু ভেবে দেখবেন কি? "আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুন্দর এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান!" (৪০ ঃ ৬৪) "তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন।" (১৬ ঃ ১২) "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে

(বজ্রপাত, ঝড় ও হিংস্রপ্রাণী এরাও কি জীবজগতের কল্যাণে নিয়োজিত?)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ - لقمن - ٢٠

"তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু নিয়োজিত করিয়াছেন।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ২০)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - (الانبياء : ١٦)

"আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোনকিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করি নাই।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ১৬, দুখান ৪৪ ঃ আয়াত ৩৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহের দাবি অনুসারে বলা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবকিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। বিনা কারণে বা বিনা প্রয়োজনে কোনকিছুই সৃষ্টি করেন নাই। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে বজ্রপাত (Thunder), ঘূর্ণিঝড় (Cyclone), হিংস্রপ্রাণী যেমন- সাপ, বাঘ, সিংহও কি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে? নিম্নে এদের উপকারিতার বর্ণনা দেয়া হল।

বজ্রপাতের উপকারিতা ঃ বজ্রপাতে কোথাও কোথাও মানুষ, গাছপালা ও প্রাণীরা মারা যায় বটে কিন্তু আপনারা কি জানেন, বিদ্যুৎ চমক না হলে মানুষ তার খাদ্য পেত না, বঞ্চিত হতো খাদ্য থেকে? নাইট্রোজেন প্রোটিনের একটি প্রধান উপাদান। আর প্রোটিন দিয়ে জীবদেহ গঠিত। পানির পরেই উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রধান উপাদান নাইট্রোজেন (N_2)। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষ (Cell) গঠন ও বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য। উদ্ভিদ প্রথমে নিজে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, পরবর্তীতে প্রাণীরা উদ্ভিদ ও উহার ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। বায়ু মণ্ডলের প্রায় ৭৮% ভাগ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও নীলাভ শৈবাল এবং ব্যাকটেরিয়ার মত প্রোক্যারিওটিক জীব ছাড়া অন্য কেউ সরাসরি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। সবুজ উদ্ভিদেরা শুধুমাত্র মাটির নাইট্রোজেন যৌগ থেকে নাইট্রোজেন শুষে নেয়। ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগের অভাব ঘটে। মাটির নাইট্রোজেন যৌগের ঘাটতি প্রধানত বায়ুর নাইট্রোজেন থেকেই পূরণ হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলের মুক্ত (Free) নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে যৌগ সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। স্বাভাবিক অবস্থায় নাইট্রোজেনের সাথে বায়ুর অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকের ফলে বায়ুর নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন যৌগ সৃষ্টি করে বৃষ্টির সাথে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

www.nagorikpathagar.org

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ (নাইট্রিক অক্সাইড)

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ (নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড)

$2NO_2 + H_2O \rightleftharpoons HNO_2$ (নাইট্রাস এসিড) $+ HNO_3$ (নাইট্রিক এসিড)

$2HNO_3 + CaCo_3 \rightarrow Ca(No_3)_2 + Co_2 + H_2O$

এ প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন উদ্ভিদদেহে, সেখান থেকে প্রাণিদেহে চলে যায় ও পরবর্তীতে উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে পুনরায় মাটি বা বাতাসে ফিরে এসে নাইট্রোজেন চক্রের প্রক্রিয়া রক্ষা করে।

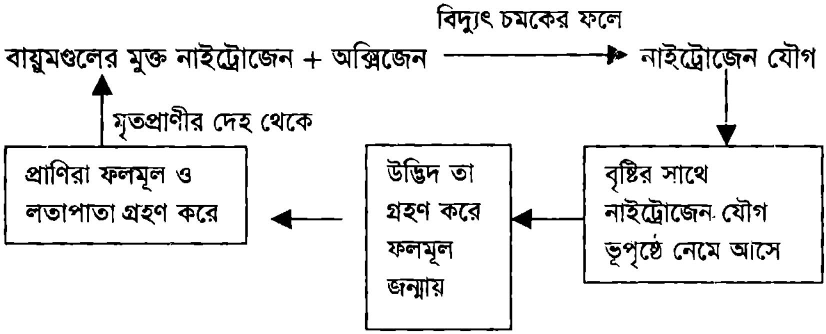

নাইট্রোজেন চক্র

কাজেই বিদ্যুৎ চমক না হলে নাইট্রোজেনের যৌগ পরিণত হত না। আর তা না হলে সকল জীবই শেষ হয়ে যেত খাদ্যের অভাবে। তাই বিদ্যুৎ চমক আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য। আকাশে অহরহ বিদ্যুৎক্ষরণ হচ্ছে। তন্মধ্যে কয়টিই বা ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। অধিকাংশই আকাশে নিঃশেষ হয়ে যায়। দু'চারটা যা-ও নেমে আসে সেগুলোর উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ খুবই সামান্য। কাজেই বিদ্যুৎক্ষরণ তথা বজ্রপাত আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ আমাদের বাঁচা-মরার সাথে সম্পৃক্ত। "আল্লাহ কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।"

ঝড় (Cyclone) এর উপকারিতা

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে ও অক্সিজেন গ্রহণ করে। ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জীব জগতের জন্য খাদ্য তৈরি করে। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ আবার তৈরি করে সমপরিমাণ অক্সিজেন যা জীব ও উদ্ভিদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত জরুরী। পৃথিবীর প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগই পানি। সাগর ও মরুভূমিতে উদ্ভিদের অভাবে অক্সিজেন তৈরি হয় না। বায়ু

www.nagorikpathagar.org

প্রবাহই উক্ত অঞ্চলসমূহে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। তা না হলে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাতায়াত ও মরুভূমিসমূহ জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ত। আবার যে সময়ে ফুলের পরাগরেণু পরিপক্ক হয়ে উঠে ঠিক তখনি গর্ভকেশর তার দেহ থেকে আঠালো পদার্থ বের করে তার অঙ্গটিকে আঁঠালো করে রাখে। সে সময় বাতাস পরাগরেণুকে আশেপাশের ফুলে পৌঁছে দেয়। এ বাতাস প্রবাহের জন্য সূর্য তার তেজোময় দীপ্তি দিয়ে পৃথিবীর কোন স্থানে বায়ুর শূন্যতা সৃষ্টি করে। সে শূন্যতার ফলে সৃষ্টি হয় বায়ুপ্রবাহ। অর্থাৎ শত শত মাইল দূরে কোন সমুদ্রের সৃষ্ট নিম্নচাপটিই বায়ু প্রবাহের জন্য দায়ী। নিম্নচাপ না হলে বায়ু প্রবাহ হত না। এই বায়ুপ্রবাহটা আমাদের জ্ঞানের অজান্তে পৃথিবীর পৃষ্ঠের যাবতীয় ফুলের বহনযোগ্য পরাগরেণু তুলে নিয়ে অন্য ফুলের গর্ভকেশরে পৌঁছে দিচ্ছে। তা না হলে লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ হয়তো বা বঞ্চিত হত গর্ভধারণ থেকে। গর্ভধারণ না হলে জন্মাত না লক্ষ কোটি নতুন উদ্ভিদ। প্রকৃতির খাদ্য ভাণ্ডার উদ্ভিদের ফলন হতে বঞ্চিত হলে খাদ্যের বিরাট ঘাটতি দেখা দিত।

সকল নিম্নচাপই বায়ুপ্রবাহ তৈরি করে। কিন্তু সকল নিম্নচাপ মারাত্মক ঝড়ের সৃষ্টি করে না। বছরে দু'এক বার যে ঝড় (Cyclone) হয় তার ক্ষতির তুলনায় নিম্নচাপে সৃষ্ট বায়ুপ্রবাহ জীবজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার উপকার অনেক বেশি। এ উপকারিতা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। "আল্লাহর বাণীর কোনই পরিবর্তন নেই। ইহা এক মহাসাফল্য।"

وَفِى الْاَرْضِ ايٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ـ (الذريت : ٢٠)

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে।" (৫১ ঃ ২০)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (ط) سُبْحٰنَكَ (ال عمران : ١٩١)

"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি মহান, পবিত্র।" (৩ ঃ ১৯১)

হিংস্র প্রাণীর উপকারিতা

প্রকৃতিতে যদি বনাঞ্চল, দুর্গম পাহাড় পর্বত, বন-বাদাড় ইত্যাদি না থাকত তবে সমস্ত পৃথিবীতে অক্সিজেনের বিপুল ঘাটতি এবং এর বিপরীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের আধিক্য দেখা দিত, তাতে জীবমণ্ডলের মৃত্যু ঘটত। তাহলে আজকের পৃথিবীকে আমরা আর খুঁজে পেতাম না। এই বনাঞ্চলকে বাঘ, সিংহ, হাঙ্গর, কুমির, সাপ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীরা প্রকৃতির পাহারাদার হিসেবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করেছে। প্রাণিরাই প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাছাড়া কুমির, সাপের চামড়া দ্বারা হাত ব্যাগ, মানিব্যাগ এবং সুন্দর সৌখিন ও

www.nagorikpathagar.org

দামি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। হিংস্র প্রাণীও আসলে সমস্ত জীবমণ্ডলের কল্যাণেই নিয়োজিত।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ (ط) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ـ (الجاثية : ١٣)

"আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্তকিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতেও রহিয়াছে নিদর্শন।" (সূরা জাছিয়া ৪৫ ঃ আয়াত ১৩)

পানির অস্তিত্ব ও গতিপথ

পানি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। যা বর্তমান যুগে একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অথচ কুরআন নাযিলের সময়ে পানি সম্পর্কে যেসব ধ্যানধারণা করা হত তার সাথে কুরআনের বর্ণনার কোনই মিল নেই। কারণ সে যুগের ধারণা বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল নানা দার্শনিক চিন্তা ও মতবাদের ভিত্তিতে, কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। সেকালে পানি সম্পর্কে যেসব ধারণা পোষণ করা হত তা আধুনিক যুগে এসে বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়ে দু'জন বিশেষজ্ঞ জিগাসটানি এবং বিব্লাভোক্স বিশ্বকোষের (ইউনিভার্সালিস এনসাইক্লোপিডিয়া) প্রবন্ধে সমস্যার একটি উত্তম ইতিহাস তুলে ধরেছেন। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মনে করা হত যে সমুদ্রের পানি বায়ুচালিত হয়ে স্থলভাগে চলে আসে, পরে তা মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। প্লেটো এ মতবাদ বিশ্বাস করতেন এবং আরো মনে করতেন মাটির নিচে গভীর সুরঙ্গ পথ (টারটারস) আছে। এই পথ দিয়ে পানি আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এসব মতবাদ প্রচলিত ছিল। এ্যারিস্টটলও মনে করতেন মাটির নিচের পানি বাষ্প হয়ে পাহাড়ি এলাকায় এসে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ভূগর্ভে হ্রদ সৃষ্টি করে এবং সে পানি থেকেই ঝর্ণার উৎপত্তি। ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এ ধারণাই বিশ্বাসী ছিল মানুষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ধারণার কোন সত্যতা নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কুরআন নাযিলের যুগে কেউই জানত না ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে উপরে মেঘ তৈরি করে। আর সে মেঘ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। মহান স্রষ্টা বলেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ (ج) فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ـ (الروم : ٤٨)

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ তিনিই যিনি বাতাস প্রবাহিত করেন- যাহা উৎপন্ন করে মেঘমালা। তিনি উহাদের ছড়াইয়া দেন আসমানে- যেমন ইচ্ছা; এবং উহাদের ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করেন পরে তুমি দেখিতে পাও যে, উহাদের মধ্য হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে থাকে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে তাঁহার বান্দাদের নিকট উহাদের পাঠাইয়া দেন এবং উহারা উল্লসিত হয়।"

(সূরা রূম ৩০ ঃ আয়াত ৪৮)

এছাড়াও কুরআনে পানি সম্পর্কে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা আজও চিন্তা ও গবেষণার দাবি রাখে। নিম্নে এমন দুটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিলাম-

الم تر ان الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله ليريكم من ايته (ط)
ان فى ذلك لايت لكل صبار شكور ـ (القمن : ٣١)

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ৩১)

ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله (ط) انه
كان بكم رحيما ـ (بنى اسرائيل : ٦٦)

"তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনিতো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত ৬৬)

উপরোক্ত আয়াতে দাবি করা হয়েছে নদীতে নৌকা চলাচল করে তা আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে- নদীতে নৌকা চলাচল করবে এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। তাতে অনুসন্ধান করার মত এমনকি নিদর্শন আছে? আপনি কি মনে করেন, মহান স্রষ্টা বিনা কারণে এমনিতেই এ দাবি করেছেন? সত্যিই পানির ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তত সহজ নয়। আসলেই পৃথিবীতে আদৌ পানি থাকার কথা নয়। পানি নিম্নের যেকোন এক অবস্থায়ই থাকার কথা ছিল।

১. পৃথিবীর পানি বাষ্প হয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত।

২. সারা দুনিয়া পানিতে ডুবে থাকতে পারত।

৩. সারা পৃথিবীর সম্পূর্ণ পানি বরফে পরিণত হতে পারত।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান না থাকলে অথবা কম হলে জলীয় বাষ্প উপরের দিকে চলেই যেত। আবার উপরে ঠাণ্ডা বাতাস জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করতে না পারলে জলকণা তৈরি হত না। ফলে বৃষ্টিও হত না। তাহলে একদিন পৃথিবীর সব পানিই বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াত। আর ফিরে আসত না। ফলে পৃথিবীতে কোন পানিই খুঁজে পাওয়া যেত না। যার ফলে নিঃশেষ হয়ে যেত জীবনের অস্তিত্ব। আসুন ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখি।

পৃথিবী যদি চাঁদের মত ছোট অর্থাৎ বর্তমান আয়তনের চারভাগের একভাগ হত তবে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানে যা আছে তার ৬ ভাগের ১ ভাগ। তাহলে সূর্যের তাপে পানি বাষ্প হয়ে উপরের দিকে চলে গেলে আর ফিরে আসত না কোনদিন। মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ার কারণে চলে যেত তো চলেই যেত। ফলে দ্রুত শেষ হয়ে যেত পৃথিবীর সমুদয় পানি।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ - (المؤمنون : ١٨)

"এবং আমি আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।"
(সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ আয়াত ১৮)

চাঁদ সবসময় পৃথিবীর দিকে একদিক মুখ করে ঘুরে। চাঁদের মত পৃথিবীও যদি সূর্যের দিকে একদিক মুখ করে ঘুরত তবে একদিকে হত তীব্র শীত যার কারণে পানি বরফ হয়ে যেত আর অন্যদিকে প্রখর গরমের জন্য পানি বাষ্পীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকত। অতি গরম ও অতি শীত কোন অবস্থায়ই পানি পাওয়া সম্ভব হত না।

পৃথিবী যদি সূর্যের সমান বড় হত তবে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানের ১৫০ গুণ। যার কারণে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা ৪ মাইলের চেয়েও কমে যেত। তাহলে পানি আর বাষ্পীভবন হত না। সারা পৃথিবী ডুবে যেত পানিতে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি বর্তমানের দ্বিগুণ হত তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপ কমে গিয়ে দাড়াত বর্তমানের ৪ ভাগের ১ ভাগে। তদুপরি কক্ষপথ বৃদ্ধির কারণেও শীতকালের পরিমাণ হত বর্তমানের চার গুণ। কাজেই সারা পৃথিবীর পানি বরফে পরিণত হয়ে যেত। এমনকি গ্রীষ্মকালেও মুক্ত পানি পাওয়া যেত না। তীব্র শীত ও মুক্ত পানির অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত অতি সহজেই।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বর্তমানের অর্ধেক হলে পৃথিবীতে সূর্যের তাপ হত বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে চারগুণ বেশি। কক্ষপথ হ্রাসের কারণে একটি ঋতু

www.nagorikpathagar.org

কাল হত মাত্র পনের দিনের। এমনি অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কল্পনাতীত রকম বেড়ে যেত, জীবনের কল্পনা হত এক অলীক স্বপ্ন বা দুরূহ ব্যাপার।

পৃথিবী যদি অবিকল বুধ, শুক্র বা মঙ্গলের মতো হত এবং তাদের অবস্থানে অবস্থান করত তাহলে পৃথিবীর অবস্থা হত নিম্নরূপ :

বুধের মতো হলে সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত ৩৫০^{o}C ও পশ্চাৎপিঠে -১৭০^{o}C
শুক্রের মতো হলে সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত ৪৮০^{o}C ও পশ্চাৎপিঠে -৩৩^{o}C
মঙ্গলের মতো হলে সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হত -৩১^{o}C ও পশ্চাৎপিঠে - ৮৬^{o}C

এভাবে পৃথিবী যদি সূর্যের দশটি গ্রহের যেকোন ১টির মতো (সর্বদিক দিয়ে) হত তবে জীবের অস্তিত্বই থাকত না। হারিয়ে যেত জীবজগত। আবার পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপমাত্রা ৪০০০^{o}– ৫০০০^{o} সেন্টিগ্রেড। সেখানে সকল ধাতব পদার্থ গলিত অবস্থায় বিরাজমান। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের দিকে প্রতি ১০০০ ফুট গভীরতার জন্য ১৬^{o} ফারেনহাইট করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের দেড় মাইল গভীরতায় তাপমাত্রা ১০০^{o} সেন্টিগ্রেট হওয়াতে সেখানে পানি বাষ্প হতে থাকে। কাজেই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি বর্তমানের চেয়ে দেড় মাইল কম হত তবে আমরা আর এ পৃথিবীর অধিবাসী হতাম না। প্রাণিকূল ফুটন্ত পানির মধ্যে ফুটতে থাকত। আর মাধ্যাকর্ষণ কম হত বলে সব পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি ৪,০০০ মাইলের চেয়ে আরো দেড় মাইল বেশি হত তবে পৃথিবীর ভিতরের তাপ ভূ-পৃষ্ঠের নিচের পানিকে পানি হিসেবে ধরে রাখতে পারত না। তাপের স্বল্পতার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের একটু নিচেই পানি কঠিন বরফে পরিণত হত। যার কারণে উদ্ভিদকূলের মৃত্যু হয়ে যেত। দেখা দিত খাদ্যাভাব। আর এমনি অবস্থা হলে সমস্ত জীব ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়ে যেত।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ -

(الملك: ٣٠)

"বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবাহমান পানি?" (সূরা মূলক ৬৭ ঃ আয়াত ৩০)

পৃথিবীর প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগই পানি। পৃথিবীর যাবতীয় শর্তাদি অপরিবর্তিত থেকে **যদি জলভাগের উপরিভাগ (উন্মুক্ত জলরাশি) বর্তমানের দ্বিগুণ হত** তবে বাষ্পীভবনও হত বর্তমানের দ্বিগুণ হারে, ফলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পও বৃদ্ধি পেতো। জলীয় বাষ্পের এই বৃদ্ধির কারণে সূর্যের ইনফ্রারেড রশ্মি (Infrared-ray) জীবন রক্ষাকারী ক্ষমতাকে কমিয়ে দিত বহুলাংশে।

www.nagorikpathagar.org

পচনশীল রোগের প্রকোপ বেড়ে যেত তীব্র ভাবে। মানুষ কোন রকমে বেঁচে থাকলেও মেধার বিকাশ হত অত্যন্ত নিম্নমানের।

উন্মুক্ত জলরাশি বর্তমানের অর্ধেক হলে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্ধেকে নেমে আসত। ইনফ্রারেড রশ্মিসহ সূর্যের সমস্ত জীবন ঘাতক (Lethal) রশ্মিদের বাধা দিয়ে বায়ুমণ্ডলের পক্ষে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হত না।

দিনের বেলায় পৃথিবী সূর্য থেকে যে তাপ সঞ্চয় করে তা যদি রাতের বেলায় সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে যেত তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠ দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে বরফ জমে যেত। এভাবে প্রতি রাতে বরফ জমতে জমতে সারা পৃথিবীর পানি একদিন বরফে পরিণত হয়ে যেত। যার ফলে বন্ধ হয়ে যেত সমুদ্রে নৌযানের চলাচল। এ ক্ষতিকর পরিস্থিতি যাতে না হতে পারে সেজন্য বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ও জলীয় বাষ্প রাত্রিকালে ভূপৃষ্ঠের ২০% তাপকে কম্বলের মত করে আটকে রাখে। যার কারণে সম্পূর্ণ তাপ রাত্রিতে হারিয়ে না যেয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা রক্ষা করে। এ তাপ আমাদের জানার ও বুঝার অজ্ঞাতে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার **দিনের সূর্য থেকে যেটুকু তাপ আমরা পেয়ে থাকি তা আরও কম হলে** পানি জমাট বেধে বরফ হয়ে যেত।

মহান স্রষ্টা বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا (ج) وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔ (النحل : ١٤)

"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে আহরণ করিতে পার তাজা মৎস্য এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এইজন্য যে, তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

(সূরা নাহল ১৬ ঃ আয়াত ১৪)

এতো গেল পানির উপর পৃথিবীর আয়তন, আকার, আকৃতি, অবস্থান ও বায়ুমণ্ডলের প্রভাবের কথা। কিন্তু পানিরও নিজস্ব কিছু ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে যা না থাকলে পৃথিবীতে পানি পাওয়া একেবারেই সম্ভব হত না। পানির এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির সাধারণ আইনের লংঘন। প্রকৃতির আইনকে লংঘন না করলে কখনোই পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার হত না।

www.nagorikpathagar.org

দুইভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন নিয়ে পানি (H_2O) গঠিত। এমনি দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ সালফার নিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)। পানির সূত্রাগত ওজন (Molecular wt). ১৮ আর হাইড্রোজেন সালফাইডের সূত্রাগত ওজন ৩৪। যা- ৫৯° সেন্টিগ্রেড তাপে বাষ্প হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রার আগেই পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবার কথা, সকল সময় বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকাই ছিল পানির জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রায় পানি বাষ্পায়িত না হয়ে কেন ১০০° সেন্টিগ্রেডে বাষ্পায়িত হয় তা বিজ্ঞানীদের অবাক করে দেয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রাই পানি বাষ্পায়িত হলে পৃথিবীতে কোন পানিই থাকত না। সবই বাষ্পীয় অবস্থায় বিরাজ করত। অথচ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত না হয়ে পানি তার সকল গুণাগুণ রক্ষা করে তরল অবস্থায় বিরাজ করছে, যার জন্য নদীতে নৌকা চলাচল সম্ভব হচ্ছে। পানির এই দুর্লভ গুণাগুণের কথা আল-কুরআনে এসেছে এভাবে -

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ (الجاثية : ١٢)

"আল্লাহইতো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে ও যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা জাছিয়া ৪৫ ঃ আয়াত ১২)

পানির স্বাভাবিক গুণাগুণগুলিই উপরোক্ত আয়াতের মূল বিষয়বস্তু। পানির এই গুণাগুণ সম্পর্কে প্রথম থেকেই মহান স্রষ্টা অবগত আছেন। তাই সত্যে পরিণত হয় মহান স্রষ্টার বাণী।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ (ط) لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (ج) خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ (ج) وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ـ (الانعام : ١٠٢)

"তিনিইতো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত (তত্ত্বাবধায়ক)।"

(সূরা আন'আম ৬ ঃ ১০২)

"তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলি দেখাইয়া থাকেন সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৮১)

উদ্ভিদ এবং জীবদেহের বেশির ভাগই পানি। পানির আশ্চর্য রকম দ্রবণীয় গুণাগুণ জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা যা খাই তা হজম হওয়ার পর

www.nagorikpathagar.org

খাদ্যের উপাদানগুলি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। এই খাদ্য উপাদান আমাদের শরীরের গঠন, ক্ষয় পূরণ ও কাজ করার শক্তি যোগায়। তাছাড়া আমাদের শরীরের অপ্রয়োজনীয় ও দূষিত উপাদান সমূহ পানির মাধ্যমেই ঘাম ও প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়। উদ্ভিদেরও বেঁচে থাকা এবং ফলমূল তৈরি করা পানির উপর নির্ভরশীল। কুরআন নাযিলের সময় মানুষ এ সম্পর্কে কতটুকুই বা জানত?

পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় স্ফুটনাংকের পূর্বে; এটিও পানির একটি বড় বাড়তি গুণ। এই জলীয় বাষ্পই পরে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। পানি বরফে পরিণত হওয়ার সময় আরও একটি বিশেষ গুণ প্রদর্শন করে যা না থাকলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেত। পানি যখন বরফে পরিণত হয়, তখন নিজ দেহ থেকে বিপুল পরিমাণ তাপ বের করে দেয়। (৮০ ক্যালরি / সি. সি) এই সুপ্ততাপ নদী ও সমুদ্রের নিচের জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। বেশিরভাগ তরলেরই তাপমাত্রা কমালে আয়তনও কমে। কিন্তু পানির তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেডের নিচে চলে গেলে আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে বরফ হতে থাকে, যার জন্য বরফ পানিতে ভাসে। কোন কারণে সমুদ্রের তলদেশে বরফ জমতে শুরু করলে আয়তন বৃদ্ধির কারণে তা ভেসে উঠে। বরফের আয়তন না বাড়লে সমুদ্রের নিচে বরফ তো ভেসে উঠতই না তদুপরি উপরের বরফও নিচে যেয়ে জমা হত। ফলে মেরু অঞ্চলের নদী ও সমুদ্র আস্তে আস্তে বরফে পরিণত হয়ে জলজ জীবদের মেরে ফেলত। অন্যদিকে বরফ ভাসে বলে সূর্যের তাপে আবার সে ভাসমান বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়। কাজেই একদিকে বরফ হতে থাকে আর অন্যদিকে সূর্যের তাপে তা গলতে থাকে। মহান স্রষ্টা বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - (البقرة : ١٦٤)

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিতসাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুরুজ্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৬৪)

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একি প্রতীয়মান হয় না- সকল সৃষ্টির মধ্যে, দিন রাতের পরিবর্তনে, নদীতে নৌকা চলাচলে, বারিবর্ষণে, বায়ুপ্রবাহে এবং মেঘমালাতে জ্ঞানবানদের জন্য গবেষণার ও চিন্তার নিদর্শন রয়েছে?

مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا - (نوح : ١٣)

"তোমাদের কি হইল তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করিতেছ না?" (সূরা নূহ্ ৭১ ঃ আয়াত ১৩)

"বল, রাহমান হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রি ও দিবসে?"

(সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৪২)

"ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার পালনকর্তার দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক।" (সূরা আদ্‌দাহ্‌র ৭৬ ঃ আয়াত ২৯)

দুই সাগরের মাঝে রয়েছে এক অন্তরায়

বাংলা ও ইংরেজিতে নদী ও সাগর বলতে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আরবিতে বড় নদী ও সমুদ্র বুঝাতে একই শব্দ "বাহার" ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ হচ্ছে বিপুল বা বিস্তীর্ণ পানির এলাকা। এতে সাগরও হতে পারে আবার বড় নদীও হতে পারে। নদীর পানির সাথে সাগরের পানির ক্ষার ও লবণাক্ততার পার্থক্যতো রয়েছেই। তদুপরি এক সাগরের সাথে অন্য সাগরেরও রয়েছে লবণাক্ততার পার্থক্য। কুরআন নাযিলের সময়কার মানুষের একথাতো জানারই কথা না। তদুপরি কুরআনের আরও দাবি হচ্ছে দুই সাগরের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায়। যার জন্য লবণাক্ততা এবং ক্ষার ছাড়া আরও পার্থক্য বিদ্যমান। সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন জ্ঞানই ছিল না সেকালে। বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে এক সমুদ্রের সাথে অন্য সমুদ্রের পানির অনেক পার্থক্য জানতে পেরেছেন। যা এক অদৃশ্য পর্দা বা অন্তরায় ছাড়া রক্ষা সম্ভব নয়। দুই সাগরের মধ্যে সত্যই কোন পার্থক্য আছে কিনা তা প্রমাণ করাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমেই এ সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেমন-

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ (ق) هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ

- (فاطر : ١٢)

www.nagorikpathagar.org

"দরিয়া দুটি একরূপ নহে, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, ক্ষার।" (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ আয়াত ১২)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ـ (النمل : ٦١)

"বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপোযোগী এবং উহার মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়।" (সূরা নাম্ল ২৭ ঃ আয়াত ৬১)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ـ (الرحمن : ١٩-٢٠)

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরায় যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।" (সূরা আর রাহমান ৫৫ ঃ আয়াত ১৯-২০)

বড় নদী যখন সাগরে পতিত হয় তখন মোহনায় যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা অনেকের জানা এবং অনেকেই তা প্রত্যক্ষও করে থাকবেন। নদীর নির্মল সুপেয় পানি যখন সমুদ্রের লোনা পানিতে গিয়ে পড়ে তখন তা সাথে সাথেই মিশে যায় না। কুরআনে এ প্রসঙ্গে যে ঘটনার বরাত টানা হয়েছে কারো কারো মতে- তা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা ও ফোরাত) নদীর মোহনার ঘটনা। এ দুটি নদী একসঙ্গে মিশেছে। একশ মাইল বিস্তৃত এই মোহনা 'শাতিল আরব' নামে পরিচিত। এখানে উপসাগরের অভ্যন্তরে জোয়ার ভাটার একটা চমৎকার প্রাকৃতিক রহস্যময় ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। জোয়ারের সময় সাগরের লোনা পানি নদীতে না এসে ফিরে আসে কেবল মাত্র মিঠা পানি। ফলে সে পানির সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা সহজে চলে। দুই নদী কিংবা দুই সাগরের পানি একত্রে না মিশার ব্যাপারটা শুধুমাত্র টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর ক্ষেত্রেই নয় সব নদ-নদী এবং সাগরের বেলাতেও প্রযোজ্য। ভাটার সময় নদীর মিঠা পানি সাগরে পড়ে তাই বলে সাগরের পানি মিঠা পানিতে পরিণত হয় না। আবার জোয়ারের সময় সাগরের লবণাক্ত পানি নদীর মিঠা পানিকে লবণাক্ত করে না। প্রবল স্রোতস্বিনী মিসিসিপি ও ইয়াংসির মত বৃহৎ নদীর বেলায়ও এই অদ্ভুত বিষয়টি লক্ষণীয়। এদের মিঠা পানি যেখানে সমুদ্রে পড়েছে সেখানে সমুদ্রের লোনা পানির সাথে মিশে যায় নি। দুই বৃহৎ নদীর পানি মিশে না যাওয়ার ব্যাপারটি বাংলাদেশেও প্রত্যক্ষ করা যায়। "রাজবাড়ি বহর" নামে একটা জায়গা আছে যেখানে পদ্মা ও মেঘনা মিশেছে কিন্তু হাজার হাজার বছর পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এদের একত্র মিল হয় নি। আরও লক্ষণীয় যে, এই রাজবাড়ি বহরের "বহর" শব্দটি আরবি বাহার শব্দটির সাথে মিল আছে। পার্থক্য শুধু এখানেই শেষ নয়। বর্তমানে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার পর

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এক সাগরের সাথে আরেক সাগরের পানির অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলোই প্রধান- বর্ণ (রং), লবণাক্ততা, উষ্ণতা (তাপ), ঘনত্ব ও মাছ ইত্যাদি। উপরোক্ত পার্থক্য-সমূহের কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ঃ

সমুদ্রের পানির বর্ণ (রং) ঃ পানি স্বভাবত বর্ণহীন কিন্তু নানা কারণে সমুদ্রের পানি বিভিন্ন রং ধারণ করে। গভীর সমুদ্রের পানি নীল এবং অগভীর সমুদ্রের পানি সবুজ। লোহিত সাগরে এক প্রকার উদ্ভিদের জন্য আর প্রশান্ত মহাসাগরে আগ্নেয়গিরির জন্য পানির কিছু অংশ লাল। চীনের হোয়াংহো নদীতে লোয়েস মালভূমি হতে প্রচুর হলুদ পানি এসে পড়ে। এ নদীটি যে সাগরে পতিত হয়েছে তার পানিও হলুদ বা পীত হওয়াতে একে পীত সাগর বলে।

সমুদ্রের লবণাক্ততা ঃ সাগর মহাসাগরগুলির বিভিন্ন অংশের লবণাক্ততাও সমান নয়। নিম্নলিখিত কারণে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বিভিন্ন রকম হয়। সমুদ্র হতে যে পরিমাণ পানি বাষ্প হয় তারচেয়ে অধিক পরিমাণ নদীর মিষ্টি পানি বা বৃষ্টির পানি সমুদ্রে পতিত হলে সে সমুদ্রের লবণাক্ততা কম থাকে। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী সমুদ্রে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে ঐ সমুদ্রগুলিতে লবণাক্ততা কম। আবার ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন বেশি হয় বলে সেখানে লবণাক্ততা বেশি। অন্যদিকে মেরু অঞ্চলদ্বয়ে বরফ গলিত নির্মল পানি সরবরাহের কারণে সেখানে লবণাক্ততা কম। সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ গড়ে হাজার প্রতি ৩৫ ভাগ হলেও তা সর্বনিম্ন ২০ ভাগ ও সর্বোচ্চ ৪২ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।

সমুদ্রের পানির উষ্ণতা ঃ নিম্নলিখিত কারণে সমুদ্রের পানির মধ্যে উষ্ণতার (তাপমাত্রার) তারতম্য ঘটে। যেমন- (১) অক্ষাংশের প্রভেদ (২) পানি রাশির অবস্থান (৩) দিবারাত্রির পার্থক্য (স্থায়ীত্বকাল) (৪) ঋতু পরিবর্তন (৫) আন্তঃসাগরীয় শৈলশিরা (৬) সমুদ্রস্রোত (৭) বায়ুপ্রবাহ (৮) সমুদ্রের গভীরতা ও (৯) লবণাক্ততা ইত্যাদি।

পারস্য উপসাগরের সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৯৬^{o} ফাঃ। অন্যদিকে মেরু অঞ্চলে সমুদ্রের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬^{o} ফাঃ। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্রের তলদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১২০০ ফুট গভীরতায় একটি উচ্চ ভূমি আছে। যার জন্য ভারত মহাসাগরের তলদেশের শীতল পানি লোহিত সাগরে প্রবেশ করতে পারে না। এজন্য দুই সাগরের মধ্যে একই গভীরতায় তাপ সমান নয়। এভাবেই স্কটল্যান্ড ও গ্রীনল্যান্ডের ওয়েভীল থমসন শৈলশিরা উত্তর মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে শীতল স্রোত প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। যার ফলে সম গভীরতায় দুই সাগরের তাপমাত্রা ১৫^{o}ফাঃ তারতম্য ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রের পানির ঘনত্ব ও চাপ ঃ নির্মল পানির চেয়ে লবণাক্ত পানি ঘোলাটে এবং অধিক ভারী। সমুদ্রের পানির উষ্ণতা ও লবণাক্ততার উপর পানির ঘনত্ব নির্ভর করে। লবণাক্ত পানির উষ্ণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে উহার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের পানির ঘনত্ব ও চাপের পার্থক্যের জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের আমাজান নদীর নির্মল পানি দক্ষিণ আমেরিকার তটরেখা হতে প্রায় দু'শ মাইল পর্যন্ত দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে ভারী লবণাক্ত পানির উপর ভেসে থাকে।

মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে ঘনত্বের একটি মধ্যবর্তী পার্টিশন সৃষ্টি হয়। এ পার্টিশন উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মিশ্রিত হওয়ার প্রবণতা রোধ করে এবং উভয় পানির ঘনত্বের পার্থক্য থাকার দরুণ মাধ্যাকর্ষণ বল বিভক্ত অবস্থাকে প্রভাবিত করে। নিম্নে কিছু প্রধান পানিপুঞ্জের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো ঃ-

পানিপুঞ্জ	**তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)**	**লবণাক্তা (%)**
১। আন্টার্কটিকার তলদেশের পানি	-০.৪	৩৪.৬৬
২। উত্তর আটলান্টিকের গভীর পানি	৩-৪	৩৪.৯-৩৫.০
৩। উত্তর আটলান্টিকের কেন্দ্রের পানি	৪-১৭	৩৫.১-৩৬.২
৪। ভূমধ্যসাগরীয় পানি	৬-১০	৩৫.৩-৩৬.৪
৫। উত্তর মেরুর পানি	(-১)-(+১০)	৩৪.৯
৬। দক্ষিণ আটলান্টিক কেন্দ্রীয় পানি	৫-১৬	৩৪.৩-৩৫.৬
৭। সাব-আন্টার্কটিকের পানি	৩-৯	৩৩.৮-৩৪.৬
৮। আন্টার্কটিকের প্রদক্ষিণরত পানি	০.৫-২.৫	৩৪.৭-৩৪.৮
৯। আন্টার্কটিকের মাধ্যমিক স্তরের পানি	৩-৫	৩৪.১-৩৪.৬)
১০। ভারত মহাসাগরীয় নিরক্ষীয় পানি	৪-১৬	৩৪.৮-৩৫.২
১১। ভারত মহাসাগরীয় কেন্দ্রীয় পানি	৬-১৫	৩৪.৫-৩৫.৪
১২। লোহিত সাগরের পানি	৯	৩৫.৫
১৩। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব আর্কটিক পানি	২-১০	৩৩.৫-৩৪.৪
১৪। পশ্চিমের উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পানি	৭-১৬	৩৪.১-৩৪.৬
১৫। প্রশান্ত মহাসগরে নিরক্ষীয় পানি	৬-১৬	৩৪.৫-৩৫.২
১৬। পূর্বের দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পানি	৯-১৬	৩৪.৩-৩৫.১

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রের তলদেশে চাপ বৃদ্ধির কারণে যে সব মাছের দেহ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে গঠিত তা অধিক গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে না। সমুদ্রের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর চাপ বাড়ে। পৃথিবীতে অনেক দেশের লোকের চেহারার সাথে যেমন অমিল রয়েছে তেমনি সাগরের মাছের মধ্যেও পার্থক্য বিরাজমান। এক সাগরের অনেক মাছ অন্য সাগরে পাওয়া যায় না।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ (ط) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ (الروم : ٢٢)

"আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।" (সূরা রূম ৩০ ঃ আয়াত ২২)

আমি উনিশটি বছর সৌদি আরবে থাকাকালীন লোহিত সাগরের কোরাল (ভেট্‌কি) মাছ খাওয়ার খুব শখ ছিল। কতদিন যে মাছের আড়তে গিয়েছি তার ইয়াত্তা নেই। না, লোহিত সাগরে কোরাল মাছ পাওয়ার খবর আমি শুনিনি। ইলিশের বেলায়ও একই কথা।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ (ط) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا (ط) اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ـ (فاطر : ٢٨)

"এইভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম (গৃহপালিত পশু) রহিয়াছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ আয়াত ২৮)

আজ যা পরীক্ষিত সত্য তা ১৫০০ বছর পূর্বে কিভাবে কুরআনে এল?

"তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসঙ্গতি পাইত।" (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ৮২)

"অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।" (সূরা হিজর ১৫ ঃ আয়াত ৭৫)

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই।" (১০ ঃ ৬৪)

www.nagorikpathagar.org

সাগরের গভীরতা ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সমুদ্রের অন্ধকার বৃদ্ধি করে

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ (ط) ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (ط) اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا (ط) وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ (النور : ٤٠)

"অথবা তাহাদের (কাফেরদের) কর্ম গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ যাহাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের (তরঙ্গের) উপর ঢেউ (তরঙ্গ)। যাহার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোন জ্যোতি নাই।" (সূরা নূর ২৪ ঃ আয়াত ৪০)

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও অনুরূপ সমুদ্রের অবস্থা সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার বৃদ্ধির কথা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করে আল্লাহ কাফেরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। (ডুবুরিরা সাধারণত সমুদ্রের ২০-৩০ মিটার গভীরতার পর আর দেখতে পায় না। অবশ্য ডুবো জাহাজ (Sub-marine) এর কথা আলাদা।)

সাগর যখন শান্ত এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন ক্রমান্বয়ে সমুদ্রের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্ধকারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অশান্ত সাগর ও অস্বাভাবিক (দুর্যোগপূর্ণ) আবহাওয়ায় অন্ধকার আরো বৃদ্ধি পায়।

সূর্যের ৭টি আলোর মধ্যে সব আলো সমুদ্রের সমান গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

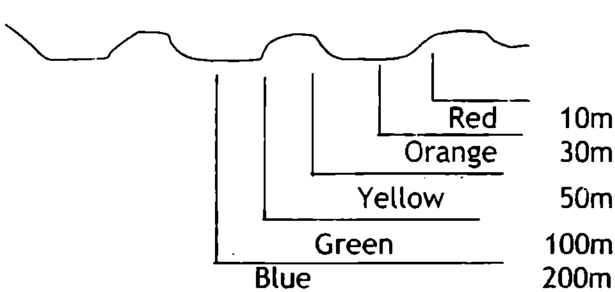

প্রথম ধরনের অন্ধকার ঃ সাধারণতঃ সমুদ্রের ১০ মিটার গভীরতায় লাল ৩০ মিটারে কমলা, ৫০ মিটারে হলুদ, ১০০ মিটারে সবুজ এবং ২০০ মিটারে নীল আলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর মাছ পর্যন্ত নিজের শরীরের

www.nagorikpathagar.org

আলোর সাহায্য ছাড়া দেখতে পায় না। কারণ গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পূর্ণ অন্ধকার। এ অন্ধকারই হলো প্রথম ধরনের অন্ধকার।

২য় ধরনের অন্ধকার ঃ সাগরের উপরিভাগ শান্ত হওয়ার পরিবর্তে বাতাস বা অন্য কারণে যদি ঢেউ এর উপরে ঢেউ হয় তা'হলে সূর্যের আলোর অধিকাংশই প্রতিফলিত হয়ে ঢেউ এর তেরচা বা হেলানো দিক দিয়ে অপসৃত হয়ে যায়, এবং আলোর পরিমাণ দারুণভাবে হ্রাস পায়। এই সময় সাগরের তলদেশের অন্ধকার অনেক বৃদ্ধি পায়। একে বলে দ্বিতীয় ধরনের অন্ধকার।

৩য় ধরনের অন্ধকার ঃ আমরা জানি যে, মেঘ হলো ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের সমষ্টি। (এর মধ্যে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি-কণা এবং তুষার-কণা। এই কণাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বৃষ্টি-ভরা মেঘকে বলা হয় জমাট-মেঘ যার আকার বিশাল মেঘের পর্বতের মত। এর খাড়া-উচ্চতা বেশ দীর্ঘ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর গভীরতার ব্যাপ্তি ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ হাজার ফুটের মধ্যে।) উপর থেকে সূর্যের আলো যখন একে ভেদ করে তখন আলো প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে সূর্য-কিরণের বড় অংশটা মেঘ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঢেউ এর উপর পড়ে কদাচিৎ পানির গভীরতা অতিক্রম করতে পারে। ফলে সাগরের তলদেশ সমগ্র আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে সাগরের তলদেশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বিরাজ করে। এ ধরনের অন্ধকারে কেউ তার নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পায় না;- এমনকি হাত চোখের সামনে তুলে ধরলেও। তা'হলে অন্ধকারের গভীরতা কতটা বিশাল!

কুরআন যখন নাজিল হয় তখন কে জানত এসব কথা? সেযুগে ডুবো জাহাজের ও সূর্যের আলোর সাতটা রং এর কথা কারো পক্ষো জানা কি সম্ভব? অথচ কুরআনের উপরোক্ত বাণী বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সত্যে প্রমাণিত হল অক্ষরে অক্ষরে।

"অনতিবিলম্বে আমি পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব, ফলে তাহাদের কাছে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, ইহা সত্য।" (সূরা ফুসসিলাত ৪১ ঃ আয়াত ৫৩)

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?"

(সূরা মু'মিন ৪০ ঃ আয়াত ৮১)

"ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহাতে ইহা দ্বারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহীম ১৪ ঃ আয়াত ৫২)

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই।" (১০ ঃ ৬৪)

www.nagorikpathagar.org

প্রাণিদেহে দুধ তৈরি

শরীরের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও শরীরে বিভিন্ন উপাদান তৈরির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। প্রাণীরা অধিকাংশ খাদ্য খায় বৃহৎ ও জটিল অণু হিসেবে। এসব বৃহত্তর জটিল অণু পরিপাক (Digestion) এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রতম অণুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive system) থেকে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে না এবং দেহকোষও তা গ্রহণ করতে পারে না। তাই খাদ্যদ্রব্য দেহকোষে প্রবেশের পূর্বে পরিপাকতন্ত্রে (Digestive system) এসিড (Acid) ও নানারকম এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক (Digestion) হয়। পরিপাকের পর কিছু খাদ্যের সারবস্তু সরাসরি রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে আর বাকি অংশ লিভারে চলে যায় এবং সেখানে তা আবার পরিবর্তন হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

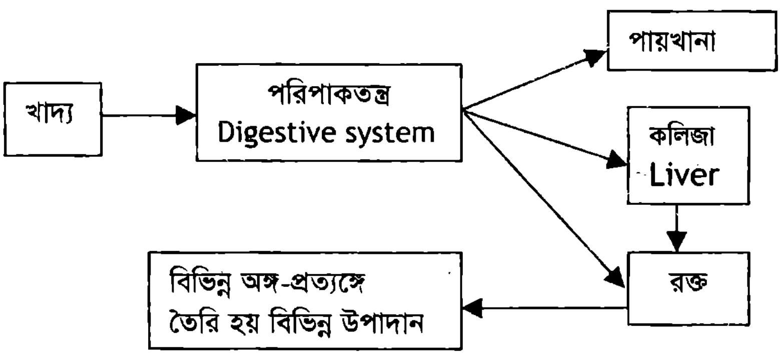

এসব খাদ্যের সারবস্তু থেকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তৈরি হয় রক্ত ও বিভিন্ন উপাদান। স্তনে এমনিভাবে রক্তের মাধ্যমে আসা খাদ্যের সারবস্তু থেকে তৈরি হয় দুধ। খাদ্যের সারবস্তু পরিপাকতন্ত্র থেকে শরীরে প্রবেশের পর যা বাকি থাকে তা পায়খানা হিসেবে বের হয়ে যায়। মহান স্রষ্টা পবিত্র কুরআনে ১৫০০ বছর পূর্বে ঘোষণা দিলেন-

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً (ط) نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۔ (النحل : ٦٦)

"অবশ্যই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। উহাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

(সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ৬৬)

www.nagorikpathagar.org

এসব বিষয় মুহাম্মদ (সা) এর আমলে কোন মানুষের পক্ষে জানার কোন প্রশ্নই উঠে না। একান্ত আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এসব সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। বস্তুত হজমের পর খাদ্যের সারবস্তু পায়খানা বা গোবর থেকে পৃথক হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, আর এ রক্তই খাদ্যের সারবস্তুকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তা থেকেই স্তনে তৈরি হয় দুধ। একথা কুরআন নাজিলের যুগে কিছুতেই মানুষের রচনা হতে পারে না। "এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাদের আহবান করে তাহা মিথ্যা" (৩১ ঃ ৩০)। সত্য শুধু সত্যই কুরআনের দম্ভ। কারণ "আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহা সাফল্য" (১০ ঃ ৬৪)। "ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে" (১৪ ঃ ৫২)। "নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য" (১৫ ঃ ৭৫)। "উহারা আল্লাহ্র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে (৬১ ঃ ৮)। "তিনি তোমাদের বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন; অতঃপর আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

হারাম খাদ্যের অপকারিতা

খাদ্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। খাদ্য শরীরের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও কাজ করার শক্তি যোগায়। তাই বলে মহান স্রষ্টা সকল খাদ্যকে হালাল বা খাওয়ার অনুমতি দেননি। শাকসবজি, ফলমূল, মাছ ইত্যাদি হালাল। খেতে নিষেধ করেননি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রাণীদের গোশত, প্রবাহিত রক্ত, মাদকদ্রব্য এবং যা যবেহ্ কালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ্ করা হয় তা খেতে নিষেধ (হারাম) করেছেন। মহান স্রষ্টার নির্দেশ-

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ (ط) اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ (البقرة : ١٦٨)

"হে মানুষ পৃথিবীতে যাহা হালাল ও পবিত্র তাহা গ্রহণ করিও, কিন্তু শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলিও না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৬৮)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ (النحل : ١١٤)

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ তোমাদিগকে হালাল ও পবিত্র যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর।" (সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ১১৪)

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ (ط) قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ـ (المائدة : ٤)

"লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে? বল, "সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।"

(সূরা মায়িদা ৫ ঃ আয়াত ৪)

তাই খাদ্য হালাল হলেই খাওয়া যাবে না তা পবিত্র (খাঁটি)ও হতে হবে। পবিত্র খাদ্য বলতে হয়তো আল্লাহ স্বাস্থ্যসম্মত এবং বিশুদ্ধ খাদ্যকেই বুঝিয়েছেন। পচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র বা খাঁটি নয়। পচা খাদ্য অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার অনেক খাদ্য হালাল কিন্তু চুরি করে আনা খাদ্য হালাল নয়।

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ـ (البقرة :١٧٢)

"হে মুমিনগণ! তোমাদিগকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৭২)

মহান স্রষ্টা নিম্নেবর্ণিত খাদ্যসমূহ খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ (ط) ذٰلِكُمْ فِسْقٌ (ط) (المائدة : ٣)

"তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ্‌কৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাহা তোমরা যবেহ্ করিতে পারিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলী দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এই সব পাপকার্য।"

(সূরা মায়িদা ৫ ঃ আয়াত ৩)

www.nagorikpathagar.org

মহান স্রষ্টা ভাল করেই জানেন কোন্ কোন্ খাদ্য মানুষের অপকার করতে পারে। তাই তার একটা তালিকা মানুষের কল্যাণার্থে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কুরআন নাযিলের সময় মানুষ খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। সে যুগের ঈমানদারগণ এমনকি আজও সারা মুসলিম সমাজ বিনা প্রশ্নে হারাম খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত আছেন। বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে খাদ্যের উপকার ও অপকার সম্পর্কে সঠিক ও নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি নিষিদ্ধ খাদ্যই যে মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা নিশ্চিতভাবে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে অতি সংক্ষেপে নিষিদ্ধ খাদ্যগুলোর ক্ষতির দিকটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ্। আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন নিষিদ্ধ খাদ্যগুলি আমাদের কত ক্ষতি করতে পারে। মহান স্রষ্টা কিছু খাদ্য নিষিদ্ধ করে আমাদের কত যে উপকার করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মৃতপশুর গোশত ঃ স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী কোন মৃত প্রাণীর গোশত খাদ্য হিসেবে অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ, কোন প্রাণীর মৃত্যুর কারণ জানা খুবই দুরূহ ব্যাপার। হতে পারে কঠিন কোন সংক্রামক রোগে যেমন- এনথ্রাক্স, যক্ষ্মা অথবা কোন বিষাক্ত জিনিসের যেমন- বিষ ও টক্সিন এর প্রভাবে মৃত্যু ঘটেছে। উক্ত গোশত গ্রহণকারীও সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রবাহিত রক্ত ঃ প্রবাহিত রক্ত (Circulating blood) যা পশুকে যবেহ্ করার পর শরীর থেকে বেরিয়ে আসে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রবহমান রক্তে নানারকম বিষাক্ত জিনিস (Toxic Substances) ও রোগজীবাণু থাকতে পারে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আবার এসব দূষিত পদার্থ বের হয়ে গেলে গোশ্ত অধিক সময় ভাল থাকে। প্রকাশ থাকে যে, মহান স্রষ্টা কুরআন নাযিলের বহু পূর্বেই ইয়াহুদীদেরকেও যবেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শূকরের গোশ্ত ঃ শূকরের চর্বি, কলিজা, গোশত সবই হারাম। শূকরের গোশতের মাধ্যমে অনেক রোগ ছড়ায় যা অন্য কোন গোশতের মাধ্যমে ছড়ায় না। শূকরের গোশতের মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক. ট্রিচিনিয়াসিস (Trichiniasis) নামক এক প্রকার কৃমি রোগ শূকরের গোশ্তের সাহায্যে ছড়ায়। যা অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হতে পারে। ট্রিচিনেলা স্পাইরালিস (Trichinella Spiralis) কৃমির কীট (Larva) শূকরের গোশ্তে অবস্থান করে। উক্ত গোশত থেকে মানুষেরও এ রোগ হতে পারে। এ কীটগুলো পাকস্থলিতে এক সপ্তাহ থাকার পর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের তেমন কোন ঔষধ নেই। আমেরিকাতে প্রায় দুই কোটি লোক এ রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসায় এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা এ রোগ নিরাময় করতে পারছে না।

www.nagorikpathagar.org

খ. শূকরের গোশতের মাধ্যমে টেনিয়াসোলিয়াম (Taeniasolium) নামক এক প্রকার কৃমি বিস্তার লাভ করে। শূকরের গোশ্ত খায়নি এমন লোকের এ রোগ হয়েছে বলে জানা যায়নি। কয়েক ফুট লম্বা এ ফিতাকৃমি শূকরের গোশ্ত খাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। যে তাপমাত্রায় রান্না করা হয় তাতে এ ধরনের কৃমির ডিমের মৃত্যু ঘটে না।

আল্লাহর নাম ছাড়া হত্যা করা প্রাণীর গোশ্ত হারাম ঃ এর মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি নিহিত রয়েছে। যদি বিনা প্রয়োজনে বা কেবল হত্যা করার বিকৃত আনন্দ লাভের জন্য হত্যার অভ্যাস করা হয় তবে মন থেকে স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর ইত্যাদি কোমল মানবীয় গুণাবলি উঠে যাবে। প্রাণীর গোশ্ত আমাদের জন্য হালাল; কিন্তু তাই বলে অনর্থক কষ্ট দিয়ে এবং হত্যার বিকৃত আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে হত্যা করা চলবে না। যবেহ্ করার সময় **"বিস্‌মিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার"**। বলার উদ্দেশ্য "হে প্রাণী! আমি আল্লাহর হুকুমেই তোমাকে যবেহ্ করছি, কারণ মানুষের প্রয়োজনেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর একথাও আমাদের মনে আছে যে, আল্লাহই সবার উর্ধ্বে সর্বশক্তিশালী ও সুমহান।" যবেহ্ মানুষকে এ শিক্ষাই দেয় যে কোন প্রাণীকেই অনর্থক প্রাণনাশ করা হারাম। কাজেই মুসলমানদের যবেহ্ করা ঠিক হত্যা নয়, বরং আল্লাহর নামে উৎসর্গ বা কুরবানী। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে ব্ল উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হারাম। এতে আল্লাহর সঙ্গে 'শিরক' করা হয়। যারা নিরামিষাসি বা পশুর গোশত খাওয়ার বিরোধী তারা হয়তো দাবি করতে পারেন, মুসলমানেরা হৃদয়হীন, কঠোর ও মায়া-মমতাহীন। তারা জীবহত্যা করে গোশ্ত খায়। আমাদের প্রশ্ন- যারা তৃণলতা খান তারা কি জীবহত্যা করেন না? তৃণলতারও প্রাণ আছে, ওরাও কথা বলে তা সত্যে প্রমাণিত। কিন্তু তাদের ভাষা বা শব্দ আমরা জানিনা বা বুঝিনা। যাক্ ধরে নিলাম তাদের আর্তনাদ বা চিৎকার করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ তাদের দুটো অনুভূতির অঙ্গ নেই। যে বোবা ও কথা বলতে পারে না, এমন কাউকে যদি কেউ খুন করে তবে কি আপনি বলবেন তার দুটো অনুভূতির অঙ্গ নেই কাজেই তাকে খুন করলে শাস্তি দেয়া যাবে না, না কি বলবেন একটা অসহায় নির্বাক বোবা লোককে খুন করেছে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হউক। আসলে সব কিছুই আল্লাহ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ চান যে কোন হালাল বস্তু ভক্ষণ করে মানুষ শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক।

যবেহ্র বদলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর গোশ্ত হারাম ঃ শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর শরীরে অধিক দূষিত রক্ত ও কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হয়। এরূপ দূষিত রক্ত শরীরে আটকে থাকলে তা গোশতের সাথে মিশ্রিত হয়। একবার একটি প্রাণী মারা গেলে আর রক্তক্ষরণ করা সম্ভব হয় না,

www.nagorikpathagar.org

কারণ মৃত প্রাণীর হৃদপিণ্ড (Heart) আর পাম্প করতে পারে না। আগেই বলেছি প্রবহমান রক্ত বিষাক্ত জিনিস ও রোগজীবাণু শরীর থেকে বের করে দেয়।

কঠিন আঘাতে মৃত প্রাণীর গোশত হারাম ঃ কঠিন আঘাতের ফলে গোশতে ল্যাকটিক এসিড (Lactic Acid) জমা হয়। প্রাণীকে বলী দেয়ার সময় ঘাড়ের পেছনের দিক থেকে মারাত্মক আঘাত দিয়ে মেরুদণ্ডের হাড় দ্বিখণ্ডিত করা হয়। এভাবে মেরুদণ্ডের ভিতরের সাদা স্পাইনাল কর্ড (Spinal cord) কে হঠাৎ কাটার ফলে শরীরের যাবতীয় গোশত সংকুচিত (Contracted) হয়ে যায় এবং তাতে অনেক প্রয়োজনীয় রস গোশ্‌ত থেকে বের হয়ে যায়। ইসলামী যবাইতে খুব অল্প সময়ে প্রচুর রক্তপাতের ফলে প্রাণী সংজ্ঞা হারায় তাই কোন ব্যথা পায় না। যবাইয়ের পর যে সংকোচন হয় তা মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ তথা অক্সিজেন কমে যায় বলে। কিন্তু ব্যথার জন্য নয়।

ইলেকট্রিকের সাহায্যে মৃত পশুর গোশ্‌ত হারাম ঃ ইলেকট্রিক সকে হতচেতন গোশত দ্রুত পচন ধরে। এর কারণ- রক্ত নির্গত হওয়ার পূর্বেই ইলেকট্রিক সকে শরীরে ল্যাকটিক এসিড বেড়ে যায়। ল্যাকটিক এসিডের কারণে গোশতের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে যায়। আর ইলেকট্রিক সকে মৃতের শরীরের রক্ত শরীরেই থেকে যায়। রক্ত শরীর থেকে নির্গত না হওয়াতে শরীরের বিষাক্ত জিনিস ও রোগজীবাণু শরীরেই থেকে যায়। কয়েক বছর আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে ফেডারেল গোশত পরিদর্শন শাখা ইলেকট্রিক সকের সাহায্যে পশু হতচেতন পদ্ধতি চালু করার অনুমতি দেয়নি। শূকরের উপর ইলেকট্রিক সক চার্জ করে টিস্যুর (Tissue) মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেছে। ১৯৫৫ সালে "ড্যানিস মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস" এক সার্কুলারে ঘোষণা দেন যে, "ইলেকট্রিক সকে" হতচেতন পশুর গোশত পচন ধরে ও স্বাদ (Taste) এর পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৮ সনে ব্রিটিশ আইন সংশোধন করে প্রাণীকে ইলেকট্রিক সকে হতচেতন করার পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারণ এর ফলে গোশতে দারুণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

কোন মাংসাশী পশুর কামড়ে মৃত পশুর গোশত হারাম ঃ এ নিষেধ নিম্নে বর্ণিত কারণে যুক্তিসংগত-

ক. আক্রমণকারী পশুর কামড়ে বিষ থাকতে পারে।

খ বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার কারণে মৃতের শরীরে প্রচুর ল্যাকটিক এসিড জমতে পারে।

গ. দেহে প্রচুর রক্ত থেকে যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

মাদকদ্রব্যের অপকারিতা

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (ط) قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۔ ((البقرة : ٢١٩)

"লোকে তোমাকে মাদকদ্রব্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, "উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২১৯)

মহান স্রষ্টা সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হারাম করেছেন। তিনি যা কিছু হারাম করেছেন তা সবই মানুষের জন্য অকল্যাণকর। কিন্তু মাদকদ্রব্য শরীরে সামান্যতম উপকার করে তাও মহান স্রষ্টা জানিয়ে দিয়েছেন। তবে মাদকদ্রব্যের যে উপকারিতা তা খাদ্য হিসেবে নয়। খাদ্য হিসেবে এর উপকারিতা যৎসামান্য। এর উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি। মাদকতা বা নেশা মানুষের লজ্জাবোধ দূর করে দেয়। অথচ লজ্জার কারণেই মানুষ অন্যায় থেকে দূরে থাকে ও ভুল-ত্রুটি ঢেকে রাখে। তাই মাদকসেবীরা সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে না ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আত্মহত্যা, মানসিক বিপর্যয়, যৌনাচার, যৌনব্যাধি, বিবাহ বিচ্ছেদ এসবের বেশির ভাগই মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে ঘটে থাকে। এককথায় সমাজের বেশিরভাগ অপরাধ দুর্ঘটনা ও খুনখারাবি মাদকসেবীরাই করে থাকে। ড্রাগ এমন একটি অভ্যাস তৈরি করে (Addiction) যার কারণে নেশার মাত্রা ক্রমশ বেড়েই যায়। মাদকদ্রব্য ও জুয়া প্রায়ই একত্রে চলে বলে মহান স্রষ্টা এ দুটোর কথা একত্রে উল্লেখ করেছেন।

মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঃ মাদকদ্রব্য সাময়িকভাবে মস্তিষ্ক সতেজ করে উত্তেজনা, উন্মাদনা প্রথম সৃষ্টি করলেও সেটা আসলে প্রতারণামূলক, এর পরিণাম খুবই ক্ষতিকর। মাদকতা বা নেশা অনুভূতির সমতার গরমিল ঘটায়। এটা পান করলে মনোযোগ, মনোনিবেশ, স্মরণশক্তি, যুক্তিশক্তি সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। আত্মসংযম ও আত্মসমালোচনার শক্তিও লোপ পায়। মানুষ নিজের প্রতি কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে। ঠিকমতো গাড়ি চালাতে পারে না, বেসামাল হয়ে স্পীড কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে। দৃষ্টিশক্তির অবনতির ফলে মাদকসেবীদের দ্বারা সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। এটা ক্ষুধামন্দা ভাব তৈরি করে ও হজমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং পেটে আলসার তৈরি করে।

লিভারে মাদকদ্রব্যের প্রতিক্রিয়া ঃ মদ লিভারে স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত করে এবং লিভারকে বড় করে ফেলে। এমনকি লিভার সিরোসিস নামক কঠিন

www.nagorikpathagar.org

রোগ পর্যন্ত হয়ে যায়। মদ লিভারে চর্বি জমাট বেঁধে 'ফ্যাটি লিভার' (Fatty Liver) এ পরিণত করে। যা মানুষের অকালমৃত্যু ঘটায়।

উপরে অতি সংক্ষেপে নিষিদ্ধ খাদ্যসমূহের ক্ষতির কারণগুলি আপনাদের সামনে পেশ করা হল। চিন্তা করে দেখুন কুরআন নাযিলের যুগে কে জানত এসব ক্ষতির কথা? এসবই প্রমাণ যে, কুরআন কোন মানুষের বাণী নয়। এ হচ্ছে মহান স্রষ্টারই বাণী যিনি সর্বদ্রষ্টা ও মহা বিজ্ঞানী। আলহামদুলিল্লাহ মহান স্রষ্টা ক্ষতিকর খাদ্যগুলি নিষিদ্ধ করে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন বিভিন্ন রোগ থেকে।

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

ক্লোনিং (Cloning) কি সম্ভব?

ক্লোনিং পদ্ধতিতে পিতার বিনা অংশগ্রহণে অর্থাৎ শুক্র (sperm) ছাড়া প্রাণী জন্মগ্রহণ করতে পারে। সাধারণত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি ঘটে যৌনমিলনের প্রক্রিয়ায়। কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের মিলন ছাড়া সন্তান জন্মাতে পারে কি? এত দিন এছিল বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বাবা-মা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন হযরত আদম (আ) কে। মা হাওয়া (আ) কে সৃষ্টি করেছেন আদম (আ) এর শরীর থেকে। মা হাওয়া (আ)-কে কোন মায়ের জরায়ু জীবন অতিবাহিত করতে হয়নি। আবার হযরত ঈসা (আ) কে মহান স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত বিবি মরিয়মের গর্ভ থেকে। ঈসা (আ) মায়ের জরায়ুর জীবনযাপন করে স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় কখনো বিশ্বাস করতো না যে, পিতা-মাতার মিলন ছাড়া ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তারা ঈসা (আ) কে স্রষ্টার সন্তান বলে দাবি করেন। শুধু তাই নয় তারা ঈসা (আ) এর জন্ম সম্পর্কে কুরআনের বাণীকে তামাশা হিসেবে আখ্যায়িত করে। নাউযুবিল্লাহ্। আল্লাহ ঘোষণা দেন-

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَ
لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ (حم السجدة : ٥٣)

"আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করিব, বিশ্ব জগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?" (সূরা হা-মী-ম আস্-সাজ্দা ৪১ ঃ আয়াত ৫৩)

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে ক্লোনিং পদ্ধতি কুরআনের বাণীকেই সত্যে প্রমাণিত করেছে। ১৯৯৭ সালে মেষশাবকের জন্ম সারা বিশ্বে চমক সৃষ্টি করে। স্কটল্যান্ডের রোজলিন ইন্সটিটিউটের ভ্রূণ বিজ্ঞানী ড. ইয়ান উইলমুট ও তার সহকর্মীরা প্রথমে গর্ভবতী একটি ভেড়ার স্তনের কিছু কোষ (cell) সংগ্রহ করে কোষগুলোকে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থে রেখে দেন এবং ক্রমশ কোষগুলির পুষ্টির উপাদান সরিয়ে নিতে থাকেন। এর ফলে এর স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিজ্ঞানীরা অন্য একটি ভেড়ার ডিম্বাশয় থেকে একটি অনিষিক্ত ডিম্ব (Unfertilised Ovum) সংগ্রহ করেন। সে অনিষিক্ত ডিম্ব থেকে জটিল বৈজ্ঞানিক উপায়ে DNA সমেত নিউক্লিয়াস অপসারণ করে গর্ভবর্তী ভেড়ার স্তন থেকে সংগৃহীত কোষে স্থাপন করেন এবং বৈদ্যুতিক স্পার্কের মাধ্যমে DNAটি নিষিক্ত করেন, ফলে একটি নতুন ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।

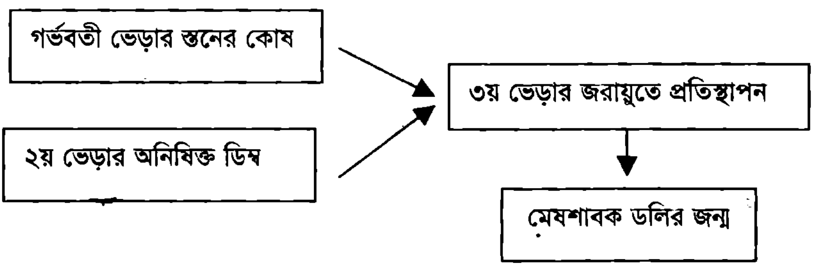

এর ঠিক ছয়দিন পর ভ্রূণটি তৃতীয় আরেকটি ভেড়ার জরায়ুতে স্থাপন করেন। আর এই ভ্রুণ থেকে জন্ম নেয় একটি মেষশাবক। যার নাম ডলি। এভাবে আরো ছয়টি ভেড়ার জন্ম নেয়, যাদের চেহারা রং এবং শারীরিক গঠন হুবহু এক ও অভিন্ন। পিতা ছাড়া এভাবে জন্ম নিলো মেষশাবক (অর্থাৎ ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় শুক্রকীটের অংশগ্রহণ ছাড়া)। ইতিমধ্যে নাকি এ প্রক্রিয়ায় গরুর বাছুর এবং মানব-সন্তানও জন্ম নিয়েছে। ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানব শিশুর জন্মকে কেউ যেন মনে না করে যে, বিজ্ঞানীরা উহা সৃষ্টি করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। আমি আগেই বলেছি স্রষ্টা তাকেই বলে যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ণ করতে অর্থাৎ পূর্বে আদৌ ছিল না এমন নূতন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখানে বিজ্ঞানীরা ভেড়ার স্তন থেকে কোষ নিয়ে অন্য ভেড়ার ডিম্বের সাথে মিলন ঘটিয়ে তৃতীয় ভেড়ার জরায়ুর ভিতরে মেষশাবকের জন্ম দিয়েছেন কিন্তু তারা কোন কোষ (cell) বা ডিম্ব কিছুই তৈরি করেননি। তাছাড়া ভ্রূণকেও জরায়ুর বাইরে অন্য কোন পাত্রে রেখে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মেষশাবকও বের করতে পারেন নি। কাজেই তাদেরকে কিছুতেই স্রষ্টা বলা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

এতদিন ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ) এর জন্ম সম্পর্কে কুরআনের বাণীকে উপহাস করে আসছে। এখন যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় ক্লোনিং কি করে সম্ভব হল? বর্তমানে ক্লোনিং সারা বিশ্বে চমক লাগিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কারের বলে। অথচ ১৫০০ বছর পূর্বে কুরআন এমন উদ্ধৃতি দিয়েছে কুরআন নাযিলের বহু পূর্বের পুরানো ঘটনা বলে। মহান স্রষ্টা বিনা বাপে হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি বরং আরও জানিয়ে দিলেন এটা মানুষের জন্য এক নিদর্শন স্বরূপ।

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۔ قَالَ كَذَٰلِكِ (ج) قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ (ج) وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا (ج) وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۔ (مريم : ٢٠-٢١)

"মরিয়ম বলিল, 'কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি?' সে (ফেরেশতা) বলিল, 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; ইহাতো এক স্থিরকৃত ব্যাপার।"

(সূরা মার্ইয়াম ১৯ ঃ আয়াত ২০-২১)

اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (ط) إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۔

(آل عمران : ٤٧)

"আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' তখনই উহা হইয়া যায়।" (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ আয়াত ৪৭)

মানুষ সৃষ্টির জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহর ক্লোনিং প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। "কুন" বলাই যথেষ্ট। এমনিভাবে আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মরিয়াম (আ) এর গর্ভে পিতার অংশগ্রহণ ছাড়া জন্ম নেন হযরত ঈসা (আ)। এতদিন যা ছিল মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমানের দাবি বর্তমানে তা সত্য বলে কেউ মেনে নিতে এতটুকুও দ্বিধা করছে না। এতে কি প্রমাণ হয় না- নতুন আবিষ্কার বলতে কিছু নেই? কুরআনের কাছে সবই পুরনো ঘটনা। "এগুলিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সত্য।" (৩১ ঃ ৩০) "আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।" (২৭ ঃ ৭৫) "আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করিব, বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।" (৪১ ঃ ৫৩)

www.nagorikpathagar.org

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন; অতঃপর আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১) "ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য। যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (১৪ ঃ ৫২) "হে কিতাবীগণ! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মরিয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ তো আল্লাহর রাসূল এবং তাঁহার বাণী, যাহা তিনি মরিয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও রাসূলে ঈমান আন এবং বলিও না, 'তিন!' নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ্‌তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁহার সন্তান হইবে- তিনি ইহা হইতে পবিত্র।" (৪ ঃ ১৭১) "যাহারা বলে আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো কুফরীই করিয়াছে- যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।" (৫ ঃ ৭৩) "তোমাদের কি হইল, তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বকে স্বীকার করিতেছ না?" (৭১ ঃ ১৩) "মানুষের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাহাদের না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ।" (৩১ ঃ ২০) "হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার -মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল?" (৮২ ঃ ৬) "এসব হইতেছে উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক।" (৭৬ ঃ ২৯)

স্রষ্টার বিধানের লংঘনই এইডস্ (AIDS) এর কারণ

এইডস্ এক মারাত্মক ব্যাধি। এ রোগের প্রতিকার এখনো অজানা। ধুকে ধুকে মৃত্যুই এর পরিণতি। এ হচ্ছে এক কঠিন আজাব। এ রোগ সমকামী পুরুষদেরই বেশি হয়। AIDS- শব্দটির পুরো নাম হচ্ছে- Acquired Immune Deficiency Syndrome। HIV (Human Immunodeficiency Virus) ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। এ ভাইরাস দীর্ঘদিন শরীরে সুপ্ত থাকে। রোগী নিজের অজান্তেই বছরের পর বছর HIV ভাইরাস বহন করে। ১৯৭০ সালে আফ্রিকার ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এ রোগে বহু লোক মারা যায়। তখনো মানুষ এ রোগ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। সে সময় অজ্ঞাত এক ভয়াবহ রোগের কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে আমেরিকার চিকিৎসক 'Mc Gottlieb' এর কাছে কিছু রোগী আসে এবং খুব দ্রুত এ রোগীগুলি মারা যায়। তখন থেকে এ রোগ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৯৮১ সালে উক্ত চিকিৎসক সমকামী কিছু রোগীর দেহে কিছু জটিল লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, HIV নামক এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। মানুষের শরীরে এক প্রকার টি-হেলপার কোষ (T-Helper cell) আছে। যা শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নিয়োজিত। প্রথমে এ ভাইরাসটি উক্ত প্রতিরোধক কোষের মধ্যে ঢুকে কোষকে ধ্বংস করে। এভাবে প্রতিদিন প্রতিরোধ ব্যবস্থার T-Helper cell এক এক করে ধ্বংস হতে থাকে। তাছাড়া সমকামী লোকের শুক্র (Semen) গ্রহীতার শরীরেও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। যার ফলে গ্রহীতার শরীরের T-lymphocytes কোষ আক্রান্ত হয়ে রোগ দমন ক্ষমতা (Immuno suppression)ও হারিয়ে ফেলে। যার ফলে রোগীর দেহে কোন প্রকার প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। তখন রোগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে এইডস্ রোগ বিস্তার লাভ করে।

১. সমকামী পুরুষ (Homosexual man) ঃ এইডস্ রোগীদের মধ্যে ৯০-৯৫%ই হচ্ছে পুরুষ। পশ্চাৎপথে মিলনের ফলেই প্রধানত এ রোগ হয়ে থাকে। প্রায় ৯০% সমকামী পুরুষের বয়সসীমা ২০-৪০ বছরের মধ্যে। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে সমকামী পুরুষের সংখ্যা ১২ মিলিয়নেরও অধিক।

২. বহু যৌন সঙ্গী (Hetaro-sexual partners) ঃ পশ্চিমা দেশগুলোতে যৌনমিলনে বাধা নেই। তাদের একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে। এদের মধ্যে সমকামী, বহুগামী ও বিকৃত যৌনাচারীর সংমিশ্রণ রয়েছে। গবেষকগণ স্পষ্ট করে বলেছেন এরূপ অসম, অবাধ যৌন কর্মকাণ্ডই এইডস্ রোগের উৎস।

৩. ইনজেকশনের সূচের মাধ্যমে ঃ যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক-দ্রব্য গ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রায় ৭৫% ই এ রোগে আক্রান্ত হয়।

৪. শিশুদের এইডস্ রোগ ঃ গর্ভাবস্থায় ফুলের মাধ্যমে এবং জন্মের পর মায়ের দুধ সেবনের ফলে সন্তানের দেহে এ রোগ ছড়ায়। শতকরা ৭২ ভাগ শিশুই এ রোগে আক্রান্ত বাপ-মায়ের একজন কিংবা বাপ-মা উভয় থেকেই সংক্রামিত হয়। সুতরাং পিতা-মাতার দেহে HIV ভাইরাস থাকলে তা নিষ্পাপ শিশুর দেহেও স্থানান্তরিত হতে পারে।

লুত (আ) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিকৃত যৌনাচারী ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নির্দিষ্ট যৌনপথে মিলিত না হয়ে পেছনের পথ পছন্দ করতো। এ কুকর্ম লুত (আ) এর সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এটা তাদের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করে। ইহুদী বাইবেল মতে লুত (আ) এর এলাকার নাম ছিল সোডম ও গোমররাহ (Sodom and Gomorrah)। এ জন্য পশ্চাৎপথে যৌন মিলনের নাম দেয়া হয়েছে সোডমি (Sodomy)।

www.nagorikpathagar.org

লুত (আ) এর সম্প্রদায়কে মহান স্রষ্টা এ জঘন্যতম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ (ط) بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ - (الاعراف : ٨٠-٨١)

আর আমি লুতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, "তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই, তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর। তোমরা তো সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ৮০-৮১)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ - أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ - (النمل : ٥٤-٥٥)

স্মরণ কর লুতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, "তোমরা জানিয়া শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ, তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।"

(সূরা নামল্ ২৭ ঃ আয়াত ৫৪-৫৫)

লুত (আ) এর সম্প্রদায় তাঁহার উক্ত সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করে নাই বরং উপহাস করল। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ - فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ - إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ - وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيْمٍ - (الحجر : ٧٣-٧٦)

"অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল; আর আমি জনপদকে উল্টাইয়া উপর নিচ করিয়া দিলাম এবং উহাদের উপর প্রস্তর, কংকর বর্ষণ করিলাম। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। উহা তো লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনো বিদ্যমান।"

(সূরা হিজর ১৫ ঃ আয়াত ৭৩-৭৬)

কুরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লুত (আ) এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ সমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পাশে জর্ডান এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে। এ মরুভূমিতে একটি নদীও আছে। এ নদীর পানিতে কোন প্রাণীই জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে 'মৃত সাগর' (Dead Sea) বা 'লুত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে এ নদীতে পানির অংশ খুবই কম এবং তেল ও লবণ জাতীয় উপাদানই অধিক। তাই কোন সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। তাই এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআন পাকের দাবি হচ্ছে, "উহা তো লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনো বিদ্যমান। অবশ্যই ইহাতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (সূরা ঃ হিজর ১৫ ঃ আয়াত ৭৬-৭৭)। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়। সমকামীতার শাস্তি ও তার নিদর্শন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলোতে আজও সমকামীতা বন্ধ হয়নি বরং তা বৃদ্ধি পেয়েই চলছে এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করছে। সমকামীতায় নারী-পুরুষ সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার জন্য এইডস্ এর মতো কঠিন দুরারোগ্য চিকিৎসার অনুপোযোগী রোগে সারা বিশ্ব জর্জরিত হয়ে পড়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম বিশ্বে এ রোগ খুবই কম। যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে না শুধুমাত্র তাদেরই এ রোগ হচ্ছে। "আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য" (১০ ঃ ৬৪)। একি প্রমাণ করে না আল্লাহর বিধানের লংঘনই এ রোগের কারণ?

কম্পিউটারের বিশ্লেষণে কুরআন

বর্তমান যুগ কম্পিউটারের। কম্পিউটারের মাধ্যমে অসংখ্য অগণিত বার্তা (Information) এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে জানা যায়। ভাবতে অবাক লাগে একটা বিরাট ব্যাংক কেন যেকোন ডিপার্টমেন্টের যাবতীয় বার্তা রেকর্ড করা থাকে একটা ছোট্ট কম্পিউটারের ডিস্কের মধ্যে। আর মুহূর্তের মধ্যেই আপনি পেতে পারেন যেকোন সংবাদ (Information) মাত্র একটা সুইচ টিপার মাধ্যমে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হাশরের দিনে দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষের কর্মকাণ্ড (আমলনামা) একই সময়ে উপস্থাপন করবেন। কম্পিউটার আবিষ্কারের পূর্বে ঈমানদারদের নিকট এ বাণী ছিল বিশ্বাস আর বর্তমানে তা শুধু বিশ্বাসই নয় বাস্তব প্রমাণও বটে।

ড. তারিক আল-সুওয়াইদান (Dr. Tarik Al-Suwaidan) তার গবেষণালব্ধের বিস্ময়কর ও নজিরবিহীন প্রাপ্তিকে ইন্টারনেট (Internet) এর

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ওয়েবসাইট (Website) গুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার গবেষণায় উদ্ঘাটিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

আরবি শব্দ (Arabic Word)	অর্থ (Meaning)	শব্দটি যতবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা। Number of times present in the Holly Quran.
AD-DUNYA	ইহ্জগত/ পৃথিবী- This World	১১৫ (115) বার
AL-AKHIRA	পরজগত / আখিরাত- hereafter	১১৫ (115) বার
AL-MALAIKA	ফেরেশ্তাগণ- Angles	৮৮ (88) বার
AN-SHAYATEEN	শয়তান-Satans	৮৮ (88) বার
AL-HAYAT	জীবন- Life	১৪৫ (145) বার
AL-MAOUT	মৃত্যু- Death	১৪৫ (145) বার
AN-NAFA	উপকারী- The Useful	৫০ (50) বার
AL-FASAD	ক্ষতিকর- The Harmful	৫০ (50) বার
AN-NASS	জনগণ/ মানুষ- The Peoples	৩৬৮ (368) বার
AR-RASUL	রাসুল- The Messengers	৩৬৮ (368) বার
AL-IBLEES	ইবলিশ- Iblees	১১ (11) বার
AL-ESTA'AJAT	পরিত্রাণ- Seeking Refuse in Allah From Iblees	১১ (11) বার
AL-MUSIBAH	পরীক্ষা- Test	৭৫ (75) বার
AL-SHUKRAN	আল্লাহ্কে ধন্যবাদ- Thanking to Allah	৭৫ (75) বার
AL-INFAQ	দান- Spending	৭৩ (73) বার
AR-RADA	সন্তুষ্টি- Pleased	৭৩ (73) বার

www.nagorikpathagar.org

অর্থ (Meaning)	শব্দটি যতবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা। Number of times present in the Holly Quran.
ধ্বংস-Those Astry	১৭ (17) বার
মৃত- Those Dead	১৭ (17) বার
মুসলিম-The Moslem	৪১ (41) বার
জিহাদ- The Struggle	৪১ (41) বার
স্বর্ণ- Gold	৮ (8) বার
অতিরিক্ত-Over spending	৮(8) বার
যাদু- Magic/Witehcraft	৬০ (60) বার
ধ্বংসের পথ- Some thing Thalleeds Astray	৬০ (60) বার
যাকাত- Alms	৩২ (32) বার
বরকত-Blessing	৩২ (32) বার
জ্ঞান - Brain	৪৯ (49) বার
আলো -Light	৪৯ (49) বার
জিহ্বা- Tongue	২৫ (25) বার
উপদেশ- Advice	২৫ (25) বার
ইচ্ছা- Desire	৮ (8) বার
দুষ্কৃতিকারীকে ভয়- Fear Terror	৮ (8) বার
উচ্চ কণ্ঠে- Loud	১৬ (16) বার
প্রকাশিত করা- Publicaly	১৬ (16) বার
শক্ত- Hard	১১৪ (114) বার

www.nagorikpathagar.org

আরবি শব্দ (Arabic Word)	অর্থ (Meaning)	শব্দটি যতবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা। Number of times present in the Holly Quran.
AL-SABAR	ধৈর্য- Patience	১১৪ (114) বার
MOHAMMAD (SAWS)	মুহাম্মদ (সঃ)- Mohammad (Saw)	৪ (4) বার
AS-SHARIAH	শরীয়া বিধান- Allah's Law	৪ (4) বার
AR-RAJUL	পুরুষ- Man	২৪ (24) বার
AL-MARAH	মহিলা- Woman	২৪ (24) বার
AS-SHAHR	মাস- Month	১২ (12) বার
AL-YAOM	দিন- Day	৩৬৫ (365) বার
AL-BAHAR	সমুদ্র- Sea	৩২ (32) বার
AL-BARRU	ভূমি- Land	১৩ (13) বার

পৃথিবীতে চারভাগের তিনভাগ পানি আর বাকি এক ভাগ স্থল বলেই আমরা জানি। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক হিসাবমতে পানির পরিমাণ হচ্ছে- ৭১.১১১১১১% আর ভূমির পরিমাণ হচ্ছে ২৮.৮৮৮৮৮৮%। আশ্চর্যের বিষয় এ হিসাবটা কুরআনের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সমুদ্রের কথা এসেছে ৩২ বার আর ভূমির কথা এসেছে ১৩ বার। এ দু'টি সংখ্যার মধ্যে কোন মিল নেই। অথচ এর মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে গোপন রহস্য। মোট ভূমি ও সমুদ্রের কথা এসেছে (১৩ + ৩২) = ৪৫ বার।

৪৫ বারের মধ্যে সমুদ্র = ৩২ বার

এতএব, ১০০ এর মধ্যে সমুদ্র (পানি) $= \frac{৩২ \times ১০০}{৪৫} =$ ৭১.১১১১১১%

অনুরূপভাবে ভূমির পরিমাণ $= \frac{১৩ \times ১০০}{৪৫} =$ ২৮.৮৮৮৮৮৮%

এত অমিলের মধ্যেও মিল খুঁজে পেয়েছেন কি? সুবহানাল্লাহ্!

পৃথিবীতে ১২ মাসে পূর্ণ একটি বছর গণনা করা হয়।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ـ (التوبة : ٣٦)

www.nagorikpathagar.org

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট গণনার মাস বারটি।" (সূরা তাওবা ৯ ঃ আয়াত ৩৬)

আল কুরআনেও বছরের কথা এসেছে ১২ বার। আর দিনের কথা এসেছে ৩৬৫ বার। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا (ط) ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - (الانعام : ٩٦)

"তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন; এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।"

(সূরা আন্‌আম ৬ ঃ আয়াত ৯৬)

এভাবে মহান স্রষ্টার অসংখ্য বাণীই সৃষ্টির নৈপুণ্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে কুরআনে স্থান পেয়েছে। ড. তারিক তার গবেষণায় কুরআনের অলৌকিকত্বের যে সর্বশেষ নিদর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা বিবেকবান সমাজকে রীতিমত চমকে দিয়েছে। পৃথিবীর পানি ও ভূমির পরিমাণ যা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে তা বিজ্ঞানকেও হার মানিয়ে দেয়।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. রাশাদ খলিফা কম্পিউটারের সাহায্যে পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মু'জেযা আবিষ্কার করেছেন। তার গবেষণার ফলাফল এত বিস্ময়কর যে, তা যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না এবং সবাই বিশেষ করে জ্ঞানী লোকেরা কুরআনের এই বৈশিষ্ট্যে যে প্রভাবিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে কেউ তার গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে পারে এ অনুমতি তিনি দিয়েছেন। কুরআনের এই মু'জেযা বুঝার জন্য কেবলমাত্র ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যা গণনার যোগ্যতাই যথেষ্ট। কোন উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই।

১৯৭৩ সনে ড. রাশাদ খলিফা আমেরিকায় পবিত্র কুরআনকে কম্পিউটারে ঢুকানোর (Set করার) সময় হঠাৎ তার কুরআনের ৭৪ নম্বর সূরার ৩০ নম্বর আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি পড়ল। এ আয়াতে মহান স্রষ্টা ঘোষণা দিলেন-

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

"৭৪ নম্বর সূরার ৩০ নম্বর আয়াতটির অর্থ নিম্নরূপ হতে পারে-

সবার উপর উনিশ।	উহার উপর উনিশ।
ইহার উপর উনিশ।	ইহার মহত্ত্ব উনিশ।
তাহার উপর উনিশ।	

এরপর আরম্ভ হলো গবেষণা, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তিনি দেখলেন কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা। ১১৪কে ১৯ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ছাড়াই মিলে যায়। (১১৪ ÷ ১৯ = ৬) বিসমিল্লাহীর রাহ্‌মানির রাহীম আয়াতটিতে অক্ষরের সংখ্যা ১৯। কুরআনে বিসমিল্লাহ শব্দটি লেখা হয়- بسم الله এভাবে মানে ب অক্ষরের পর س অক্ষর দিয়ে আসলে শব্দটি ب অক্ষরের পর اسم হওয়ার কথা। তাহলে শব্দটি হওয়া উচিত ছিল باسم الله এরকম। কিন্তু নবীজীর নির্দেশে এই শব্দটি আলিফ বাদ দিয়ে লিখা হয়েছে بسم الله এভাবে। আলিফ অক্ষরটি বাদ না দিলে উক্ত আয়াতে অক্ষরের সংখ্যা হতো ১৯ এর বদলে ২০। তাহলে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতো না। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আয়াতটিতে চারটি শব্দ রয়েছে- ইসম, আল্লাহ, রাহমান ও রাহীম। এ শব্দগুলো কুরআনে যতবার এসেছে, প্রত্যেকটিই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। নিচে এর চিত্র দেখানো হলো-

ইসম শব্দটি এসেছে সমগ্র কুরআনে ১৯ বার (১৯ ÷ ১৯ = ১)

আল্লাহ্ শব্দটি এসেছে সমগ্র কুরআনে ২৬৯৮ বার (২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২)

আর-রাহমান শব্দটি এসেছে সমগ্র কুরআনে ৫৭ বার (৫৭ ÷ ১৯ = ৩)

আর-রাহীম শব্দটি এসেছে সমগ্র কুরআনে ১১৪ বার (১১৪ ÷ ১৯ = ৬)

উপরোক্ত ভাগফলের যোগফল ১+ ১৪২ + ৩ + ৬ = ১৫২ (১৫২ ÷ ১৯ = ৮)

এত বিশাল গ্রন্থে এই ঘটনাটি একটি শব্দের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীনভাবে হঠাৎ ঘটে যেতে পারে, তবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ সকল শব্দের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীনভাবে ঘটে যাবে তা একেবারেই অসম্ভব।

শুধু কি তাই? কুরআনে মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি। 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' আয়াতটি ১১৩টি সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা তওবা'র প্রথমে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু সূরা নাম্‌লে (২৭) প্রথমে একবার এবং ভিতরে ৩০নম্বর আয়াতে একবার, যার ফলে উক্ত আয়াতটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সম্ভব হয়েছে। ঘটনাচক্র এখানেই শেষ নয়- পবিত্র কুরআনে কিছু অক্ষর ২৯টি সূরার প্রথমে আছে। এগুলিকে 'মুকাত্তাআত' বলে। ২৯টি সূরাতে (সূরা নম্বর ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫০. ৬৮) ১৪টি হরফ (অক্ষর) ১৪ প্রকারে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের যোগফল হলো ১৪ + ১৪ + ২৯ = ৫৭। যা উনিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। পশ্চিমা সমালোচকরা এই "মুকাত্তাআত"কে কুরআনের অংশ মেনে নেয় না। তাদের মতে এগুলি লেখকদের নামের প্রথম অক্ষর। অথচ তারা জানে না যে, আরবরা ইংরেজির মতো প্রথম অক্ষর দিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম আজও লেখে না। এটা তাদের প্রথা নয়

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার রাশাদ জানালেন, যেসব সূরা 'মুকাত্তাআত' বর্ণ দ্বারা শুরু, সেই সূরার মধ্যে 'মুকাত্তাআতে'র অক্ষর / অক্ষরসমূহ যতবার পাওয়া যায়, তা উনিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। ড. রাশাদের লেখা হতে প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

৪২ ও ৫০ নম্বর সূরার মুকাত্তাআত হরফ ق (কাফ)

এ দুটি সূরাতে অতি সহজে আপনি ق 'কাফ' অক্ষরটির সংখ্যা নিজে বের করতে পারেন। উভয়ক্ষেত্রে 'কাফ' এর সংখ্যা ৫৭। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। আবার সংখ্যাদ্বয় সমষ্টিগতভাবে ৫৭ + ৫৭ = ১১৪, তাও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। তার যুক্তি হলো, যেহেতু ق 'কাফ' অক্ষরটি উক্ত দুটি সূরাতে মুকাত্তাআত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেহেতু দুটি সূরাতে ق কাফ অক্ষরটি সমষ্টিগতভাবে ১১৪ যা কুরআনের মোট সূরার সংখ্যার সমান। সেক্ষেত্রে ق কাফ অক্ষরটি যদি কুরআনের প্রতীক হয় তবে এর মধ্যে ১১৪টি সূরার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্ব হতেই যে কুরআনের বিভক্তি সম্পর্কে মহান স্রষ্টা আল্লাহর এই পরিকল্পনা ছিল এটাই তার প্রমাণ। এ প্রমাণের সাথে আরো একটা প্রমাণ পেশ করা যায়, আপনারা জানেন সম্পূর্ণ কুরআন একত্রে নাযিল হয়নি। একটি বা একাধিক আয়াত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। পরে আল্লাহর নির্দেশে এসব আয়াত একত্র করে করা হয়েছে সূরা এবং সব সূরা মিলে করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কিতাবটি। অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব হওয়ার পূর্বেই সূরা বাকারায় ঘোষণা করা হয়েছে-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (ط) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ (البقرة : ٢)

"ইহা সেই **কিতাব**; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২)

এটা যে পরবর্তীতে একটা সম্পূর্ণ কিতাব হবে তা আল্লাহ পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় সারা কুরআনে লুত সম্প্রদায় বলতে 'কাওমি লুত'

قوم لوط বলা হয়েছে কিন্তু ৫০ নম্বর সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে একবারমাত্র ইখওয়ানু লুত اخوان لوط শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৫০ ঃ ১৩ আয়াতটিও যদি কাওমি লুত ব্যবহার করা হতো তবে এই ৫০ সূরায় ق 'কাফ' অক্ষরের সংখ্যা হয়ে পড়ত ৫৭ এর স্থলে ৫৮। ফলে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না। আর ৫০ ও ৪২ নম্বর সূরার ق 'কাফ' অক্ষরটির সংখ্যাও হয়ে যেত ১১৫। যা কুরআনের সূরার সংখ্যার সমান হতো না। মাত্র একটি শব্দের প্রয়োগ

www.nagorikpathagar.org

নসাৎ করে ফেলতো কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিকল্পনা। একি এক সাবধানীর জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে না?

৭ নম্বর সূরার প্রথমে 'মুকাত্তাআত' (لمص।) এ সূরায় ৬৯ নম্বর আয়াতে 'বাসতাতান' (بَصۜطَةً) শব্দটিতে সাদ (ص) অক্ষরটির উপরে একটি ছোট (س) লিখা রয়েছে। আরবি রীতি অনুসারে শব্দটি (س) দিয়ে লিখার কথা। কিন্তু আল্লাহর দূত জীবরাঈল (আ) এর নির্দেশে মুহাম্মদ (সা) س এর স্থলে ص দিয়ে লিখে س এর মত উচ্চারণ করতে সাহাবীদেরকে পরামর্শ দেন। তখন থেকে এ শব্দটি কুরআনে ص দিয়ে লিখে উপরে ছোট س লিখে দেওয়া হয়। প্রশ্ন আসে কেন জীবরাঈল (আ) ৭ ঃ ৬৯ আয়াতে এরূপ বানান লিখার নির্দেশ দিলেন? মজার ব্যাপার হলো প্রায় ১০০ বছরের বেশি সময় যাবৎ ছাপাখানার অভাবে কুরআন হাতেই লেখা হত। প্রত্যেক লেখক কুরআন কপি করার সময় ২ ঃ ২৪৭ আয়াতটি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'বাসতাতান' (بسطة) শব্দটি (س) দিয়ে লিখত। কিন্তু একই লেখক উক্ত শব্দটি ৭ ঃ ৬৯ আয়াতে (ص) দিয়েই লিখত। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে শব্দটি যদি ৭ ঃ ৬৯ আয়াতে (س) দিয়েই লিখতেন তবে ৭, ১৯ ও ৩৮ নম্বর সূরায় ব্যবহৃত 'মুকাত্তাআত' অক্ষর (ص) এর সমষ্টি ১৫২ না হয়ে ১৫১ হত, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। (১৫২ ÷ ১৯ = ৮)

একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, আল-কুরআনের বিশ্লেষণে ১৯ সংখ্যাটি কেন বেছে নেওয়া হলো? কী এই সংখ্যা ১৯? ১৯ লিখতে দুটি সংখ্যার প্রয়োজন হয়- ১ ও ৯। অর্থাৎ অঙ্কের প্রথম ও শেষ রাশি। ১ হলো সংখ্যা সমূহের মধ্যে ০ (শূন্য) বা অস্তিত্বহীনতার পর প্রথম অস্তিত্ব। আর ৯ হলো সর্ববৃহত্তম সংখ্যা.- শেষ রাশি। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা একক ও অদ্বিতীয়। আবার তিনিই প্রথম তিনিই শেষ। ১ ও ৯ দ্বারা তাই বুঝায়।

এক নজরে কম্পিউটার বিশ্লেষণে কুরআন

১. কুরআনের উদ্বোধনী আয়াত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমে'র অক্ষর সংখ্যা ১৯।

২. কুরআনে সর্বমোট সূরার সংখ্যা ১১৪। (১১৪ ÷ ১৯ = ৬)

. সর্বপ্রথম ওহী সূরা 'আলাকে'র (৯৬) আয়াত ১-৫।

এতে শব্দসংখ্যা ১৯। (১৯ ÷ ১৯ = ১)।

এই ১৯ শব্দে অক্ষরের সংখ্যা ৭৬ (৭৬ ÷ ১৯ = ৪)।

www.nagorikpathagar.org

এই সূরায় আয়াতের সংখ্যা ১৯ (১৯ ÷ ১৯ = ১)।

এই সূরায় মোট অক্ষরের সংখ্যা ২৮৫ (২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫)।

৪. দ্বিতীয় ওহী সূরা ৬৮ আয়াত ১-৯। শব্দসংখ্যা ৩৮ (৩৮÷ ১৯ = ২)

৫. তৃতীয় ওহী সূরা ৭৩ আয়াত ১-১০। শব্দসংখ্যা ৫৭ (৫৭ ÷ ১৯ = ৩)

৬. চতুর্থ ওহী সূরা ৭৪ আয়াত ১-৩০। যার ৩০ নং আয়াতের শেষ শব্দ ১৯

৭. ৫ম ওহী সূরা, সূরা ফাতিহা যার প্রথম আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯

৮. সূরা তওবা বাদে ১১৩টি সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আছে এবং সূরা নামলের প্রথমে এবং ৩০ নম্বর আয়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম থাকাতে ১১৪ বার হয়েছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। সূরা নামলে দুইবার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম না থাকলে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হত না।

৯. কুরআনে ১৪টি অক্ষর দিয়ে ১৪ প্রকারে ২৯টি সূরার প্রথম মুকাত্তাআত আয়াতটি বিদ্যমান। (১৪ + ১৪ + ২৯ = ৫৭)

১০. এক অক্ষর মুকাত্তাআত বিশিষ্ট সূরা ঃ-

ক. ق (কাফ) অক্ষরটি ৫০ নম্বর ও ৪২ নম্বর সূরার প্রথমে বিদ্যমান। উভয় সূরাতে ৫৭ বার করে অক্ষরটি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এই "মুকাত্তাআত (কাফ)" অক্ষর সম্বলিত সূরা মোট অক্ষরের সংখ্যা ১১৪। যা কুরআনের মোট সূরার সংখ্যার সমান।

খ. ن (নুন) অক্ষর ঃ সূরা আল-কালামে (৬৮) এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূরায় (নুন) অক্ষরটির সংখ্যা ১৩৩ যা ১৯ (১৩৩ ÷ ১৯ = ৭) দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

গ. ص (সাদ) অক্ষর ঃ- কুরআনে ৭, ১৯ ও ৩৮ নম্বর এ তিনটি সূরার প্রথমে রয়েছে এবং তিন সূরায় সাদ অক্ষরটির সংখ্যা ১৫২। (১৫২÷ ১৯ = ৮) যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

১১. দুই অক্ষর মুকাত্তাআত বিশিষ্ট সূরা

ক. يس ঃ- এ দুইটি অক্ষর কেবলমাত্র সূরা ইয়াসিনের (৩৬) শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং গোটা সূরাতে এ দুটি অক্ষর সংখ্যার সমষ্টি ২৮৫ (২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫) যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

খ. حم ঃ- এ দুই অক্ষর মুকাত্তাআত বিশিষ্ট সূরা (৪০-৪৬) মোট ৭টি। উক্ত সূরাগুলোতে অক্ষরদ্বয়ের সমষ্টি ২১৪৭ (২১৪৭ ÷ ১৯ = ১১৩) যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

www.nagorikpathagar.org

১২. তিন অক্ষর মুকাত্তাত বিশিষ্ট সূরা ঃ-

ক. عسق (আইন-সীন-ক্বাফ) ঃ এ তিনটি অক্ষর সমষ্টি একমাত্র ৪২ নম্বর সূরা আশুরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরায় তিনটি অক্ষরের মোট সংখ্যা মাত্র ২০৯ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (২০৯ ÷ ১৯ = ১১)।

খ. الم (আলিফ-লাম-মীম) ঃ এ তিনটি অক্ষর সমষ্টি সূরা ২,৩,২৯, ৩০, ৩১ এবং ৩২ নম্বর মোট এই ৬টি সূরার প্রথমে রয়েছে।

২ নম্বর সূরায় ৯৮৯৯ বার (৯৮৯৯ ÷ ১৯ = ২৫১) এবং

৩ নম্বর সূরায় ৫৬৬২ বার (৫৬৬২ ÷ ১৯ = ২৯৮)

২৯ নম্বর সূরায় ১৬৭২ বার (১৬৭২ ÷ ১৯ = ৮৮)

৩০ নম্বর সূরায় ১২৫৪ বার (১২৫৪ ÷ ১৯ = ৬৬)

৩১ নম্বর সূরায় ৮১৭ বার (৮১৭ ÷ ১৯ = ৪৩)

৩২ নম্বর সূরায় ৫৭০ বার (৫৭০÷ ১৯ = ৩০)

গ. الر (আলিফ লাম রা) ঃ এ তিন অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাআতটি ১০, ১১, ১২, ১৪ এবং ১৫ নম্বর এ পাঁচটি সূরার প্রথমে রয়েছে এবং ১০ নম্বর সূরায় এ অক্ষরগুলোর সমষ্টি ২৪৮৯ ÷ ১৯ = ১৩১, ১১ নম্বর সূরায় ২৪৮৯ ÷ ১৯ = ১৩১, ১২ নম্বর সূরায় ২৩৭৫ ÷ ১৯ = ১২৫, ১৪ নম্বরে ১১৯৭ (১১৯৭ ÷ ১৯ = ৬৩) এবং ১৫ নম্বর সূরায় ৯১২ (৯১২ ÷ ১৯ = ৪৮)।

১৩. চার অক্ষর মুকাত্তাত বিশিষ্ট সূরা

(ক) المر (আলীফ লাম মীম রা) ঃ এ চারটি অক্ষর এক সঙ্গে ১৩ নম্বর সূরার প্রথমে রয়েছে এবং এ সূরার এ চারটি অক্ষর সংখ্যার যোগফল হলো ১৪৮২ ÷ ১৯ = ৭৮।

খ. المص (আলীফ লাম মীম সাদ) ঃ এ চারটি অক্ষর এক সঙ্গে কেবল ৭ নম্বর সূরায় রয়েছে এবং এ সূরাতে উক্ত চারটি অক্ষরের সমষ্টি হলো ৫৩২০ ÷ ১৯ = ২৮০

১৪. পাঁচ অক্ষর মুকাত্তাত বিশিষ্ট সূরা ঃ-

كهيعص (কাফ হা ইয়া আইন সাদ) ঃ এ পাঁচটি অক্ষর একমাত্র সূরা মারইয়াম (১৯) এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং উক্ত সূরাতে এই অক্ষরের সমষ্টি হলো- ৭৯৮ (৭৯৮ ÷ ১৯ = ৪২)।

এমনিভাবে প্রত্যেক সূরাতেই মুকাত্তাআত গঠিত অক্ষরগুলির সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। উপরে অতি সংক্ষেপে পবিত্র কুরআনে উনিশের বিধান (প্রভাব) দেখানো হলো।

কম্পিউটার আবিষ্কৃত ১৯ এর বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে আমরা পাই-

www.nagorikpathagar.org

১. উনিশের এক বিস্ময়কর গাণিতিক বন্ধনের মাধ্যমে সমগ্র কুরআন (এর বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মাঝে) অতি নিবিড় সম্পর্ক এবং অবিচ্ছেদ্য ও অদৃশ্য বাঁধন তৈরি করেছে। ফলশ্রুতিতে যে কোনো অংশের একটি শব্দ এমনকি একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হলে তা সহজেই ধরা পড়ে যাবে। অধিকন্তু অর্থের পরিবর্তন এবং বিকৃতিতো হবেই। অর্থাৎ কুরআনকে অবিকৃত রাখার জন্য এটাও আল্লাহ পাকের একটা অন্যতম ব্যবস্থা।

২. এটা ইসলাম বিরোধীদের অন্তরে এক মহাত্রাস সৃষ্টি করবে।

৩. এটা জুলস্ মেসারম্যান এবং মাইকেল এইচ হার্টের মতো নিরপেক্ষ ইহুদি ও খৃস্টানদের যারা এই মতামত পোষণ করেন যে, নবী মুহাম্মদ (সা) এর নিকট অবতীর্ণ ওহীর উৎস হচ্ছে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা এবং পবিত্র কুরআন আল্লাহর নিশ্চিত বাণী যা এখনও অক্ষত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত রয়েছে। যা তাদের হেদায়েত লাভে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কুরআনের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মাবে।

৪. এটা ঈমানদার মুসলমান যারা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছে তাদের ঈমানকে করবে আরও বলিষ্ঠ ও মজবুত।

৫. এটা মুসলিমদের এবং কুরআনের নিরপেক্ষ অনুসরণকারীদের অন্তর হতে সর্বপ্রকার সংশয় সন্দেহ দূরীভূত করবে।

৬. সবশেষে এটা গোড়া ও ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা দূর করতে এবং মুনাফিক বা ভণ্ডদের ভণ্ডামি ফাঁস করে তাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও মাতৃগর্ভের সন্তানের লিঙ্গ জানা কি গায়েবকে জানা নয়?

গায়েবের অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য। গায়েব দুই প্রকার। যথা-

১. পুরোপুরি বা নিরঙ্কুশ গায়েব- যা কোন ক্রমেই দৃশ্যমান হবার নয়। যেমন- শব্দ, তাপ, ব্লাকহোল, রূহ ইত্যাদি।

২. আপেক্ষিক গায়েব- যা স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে কারো কারো কাছে কখনো কখনো গায়েব। যেমন- রোগজীবাণু সাধারণ মানুষের জন্য গায়েব কিন্তু প্যাথলজিস্টের জন্য গায়েব নয়। আবার গাছের বীচি দেখে কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, বীচিগুলোর মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ যার মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের

www.nagorikpathagar.org

ফলমূল লুক্কায়িত (গায়েব) আছে. এমনিভাবে আকাশ ও জমিনে এমন সব অসংখ্য অদৃশ্য (গায়েবী) বস্তু রয়েছে, যা একসময় ছিল গায়েব কিন্তু বর্তমানে আর গায়েব নেই। আবার বর্তমানে যা গায়েব হয়তো ভবিষ্যতে তা গায়েব নাও থাকতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বদৌলতে অজানা অচেনা অনেক কিছু জানা, বুঝা ও দেখা সম্ভব হয়েছে। যেমন- বিদ্যুৎ আমরা দেখি না কিন্তু এর কার্যকারিতা আমাদের অজানা নয়। অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু এবং অনেক দূরের বিশাল বিশাল তারকারাজি যা ইতিপূর্বে দেখা অসম্ভব ছিল তা এখন দেখা সম্ভব হয়েছে। এমনকি আমাদের শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার আকৃতি এবং কার্যকারিতাও আলট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে দেখা যায়। ১৫০০ বছর পূর্বে মহান স্রষ্টা ঘোষণা দিলেন-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ (حم السجدة : ٥٣)

"আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করিব বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা হামীম-আস্-সাজদা ৪১ ঃ আয়াত ৫৩)

আল কুরআনে গায়েব এবং গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে বহু বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অজানা, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তবে তিনি যাকে যতটুকু জানান ঠিক ততটুকুই সে জানতে পারে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ـ (البقرة : ٢٥٥)

"তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৫৫)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ (الحشر : ٢٢)

"তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু।" (সূরা হাশ্‌র ৫৯ ঃ আয়াত ২২)

www.nagorikpathagar.org

রাসূলগণও গায়েব জানেন না।

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ـ (الاعراف : ١٨٨)

বল, 'আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সংবাদদাতা বৈ আর কিছু নই।' (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ আয়াত ১৮৮)

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ـ (هود : ٣١)

"আমি তোমাদিগকে বলি না, 'আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে,' আর না অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি ইহাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা।" (সূরা হূদ ১১ ঃ আয়াত ৩১)

আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরা থেকেই এটা সুস্পষ্ট যে, কাফের-মুশরিকরা বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কে অজানা, অজ্ঞাত ও জটিল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে নিজ থেকে চট করে ঐসব অজানা-অজ্ঞাত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে গায়েবী সংবাদ/ওহী প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, কোন কোন জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে ওহী লাভের জন্য দিনের পর দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আল্লাহর নিকট থেকে গায়েবী সংবাদ পাওয়ার পরই শুধু তিনি সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

যেকোন বিষয়ে আল্লাহ মানুষকে নিম্নলিখিত উপায়ে জানিয়ে থাকেন।

১. বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে।

২. স্বপ্নের মাধ্যমে।

৩. নবী রাসূলদেরকে ওহীর মাধ্যমে।

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ـ (علق : ٥)

'তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন ইতিপূর্বে সে যাহা জানিত না।'
(সূরা আলাক ৯৬ ঃ আয়াত ৫)

অতীত, বর্তমান (সর্বকালের) ও ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

১. অতীত ঘটনার ওহী

ক. হযরত জাকারিয়া (আ) ও হযরত মারিয়াম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানালেন-

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ (ط) وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (ص) وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

(ال عمران : ٤٤)

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ- যাহা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মারইয়াম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ আয়াত ৪৪)

খ. হযরত ইউসুফ (আ) এর কাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ জানালেন-

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ (ق) وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ (يوسف : ٣)

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া; যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত ৩)

গ. হযরত নূহ (আ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ জানালেন-

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ (ج) مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا (ط) فَاصْبِرْ (ط) اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ (هود : ٤٩)

'এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা হইবার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ পরিনাম মুত্তাকীদের জন্য।'

(সূরা হূদ ১১ ঃ আয়াত ৪৯)

২. বর্তমান (কুরআন নাযিলের সময়ের) বা সর্বকালের জন্য ওহী : পবিত্র কুরআনে ভ্রূণ তৈরি হয়ে যেসব পর্যায় অতিক্রম করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানানো হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। যা বর্তমান ভ্রূণ বিদ্যার সাথে হুবহু মিলে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين ـ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما (ق) ثم انشانه خلقا اخر (ط) فتبرك الله احسن الخلقين ـ (المؤمنون : ١٤.١٣)

"অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাক-এ, অতঃপর 'আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পিঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পিঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্ত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।"

(সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ আয়াত ১৩-১৪)

৩. ভবিষ্যতের জন্য ওহী : আকাশে ভ্রমণের কথা যা কুরআন নাযিলের সময় একেবারেই ছিল অজানা, অবিশ্বাস্য কিন্তু তা জানানো হয়েছে ওহীর মাধ্যমে।

يمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطن ـ (الرحمن : ٣٣)

"হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না, সনদ (ক্ষমতা) অর্জন ব্যতিরেকে।"

(সূরা আররাহ্মান ৫৫ ঃ আয়াত ৩৩)

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক ওহী ইতিমধ্যে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যারা ঈমান আনে না বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহান স্রষ্টা ঘোষণা দেন-

ويل يومئذ للمكذبين ـ الذين يكذبون بيوم الدين ـ (المطففين : ١١.١٠)

"সেইদিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের, যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।" (সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩ ঃ আয়াত ১০-১১)

والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولئك اصحب النار هم فيها خلدون ـ (البقرة : ٣٩)

"যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ৩৯)

www.nagorikpathagar.org

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছাড়াই ঘনকালো মেঘ ও ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হলেই আমরা বলি কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি হবে। এটি এক ধরনের গায়েব যা আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল মেহেরবান স্রষ্টার দান। আবার বর্তমানে আধুনিক 'টেকনোলোজির' মাধ্যমে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে (যেমন-তাপমাত্রা, বাতাসের গতি ও নিম্নচাপ ইত্যাদি) আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়। যা সবসময় সঠিক হয় না। যাক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস দেয়া হয় তা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই এটা আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ও ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মাতৃগর্ভে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিছুতেই নিরঙ্কুশ, গায়েব হতে পারে না। আবার এ সম্পর্কে কেউ জানতে পারবে না এমন কথা কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। মাতৃগর্ভের সন্তান সম্পর্কীয় কুরআনের কিছু আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۤءُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (ال عمران : ٦)

"তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আল-ইমরান ৩ ঃ আয়াত ৬)

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ (ط) وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ـ (الرعد : ٨)

"প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।" (সূরা রা'দ ১৩ ঃ আয়াত ৮)

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (ج) وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (ج) وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا (ط) وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ (ط) اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ (لقمن : ٣٤)

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনিই বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে

www.nagorikpathagar.org

কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ৩৪)

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে মাতৃগর্ভে সন্তান ছেলে না মেয়ে তা কেউ বলতে পারবে না বা এ সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানেন আর কেউ জানে না বা জানবে না এমন বর্ণনা নেই। বরং আশ্চর্যের কথা হচ্ছে তৃতীয় আয়াতটিতে (৩১ঃ৩৪) কেয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করিবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু আয়াতের মাঝের অংশে বৃষ্টি ও জরায়ুর বিষয়ে কেউ জানে না বা এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই এমন কথার উল্লেখ নেই।

অতএব আল্লাহর দেয়া জ্ঞান প্রয়োগ করে কেউ যদি আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও মাতৃগর্ভের সন্তানের লিঙ্গ জানতে পারে তা কিছুতেই ইলমুল গায়েব নয়। তবে ইলমুল গায়েব সম্পর্কীয় মুসনাদে আহামদ এর একটি হাদীস নিয়ে বিতর্ক বা সন্দেহ হতে পারে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

ইলমুল গায়েব এর চাবি হইতেছে ৫টি। যাহা আল্লাহ ছাড়া কেহই জানে না। "আগামীকাল কি হইবে আল্লাহ ছাড়া কেহই জানে না। আল্লাহ ছাড়া কেহই জানে না মাতৃগর্ভে কি আছে। আল্লাহ ছাড়া কেহই জানে না যে কখন বৃষ্টি হইবে। কোন ব্যক্তি জানে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করিবে। কোন ব্যক্তি জানে না যে, কোন স্থানে তাহার মৃত্যু হইবে।"

মাতৃগর্ভের সন্তান কালো হবে না সাদা হবে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না দুর্বল ও রোগা হবে, বেহেশতী হবে না দোজখী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। কাজেই মাতৃগর্ভের সন্তান সম্পর্কে এসব ইলমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহরই হাতে। অতএব মাতৃগর্ভের সন্তানের লিঙ্গ জানা আর ইলমুল গায়েব জানা এক কথা নয়।

সকল কাজতো আল্লাহই করান, তবে পাপের জন্য আমরা দায়ী হব কেন?

আমার স্বল্পজ্ঞানে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে উক্ত বিষয়ে যৎসামান্য যা বুঝতে পেরেছি তা অতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কোন অপব্যাখ্যা হয়ে থাকলে মহান আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, দোষ-ত্রুটি, পাপ ও পুণ্যের পথ বেছে নেয়ার জন্য বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন, যাতে এসবের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

পার্থক্য বুঝে সে নিজেই নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা মোতাবেক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভাল মন্দ যেকোন কাজ করতে পারে। আর এ স্বাধীনতার কারণেই সে দুনিয়ার জীবনে প্রশংসা বা নিন্দা এবং আখেরাতে শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ যেমন তাকে কুফরী ও নাফরমানীর জন্য বাধ্য করেননি, তেমনি বাধ্য করেননি ঈমান আনতে। বরং তিনি রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করেছেন। এছাড়াও কাজ সমাধা করার জন্য দিয়েছেন কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন নানা রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সবাইকে আবার সমান ক্ষমতাও দেননি। তবে যাকে যতটুকু দিয়েছেন ঠিক ততটুকুরই হিসাব নিবেন তিনি। আল্লাহর ঘোষণা-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ـ

(البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ কাহারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৮৬)

আল্লাহর দেয়া কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন (Active) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই আমরা পাপ বা পুণ্যের কাজ করে থাকি। যেকোন একটা অঙ্গ না থাকলে অথবা অবশ (Paralysis) হলে সে অঙ্গ দিয়ে পাপ বা পুণ্যের কাজ কিছুই করা সম্ভব নয়। কাজেই কাজ করার জন্য দরকার কর্মক্ষম (Active) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর সে কর্মক্ষম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমাদের ইচ্ছানুসারে কাজে লাগানোর ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যে গাড়ি চালানোতো দূরের কথা স্টার্টই দিতে জানে না তার পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে গাড়িটি যদি কারখানা থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটি (Manufacturing defect) নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এমনকি তৈলই Pass হয় না, তবে এমন গাড়ি উত্তম ড্রাইভারের পক্ষেও চালাতে পারাতো দূরের কথা স্টার্ট দেয়াই সম্ভব নয়। কাজেই গাড়ি চালানোর জন্য দরকার-

১. নিখুঁত গাড়ি

২. Train Driver ।

এ দুয়ের যেকোন একটির অভাবে গাড়ি চলবে না। তেমনি আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কর্মক্ষম (Active) রাখার একমাত্র মালিক মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে বলতে হবে তিনি আমাদের

www.nagorikpathagar.org

কাজের জন্য দায়ী (যেহেতু তিনি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কর্মক্ষম রেখেছেন)। অন্যদিকে কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারি বলে কাজের জন্য আমরাই দায়ী। আবার যে পাগল কিছুই বুঝে না বা বিবেক যার কাজ করে না এমন কেউ কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যদি কাউকে খুন করেও ফেলে এর জন্য তার শাস্তি নেই। জ্ঞান বা বিবেক না থাকার কারণে সে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

এমনিভাবে পাগল বা শিশু উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ালে তাকে ভর্ৎসনা করা হয় না। জ্বরের কারণে আবোল-তাবোল বকলে তাকে দোষ দেয়া হয় না। একজন অন্ধ নিজের জিনিসের পরিবর্তে অন্যের জিনিস তুলে নিলে তাকে চোর বলা হয় না। একজন সুস্থ মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে কোন কাজ করলে তার ভিত্তিতেই প্রশংসা, বদনাম, শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

মহান স্রষ্টা ঘোষণা দেন-

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۙ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۚ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاۤءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ (ط) (فاطر : ١٩-٢٢)

"সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, আর না অন্ধকার ও আলো, আর না ছায়া ও রৌদ্র এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত।" (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ আয়াত ১৯-২২)

এখানে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল

১. অক্ষম অঙ্গ দিয়ে পাপ বা পুণ্যের কাজ কোনটাই সম্ভব নয়।
২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহই কর্মক্ষম রেখেছেন।
৩. কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও পাগল ও শিশুর কাজের কোন হিসাব নেই।

কাজেই কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শাস্তির জন্য দায়ী নয় যা আল্লাহই কর্মক্ষম রেখেছেন। দায়ী হচ্ছে বিবেকসম্পন্ন লোকের কর্ম যা ইচ্ছা অনুসারে করা হয়। আল্লাহ্ পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি কাহারও প্রতি যুলুম করেন না। মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۔ (حم السجدة : ٤٦)

"যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।"

(সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ৪১ঃ আয়াত ৪৬)

www.nagorikpathagar.org

আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারছি বলে পাপপুণ্যের জন্য আমরাই দায়ী। এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন হস্তক্ষেপ নেই বলে তিনি মোটেও দায়ী নন। মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ـ (الدهر : ٣)

"আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি. হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।" (সূরা দাহ্‌র বা ইনসান ৭৬ ঃ আয়াত ৩)

উপরের আলোচনা কি প্রমাণ করে না পাপ কাজের জন্য আমরাই দায়ী?

ভাগ্যে যা লিখা আছে তাই হবে তবে পুণ্য করে লাভ কি?

একথা অত্যন্ত সত্য যে, আমাদের নসীব বা ভাগ্যে যা লিখা আছে তা হবেই। এটা মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই লিখা। এখানেই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির পার্থক্য। আমরা কোন কিছু ঘটার পর জানি আর স্রষ্টা জানেন ঘটার পূর্বেই। তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই একরকম অর্থাৎ বর্তমান কাল। তিনি আগে থেকেই জানেন কে পাপী আর কে পুণ্যবান হবে। কে পাপ কাজ করেও মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে আর কে পুণ্যের কাজ করা সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্তে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে বেঈমান হিসেবে মারা যাবে। তিনি যে সবকিছু জানেন এটা তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। মহান স্রষ্টার ঘোষণা-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ـ (البقرة : ٢٥٥)

"তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত্ব করিতে পারে না।" (সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৫৫)

যে যেমন কর্ম করবে সেভাবেই ভাগ্য লিখা হয়েছে। আর লিখা অনুসারে কাজ না হলে আল্লাহ যে ভবিষ্যৎজান্তা তা সত্য হলো কিভাবে? ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকার অর্থ এই নয় যে, তিনিই ঐ ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী সর্বজান্তা আল্লাহর জ্ঞান পরিমাপ করা আদৌ সম্ভব নয় বলে আমাদের মনে এত প্রশ্ন এত সন্দেহ। আল্লাহর ঘোষণা-

www.nagorikpathagar.org

فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ـ (ال عمران : ٦٦)

"যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ?"

(সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ আয়াত ৬৬)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ـ
(لقمن : ٢٠)

"মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে, তাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে দীপ্তিমান কিতাব।"

(সূরা লুকমান ৩১ ঃ আয়াত ২০)

হাশরের দিনে ভাগ্যলিপি অনুসারে বিচার হবে না। বিচার হবে কর্মফলের উপর নির্ভর করে। এমন তো বলা হবে না যে, তোমার ভাগ্যে জাহান্নাম (দোযখ) লিখা আছে তুমি জাহান্নামে যাও, আর তোমার ভাগ্যে জান্নাত (বেহেশত) লিখা আছে তুমি জান্নাতে যাও বরং যে যা করে তা লিখে রাখা হয় পৃথিবীর জীবনেই এবং সেই অনুসারেই প্রতিদান পাবে। মহান স্রষ্টা ঘোষণা দেন-

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ـ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ـ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ
(الانفطار : ١٠ـ١٢)

"অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ: সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তাহারা জানে তোমরা যাহা কর।"

(সূরা ইনফিতার ৮২ ঃ আয়াত ১০-১২)

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ
فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ـ (يس : ١٢)

"আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।"

(সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ আয়াত ১২)

সেদিন বিচারের মানদণ্ড নিয়োগ করে ন্যায় বিচার করা হবে। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

www.nagorikpathagar.org

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا (ط) وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا (ط) وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ـ (الانبياء : ٤٧)

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারো প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি উহা উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত ৪৭)

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ـ (القارعة : ٩-٦)

"তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে, সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া' (দোজখ)।"

(সূরা আল-কারিয়া ১০১ ঃ আয়াত ৬-৯)

وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ (يوسف : ٥٦)

"আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।"

(সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত ৫৬)

কাজেই ভাগ্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সৎ কাজ করুন, আল্লাহর বিধি বিধান মেনে চলুন, হারামকে হারাম আর হালালকে হালাল জানুন। তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীম আপনাকে কামিয়াব করে জান্নাতবাসী করবেন। প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" (সূরা রা'দ ১৩ ঃ আয়াত ৩১) "নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে?" (৯ ঃ ১১১)

পাপ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

পৃথিবীর জীবনে মানুষ ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বুঝে না বুঝে অনেক মারাত্মক পাপ করে থাকেন। আমাদের যাবতীয় পাপপুণ্যের হিসাবনিকাশ হবে হাশরের মাঠে। কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ কেউ পাবে জান্নাত আর কেউ পাবে জাহান্নাম। জান্নাতে শুধু শান্তি আর শান্তি, অন্যদিকে জাহান্নামে শুধু শাস্তি আর শাস্তি। সেখানে যদি ফকির-মিসকিনের মত দিন এনে দিন যাপনের ব্যবস্থা থাকত তাহলেও ভাগ্য অনেক ভাল ছিল জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে। কেননা বেহেশতের শান্তির বর্ণনা শুনলে মন যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে তেমনি দোযখের

www.nagorikpathagar.org

শাস্তির কথা শুনলেও গা শিউরে উঠে। প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীতে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনোই উপায় নেই? এ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা ঘোষণা দিচ্ছেন ইসলামে কোন নিরাশার স্থান নেই।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ـ (الحجر : ٥٦)

"যাহারা পথভ্রষ্ট তাঁহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ হয়?" (সূরা হিজর ১৫ ঃ আয়াত ৫৬)

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ (ط) اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا (ط) اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ (الزمر : ٥٣)

"বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন; তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৫৩)

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ـ (ق : ٤٥)

"সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।" (সূরা কাফ ৫০ ঃ আয়াত ৪৫)

কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে পাহাড় পরিমাণ পাপ করেও তওবা করে ঈমান নিয়ে যেতে পারে, তবে সে জান্নাতবাসী হবে। খালেস নিয়তে তওবা করলে পাপ শুধু মাফই করবেন না, ইহা পূণ্যে পরিণত করে দিবেন দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ।

... اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ (ط) وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ـ (الفرقان : ٧٠-٧١).

"তাহারা নহে, যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ উহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।" (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ আয়াত ৭০-৭১)

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا (لا) اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ (النحل : ١١٩)

www.nagorikpathagar.org

"যাহারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে এবং নিজেদিগকে সংশোধন করিলে তাহাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ১১৯)

وَاِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ـ (طه : ٨٢)

"এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাহার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।" (সূরা তা-হা ২০ ঃ ৮২)

রিয়াদুস সালেহীনে ১৫ নং হাদিস (বুখারী ও মুসলিম থেকে গৃহীত) এর মাধ্যমে জানা যায়-নবীজী বলেছেন, "আল্লাহ তাহার বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল।"

রিয়াদুস সালেহীনের ১৪ নং হাদিসের (মুসলিম শরীফ থেকে গৃহীত) মাধ্যমে আরও জানা যায়- নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে শতবার তওবা করতেন।

তওবার তিনটি শর্ত ঃ

ক. তওবাকারীকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ. সে তার কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।

গ. তাকে আর কখনও গুনাহ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

তবে গুনাহর কাজটি যদি অন্য কোন লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে বা পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। তওবা করার জন্য কারও কাছে যাওয়ার দরকার নেই বা কোন সাক্ষিরও প্রয়োজন নেই। এটা বান্দার সাথে সরাসরি আল্লাহর সম্পর্ক, মাঝে কোনোই পর্দা নেই। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী আর তিনি হচ্ছেন ক্ষমাকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পড়বে -

(مَنْ قَالَ) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ
غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ (مشكوٰة ٢٠٥)

www.nagorikpathagar.org

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সদা বিরাজমান, আর আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন যদি সে যুদ্ধক্ষেত্র হতেও পলায়নকারী হয়।" (আবু দাউদ ও তিরমিজি)

মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর তওবা কবুল হয় না

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ (ط) أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ـ (النساء : ١٨)

"তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কার্য করে, অবশেষে তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করিতেছি' এবং তাহাদের জন্য নহে, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।" (সূরা নিসা ৪ ঃ আয়াত ১৮)

ফেরাউনও সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাওয়ার পূর্বে বলেছিল আমি এখন ঈমান এনেছি কিন্তু তার সে ঈমান কাজে আসেনি।

آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ـ (يونس : ٩١)

'এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' (সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ৯১)

আসুন মৃত্যুর ডাক আসার আগে আমরা সবাই যাতে খাঁটি ঈমান নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরকালের জীবনে কঠিনতম শাস্তির স্থান জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে পরম শান্তির স্থান জান্নাতবাসী হতে পারি তার জন্য খালেস নিয়তে তওবা করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা যেন আমাদেরকে তওবা করার সুযোগ করে দেন ও তওবা কবুল করে নেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করে জান্নাতবাসী হওয়ার সৌভাগ্য করে দেন। আমীন!! সুম্মা আমীন!!!

স্রষ্টার স্রষ্টা কে?

বর্তমানে মানুষ আনন্দ ও ভোগের পথে চলতে গিয়ে অস্বীকার করে স্রষ্টার অস্তিত্বকে। আবার কেউ কেউ দাবি তুলেছে সবকিছুরই স্রষ্টা আছে। তাই স্রষ্টারও স্রষ্টা থাকা উচিত। যদিও ঈমানদারদের এ প্রশ্ন করা নাজায়েজ। তবু যারা প্রশ্ন তুলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি- সর্বময় ক্ষমতা, সর্বজ্ঞানের অধিকারী, চিরঞ্জীব, চিরমহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যিনি সমগ্র সৃষ্টিকূলের

www.nagorikpathagar.org

স্রষ্টা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সীমাবদ্ধ শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও আয়ু দিয়ে। তাঁর সৃষ্টির নৈপুণ্য হচ্ছে- সর্বদিক দিয়ে প্রত্যেকটা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটির চেয়ে আলাদা। প্রতিটি সৃষ্টির সাথে প্রতিটি সৃষ্টির রয়েছে অনেক অমিল।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (الروم : ٣٠)

"আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা রূম ৩০ ঃ আয়াত ৩০)

মানুষ নিজেকে অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করে। মানুষের জ্ঞানের সীমা আসলে কত? অসীম না সসীম? আগেই বলেছি একটা লোক একটা সীমা পর্যন্ত জ্ঞানী হতে পারে, তারপর সে একেবারে অজ্ঞ। মহান স্রষ্টা ঘোষণা করেন-

وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا - (بنى اسرائيل : ٨٥)

"এবং তোমাদিগকে খুব সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।"

(সূরা বনী ইসরাইল ১৭ ঃ আয়াত ৮৫)

যদি اِلَّا قَلِيلٌ বলতেন তাহলে বুঝা যেত আল্লাহ্ তায়ালা কিছু জ্ঞান দান করেছেন। তা না বলে বলেছেন اِلَّا قَلِيلًا অর্থাৎ খুব সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। যখনই কুরআনের যেকোন একটা বিষয় বুঝার চেষ্টা করি তখন মনে হয় সত্যিই যৎসামান্য জ্ঞানই মানুষকে দান করা হয়েছে। এর প্রমাণ এ বইতে প্রচুর পেয়ে থাকবেন। বর্তমানে কেউ কেউ মনে করে, সে সবকিছু বুঝে ও জানে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জ্ঞানের পরিধি খুবই নগণ্য। আবার বর্তমানের তুলনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ তেমন কিছুই জানত না বললে মোটেও ভুল হবে না। কত লোকইতো ডক্টরেট (PhD) ও পোস্ট ডক্টরেট (পৃথিবীর সর্বোচ্চ ডিগ্রি) করেন। এতদ্বসত্ত্বেও কেউ তার বিষয়ে (Subject) জ্ঞানের শেষ সীমানায় পৌঁছতে পেরেছেন বলে দাবি করতে পারেন কি? তিনি কি তার বিষয়ের (Subject) সকল প্রশ্নের উত্তর জানেন? এত উচ্চ ডিগ্রি নেয়া সত্ত্বেও তার বিষয়ের কত প্রশ্নের উত্তরইতো অজানা থেকে যায়, তা একবারও ভেবে দেখেছেন কি?

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ - (النجم : ٣٠)

"উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত।" (সূরা নাজ্‌ম ৫৩ ঃ আয়াত ৩০)

অথচ ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন (Study) না করে বা এ বিষয়ে তেমন কোন জ্ঞান অর্জন ছাড়াই সব প্রশ্নোত্তর জানতে ও বুঝতে পারা আশা করা কি

www.nagorikpathagar.org

ঠিক? নিজের শরীর সম্পর্কেইবা আমরা কতটুকু জানি? স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কীয় কিছু উত্তর না বুঝা ও না জানার কারণে স্রষ্টাকে মানতে রাজি নন অনেকে। ইতিপূর্বে আমি বিজ্ঞানের বেশ কিছু আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছি। যা কোনদিনই কোন উপায়ে মানুষ জানতে পারবে না। যেমন-

১. বিদ্যুৎ দেখতে কেমন এর রূপ ও আকার আকৃতি কি?

২. ব্লাকহোলের ভেতরটা কেমন?

৩. মানুষ সব কিছু দেখতে পারে কি?

মহাবিশ্বে যত সৃষ্টি আছে তার মধ্যে ১০% এরও কম বস্তু এবং যত আলো আছে তার মধ্যে ১% এরও কম আলো বিজ্ঞানীরা দেখার সুযোগ করতে পেরেছেন মাত্র। বাকি ৯০% এর বেশি বস্তু আর ৯৯% এর বেশি আলো অদৃশ্য জগতে দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। উপরে উল্লেখিত যৎসামান্য যা দেখা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন; তাও দেখতে পায় মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু বিজ্ঞানী যারা অতি শক্তিশালী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন- মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে উল্লেখিত বস্তুসমূহ দেখারতো প্রশ্নই উঠে না। না জানা, না দেখা বস্তুর কথা নাইবা বললাম। বিজ্ঞানীরা যৎসামান্য যা কিছু দেখা সম্ভব বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা করলেও মাথা ঘুরপাক খায়। মানুষের দেখার শেষ সীমানা হচ্ছে ১১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরবর্তী তারকারাজি পর্যন্ত। এ দূরত্বের পর তারকাদের সংখ্যা কত? তাদের অবস্থা কী? কোন টেকনলজি ব্যবহার করে তাদেরকে কোনদিনই মানুষ দেখার সুযোগ করতে পারবে না। কারণ এসব দূরবর্তী তারকা থেকে আলো ফিরে আসবে না।

অদৃশ্য ও নিরাকার মহান স্রষ্টা আল্লাহে যাদের বিশ্বাস নেই এবং যারা এ বিষয়টি নিয়ে উপহাস করেন, বিজ্ঞানের এই সুদৃঢ় তথ্যগুলির মোকাবিলায় তারা কী উত্তর দিবেন?

সুধী পাঠক, আপনার বিচার বিবেচনা কি বলে? অনুভব করুন আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বের অবস্থা! তখনকার মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কতটুকুই বা উন্নত ছিল? ঠিক এমনি এক অজ্ঞতার যুগে বিজ্ঞানের এতসব নির্ভুল তথ্যসমূহ কে কুরআনের পাতায় মুদ্রণ করে দিল?

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ـ (يونس : ٢٠)

বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে।'

(সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত ২০)

www.nagorikpathagar.org

وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ـ (النحل : ٨)

"তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যাহা তোমরা অবগত নহ।"

(সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ আয়াত ৮)

বিজ্ঞান জানাচ্ছে অনেক কিছু সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতে পারবে না বা এর উত্তরও দিতে পারবে না কোনদিন। অথচ মহান স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা ও অভিযোগের শেষ নেই। আর এর উত্তর না জানার কারণে স্রষ্টাকে মানতেও রাজি নন অনেকে। আপনারা মহাবিশ্বের সৃষ্টির বর্ণনায় দেখেছেন, হঠাৎ করে এক অতি ক্ষুদ্র সময়ে অতি ক্ষুদ্রতম আকারে অতি বৃহত্তম তাপমাত্রায় অজ্ঞাত প্রচণ্ড এক শক্তির বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। এর পূর্বে ছিল না কিছুই। সর্বত্র বিরাজ করতো শূন্যতা। এ শূন্যতার মধ্যেই কোথেকে, কিভাবে এত প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব হল? এর কোন সদুত্তর বিজ্ঞানের নেই। মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘোরতর সমস্যাটির উত্তর দিয়েছেন একমাত্র মহান স্রষ্টা।

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ (يس : ٨٢)

"তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়।"

(সূরা ইয়াসিন ৩৬ ঃ আয়াত ৮২)

তিনি নিজের সম্পর্কে পরিচয় দেন এভাবে-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ (الاخلاص)

"বল, তিনিই আল্লাহ্‌, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্‌ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।"

(সূরা ইখ্‌লাস্‌ ১১২ ঃ আয়াত ১-৪)

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ (الحديد : ٢-٣)

"আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ববিষয়ের সম্যক অবহিত।"

(সূরা হাদীদ ৫৭ ঃ আয়াত ২-৩)

www.nagorikpathagar.org

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (ج) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (ج) هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (ج) اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (ط) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ
اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (ط) يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (ج) وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (الحشر : ٢٢ـ٢٤)

"তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপকার, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা হাশ্‌র ৫৯ ঃ আয়াত ২২-২৪)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (ج) اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (ج) لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ (ط) لَهٗ مَا
فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ (ط) مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (ط)
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (ج) وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا
شَآءَ (ج) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (ج) وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا (ج) وَهُوَ
الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ (البقرة : ٢٥٥)

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত্ব করিতে পারে না। তাঁহার 'কুরসী' আরশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ তাহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ২৫৫)

www.nagorikpathagar.org

যার উপরোক্ত গুণাবলি আছে তিনিই স্রষ্টা। এছাড়া অন্য কেউ স্রষ্টা হতে পারে না। স্রষ্টাকে চেনার উহাই একমাত্র উপায় (Criteria)। প্রতিটি বস্তুরই স্রষ্টা থাকতে হবে এটা সৃষ্টিকুলের জন্য প্রযোজ্য স্রষ্টার জন্য নয়।

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?" (৮২ ঃ ৬) "তোমাদের কি হইল যে, ঈমান আনিতেছ না?" (৮৪ঃ২০) "তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ না? (৭১ঃ ১৩) "যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।' তিনি যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না: বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।" (২১ ঃ ২২-২৩) "মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।" (৩১ ঃ ২০) "যাহার ইচ্ছা হয় সে আপন প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।" (৭৩ ঃ ১৯) কেবল কাফেররাই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে। এরপরও কি বলবেন, স্রষ্টার স্রষ্টা কে?

শেষ কথা

কুরআনের বিরুদ্ধে সচরাচর বা সাধারণত যেসব অভিযোগ হয়ে থাকে তার জবাব বা উত্তর খুঁজার চেষ্টা করেছি এ বইতে। আর এ জবাবেরই একটা সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো-

কুরআনে শয়তানের কর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে প্রচুর আয়াত বিদ্যমান। এমন একটি আয়াতও নেই যাতে শয়তানের কর্মকে পুণ্যের কাজ এবং তার চরিত্রকে উত্তম বলে দাবি করা হয়েছে বরং তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামবাসী হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। শুধু তাই নয় কুরআন পড়ার পূর্বে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য চাইতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۔ (النحل : ٩٨)

"যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর শরণ লইবে।" (সূরা নাহ্ল ১৬ ঃ আয়াত ৯৮)

অথচ দুঃখের বিষয় এ পবিত্র কুরআনকেই শয়তানের বাণী বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। যদি এটা শয়তানেরই বাণী হয়ে থাকবে তবে কেন

www.nagorikpathagar.org

তার (শয়তানের) বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা কুরআনে থাকবে? কুরআন পড়ার পূর্বে "আমি বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।" এটা পড়ার নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটাই শেষ নয়। সন্দেহ দূর করার জন্য মহান স্রষ্টা আরও সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন-

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ - (التكوير : ٢٥)

ইহা শয়তানের বাক্য নহে। (সূরা তাকবীর ৮১ ঃ আয়াত ২৫)

কেউ কেউ দাবি করেন কুরআন মুহাম্মদ (সা) এর নিজের রচনা। মুহাম্মদ (সা) ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর (উম্মি)। কাজেই নিরক্ষর নবীর পক্ষে রচনা করা বা অন্য ভাষা থেকে নকল করার সুযোগ কোথায়? তাছাড়া কুরআন এমন একটি কিতাব যার ভাষা ও ভাষাগত মান অতি উচ্চাঙ্গের। এমন ভাষা কিছুতেই মানুষের হতে পারে না। এ ছাড়াও এতে রয়েছে অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক বর্ণনা। যা কোন মানুষের পক্ষে আজও রচনা করা সম্ভব নয়। মুহাম্মদ (সা) কে নবী, রাসূল ও শ্রেষ্ঠ মানব নির্ধারণ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দিলেন এভাবে-

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (٧) مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ - (الرعد : ٣٧)

"জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।"

(সূরা রা'দ ১৩ ঃ আয়াত ৩৭)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ - (البقرة : ١٤٥)

"তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

(সূরা বাকারা ২ ঃ আয়াত ১৪৫)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ - فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ - (الحاقة : ٤٤-٤٧)

"সে {মুহাম্মদ (সা)} যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম, এবং

www.nagorikpathagar.org

কাটিয়া দিতাম তাঁহার জীবন-ধমনী. অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।" (সূরা হাক্কাহ ৬৯ ঃ আয়াত ৪৪-৪৭)

কুরআনে অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তব্য যা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমানে। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক এতসব বক্তব্যের মধ্যে একটিতেও সামান্যতম ভুল পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা আরো বেশি আশ্চর্য লাগে এ কারণে যে, কুরআন অন্য ধর্ম থেকে নকল করার দাবি উঠেছে জেনে। বাইবেল সহ অন্যসব ধর্মগ্রন্থ আরবিতে ভাষান্তর (Translation) হয়েছে কুরআন নাযিলের অনেক পরে। তাহলে কি করে দাবি করা হলো অন্য ধর্ম গ্রন্থ থেকে কুরআন নকল করা হয়েছে? আবার অনেক বিষয় কুরআনের সাথে বাইবেলের কোন মিলই নেই বরং উল্টা। এখন প্রশ্ন হতে পারে উল্টা বিষয়ে কুরআন সঠিক না বাইবেল সঠিক? কুরআন বিকৃত হয়েছে না বাইবেল বিকৃত হয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় যা উভয় কিতাবে বর্ণনা রয়েছে বিপরীতভাবে। সেখানে দেখা গেছে কুরআনের বর্ণনাই বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- বাইবেলে চন্দ্র সূর্য উভয়কেই "আলোক" বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে চন্দ্রকে বলা হয়েছে আলোকিত 'মুনির' এবং সূর্যকে বলা হয়েছে আলো প্রদানকারী প্রদীপ 'সিরাজ/ দ্বিয়া'। পবিত্র কুরআনে সূর্যের আলো বুঝাইতে কখনো মুনির বা চাঁদের আলো বলতে 'সিরাজ / দ্বিয়া' বলা হয় নাই বরং এর উল্টোটাই বলা হয়েছে। এখানে দুটি বিষয়- প্রথমত সে যুগে কে জানতো সূর্যের আলো নিজস্ব আর চাঁদের আলো নিজের নয়, সূর্য থেকে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ কুরআন যদি বাইবেলের অনুকরণে লেখা হয়েই থাকে তবে বাইবেলের মত সূর্য চন্দ্র উভয়কেই আলোক হিসেবে বলা হইত। বাইবেল থেকে কুরআন নকল করে থাকলে কিভাবে বাইবেলের ভুল বিবরণ বেছে বেছে বের করে তা সংশোধন করে এমন সব তথ্য যোগ করা হল যা বর্তমানে বিজ্ঞানের বদৌলতে সত্যে প্রমাণিত হলো। একটি বারের জন্যও সামান্যতম কোন ভুল ত্রুটি ঘটল না।

বাইবেলে মানুষের দুনিয়াতে আগমনের যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের ৩৭০০ বছর আগে। যদিও পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কোন সন তারিখ বিজ্ঞানীদের হাতে নেই, এমনকি কুরআনেও এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই তবু সুদূর অতীতের মানুষের নানা কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন নিদর্শনের আবিষ্কার থেকে মানুষের আবির্ভাবের একটা সময়কাল পাওয়া যায়। আর তা হবে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব এককোটি বছর পূর্বে। এ বিষয়ে বাইবেলের যে তথ্য তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯৭৫ সালের হিব্রু

www.nagorikpathagar.org

ক্যালেন্ডার মোতাবেক মাত্র ৫৭৩৬ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আগমন ঘটেছিল। সুতরাং মানুষের দুনিয়াতে আবির্ভাব সম্পর্কে বাইবেলের তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। যেসব বিষয়ে বাইবেলে ভুলের পরিমাণ পর্বত পরিমাণ, সেখানে কুরআনের একটি আয়াতও আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের আবিস্কারের ফলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। বরং অনেক আয়াত ইতিমধ্যে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- মানব প্রজনন, মহাবিশ্বে সবকিছুই ঘুরছে, কিছুই স্থির নেই, মহাকাশে ভ্রমণ, অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব ইত্যাদি। আল্লাহই আধুনিক যুগের অনেক আবিষ্কারের কথা পূর্বেই কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সত্যি সত্যিই কোন মানুষ যদি কুরআন রচনা করে থাকেন তাহলে সপ্তম শতাব্দীতে বসে তিনি কিভাবে বর্তমানের এতসব আবিষ্কারের ফলাফল সঠিকভাবে রচনা করতে পারলেন? এর উত্তরে অনেকে বলে থাকেন- "আরবরা জ্ঞানের দিক দিয়ে সেসময়ে অনেক বেশি মাত্রায় এগিয়ে ছিল এবং মুহাম্মদ (সা) তাদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করে তা কুরআনে জুড়ে দিয়েছেন।" অথচ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও যার আছে তিনি জানেন মধ্যযুগে আরব বিশ্বে যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা মুহাম্মদ (সা) এর সময়কালের অনেক পরে। সুতরাং ইতিহাস সম্পর্কে যে ভাল জ্ঞান রাখেন তার পক্ষে এ ধরনের অসার, অবান্তর, ভিত্তিহীন ও হঠকারিতা মন্তব্য করা সম্ভব নয়। যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য কুরআনে এসেছে তা একান্ত হালে এসে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া কুরআন নাযিলের সময়ে আরবরা যদি বিজ্ঞানের চরম জ্ঞান অর্জন করেও থাকেন তবু কুরআনে যেসব বিজ্ঞান ভিত্তিক বক্তব্য এসেছে তা কি তখন কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল?

কম্পিউটারের বিশ্লেষণে কুরআনের মু'জেযা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কুরআন জুড়ে ছড়িয়ে আছে উনিশের পরম বিস্ময় ও চরম অলৌকিকত্ব। ডা. তারিক আল সুওয়াদাইনের গবেষণা কুরআনের মু'জেযাকে নতুন করে প্রমাণ করল। সত্যই অবাক হতে হয় কুরআন নাযিলের সময় কোন কম্পিউটার ছিল না অথচ এত নিখুঁতভাবে এতকিছুর মিল ঘটল কি করে? আসলে এখানেই আমাদের মারাত্মক ভুল। কম্পিউটার ছিল না ঠিকই কিন্তু কম্পিউটার জ্ঞানের স্রষ্টা তো ঠিকই ছিল।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ـ (الملك : ١٤)

www.nagorikpathagar.org

"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবগত।" (সূরা মূলক ৬৭ ঃ আয়াত ১৪)

কাজেই অবাক বা হতবাক হওয়ার আসলে কিছুই নেই। কম্পিউটারের এসব মু'জেযা আবিষ্কারের পূর্বে ও কুরআন যা ছিল পরেও তাই থাকবে। যেহেতু এটা স্রষ্টার বাণী।

কুরআনের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এখনো প্রমাণিত হয়নি। যেমন- কুরআনে এ পৃথিবীর মতোই একাধিক গ্রহের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা দেয়া আছে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ (ط) يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (لا) وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ (الطلاق : ١٢)

"আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ ও উহাদের অনুরূপ পৃথিবী, উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।" (সূরা তালাক ৬৫ ঃ আয়াত ১২)

এ যাবৎ বিজ্ঞান এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোন প্রমাণ দিতে না পারলেও আমাদের পৃথিবীর মতো আরও এ ধরনের গ্রহের অস্তিত্ব যে রয়েছে সে সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছে এবং গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মানুষ খুঁজে পাবে আমাদের মতো আরও পৃথিবী।

আসলে কুরআনের সাথে কখনোই বিজ্ঞানের আবিষ্কারের (প্রতিষ্ঠিত সত্যের) সাথে সংঘাত হতে পারে না। কারণ কুরআন যিনি নাযিল করেছেন তিনিই মানুষকে আবিষ্কারের জ্ঞান দান করেছেন। এক ধরনের আধুনিক শিক্ষিত লোক মনে করে বিজ্ঞান কুরআন ও ইসলামকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলছে এবং বিজ্ঞান মানুষের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। মান্ধাতার আমলের কুরআন বর্তমানে অচল বলে ধর্মের আর কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে সত্য যেমন- মধ্যাকর্ষণ, এক্স-রে, লেসার-রে ইত্যাদি। কিন্তু এসব আবিষ্কার না করলেও যা আছে তাই থাকত। আবিষ্কারের ফলে এদের গুণাগুণ বাড়েওনি কমেওনি বা অস্তিত্বও হারিয়ে যায়নি। বিজ্ঞান যদি সবই করতে পারত তবে ভূমিকম্প, ঝড়, মৃত্যু ইত্যাদি বন্ধ করুক দেখি? মানুষ বসবাস করতে পারবে কি সূর্যের অভ্যন্তরে? সূর্যের আলো ও তাপ কমাতে ও

বাড়াতে পারবে কি কেউ? অতটুকুই পারবে যতটুকু জ্ঞান ও ক্ষমতা মানুষকে মহান স্রষ্টা দিয়েছেন। নিজের মৃত্যুকেই যখন কেউ ঠেকাতে পারছে না তবে আর বড়াই কিসের? খাদ্য, পানি, বাতাস ছাড়া এক মুহূর্তও আমরা বাঁচতে পারব কি? কিন্তু স্রষ্টা আছেন, থাকবেন তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে। কাজেই আমাদের বাঁচতে হবে স্রষ্টার দেয়া নিয়ামত ও বিধানের মধ্য দিয়ে।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا (الرعد : ٣٧)

"এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি বিধানরূপে আরবি ভাষায়।" (সূরা রা'দ ১৩ ঃ আয়াত ৩৭)

কাজেই কুরআন সর্বকালের, সর্বযুগের জন্য। মান্ধাতার আমলের বলে কিছুই নেই। "তিনিই যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না; বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।" (২১ ঃ ২৩) "দৃষ্টি তাহাকে দর্শন করে না কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহকে দর্শন করেন।" (৬ ঃ ১০৩) "তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (৪৭ঃ২৪) "ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।" (৪ ঃ ৮২) "তবু কি উহারা ঈমান আনিবে না?" (২১ ঃ ৩০) "সেইদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মানুসারে প্রতিদান পাইবে কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে অতিশয় তৎপর।" (৪০ ঃ ১৭) "তোমাদের কি হইল, তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বকে স্বীকার করিতেছ না?" (৭১ ঃ ১৩) "তোমরা সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না। কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না। কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।" (২ ঃ ৪৮)

হাশরের দিনে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে কোন কিছুই লুকাবার উপায় থাকবে না। "এসব হইতেছে উপদেশ অতএব যাহার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা গ্রহণ করুক।" (৭৬ ঃ ২৯) "কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?" (৫৪ ঃ ১৭) "ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (১৪ ঃ ৫২) "আল্লাহ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না; বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" (৫ঃ৬)

যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে কুরআনের বিরুদ্ধে তার ধরাছোঁয়ার অনেক ঊর্ধ্বে পবিত্র কুরআন। এর প্রমাণ ইতিমধ্যেই আপনারা পেয়ে গেছেন। আমার স্বল্পজ্ঞানে অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে যেসব দলিল ও প্রমাণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম তা কতটুকু সঠিক, বিষয়ভিত্তিক ও আপনাদের নিকট বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে এর জবাব আপনার কাছেই রইল। তবে এ বইতে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ঘটনা ও দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে যা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি তা প্রমাণ করে "নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন" (৫৬ ঃ ৭৭) "ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ।" (২ ঃ ২) "নিশ্চয়ই আল-কুরআন জগৎ সমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জীবরাঈল (আ) ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে।" (২৬ ঃ ১৯২-১৯৩) "ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।" (৮১ ঃ ২৫) "নিশ্চয়ই ইহা মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।" (২৭ ঃ ৭৭) "নিঃসন্দেহে ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।" (৩ ঃ ১৯) "কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনো কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত-দের অন্তর্ভুক্ত।" (৩ ঃ ৮৫) "সাবধান! সৃষ্টি আল্লাহর এবং হুকুম চলিবে তাঁহারই।" (৭ ঃ ৫৪) "বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মি নবীর প্রতি। যে আল্লাহ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও। (৭ ঃ ১৫৮) "ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।" (৭৬ ঃ ২৯)

www.nagorikpathagar.org

Reference :

আল কুরআনুল করীম- ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

পবিত্র কোরআনুল করীম- মুদ্রণ- খাদেমুল হারামইন বাদশা

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)- ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প

মদীনা মনোওয়ারা

তাফসীর ইবনে কাসীর- অনুবাদ ড. মুহাম্মদ মজিবুর রহমান

তাফহীমুল কুরআন- সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী

সহীহ্ আল বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী

রিয়াদুস সালেহীন- অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব

মাওলানা মোহাম্মদ মূসা

সৌদী টেলিভিশনের নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম থেকে :

a. Scientific Revolution in the Holy Quran

b. Science And Quran

Speaches of

a. Dr. Zakir Abdul Karim Naik

b. Ahmed Deedat

The Amazing Quran- Lecture Presented By Gray Miller

Bibel Quran and Science- Dr. Moris Bukail

The Origin of Man- Dr. Moris Bukail

আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব ১ ও ২)- মেজর কাজী জাহান মিয়া,

আল-কুরআন ইজ অল সাইন্স- মোহাম্মদ আবু তালেব

আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স- মুহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন

Scientific Indication In The Holy Quran

- Islamic Foundation Bangladesh

পবিত্র কুরআনে বিজ্ঞানের নির্দেশনা- শেখ মোহাম্মদ ইসমাইল ও আঃ কাদের মল্লিক

কোরআনে বিজ্ঞান- ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

আল-কোরআনে সর্বশ্রেষ্ঠ মো'জেজা এবং উনিশ- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান- ড. সুভাষ চন্দ্র দাস

প্রাকৃতিক ভূগোল- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

Last's Anatomy- 8th Edition
Text Book Of Medical Physiology- Arthur C Guyton
The World Arround Us- Ian Rid Path
Jeffcoate's Principles of Gynaecology- International edition
Obstetrics- By Ten teachers.
The Univers
Space Tecnology

www.pathagar.com

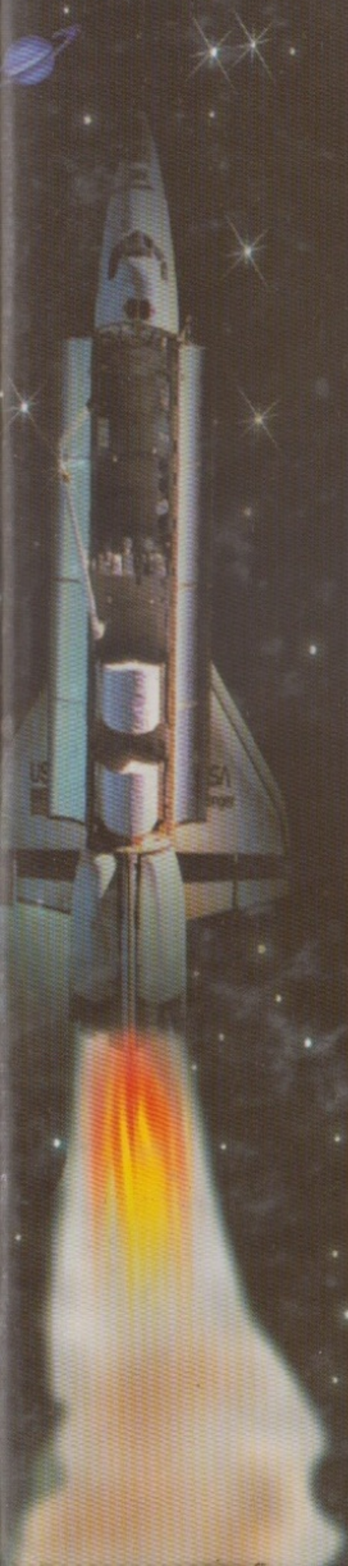

একদিন মহাশুন্যাভিযান যে সম্ভব হবে-এর উল্লেখ রয়েছে কুরআনে-

" হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না, শক্তি (সামর্থ্য) অর্জন ব্যতিরেকে।"

(-সূরা আর রাহমান ৫৫; আয়াত ৩৩)

পৃথিবীর মত আরও পৃথিবীর অস্তিত্বের ঘোষণা ঃ

"আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ ও উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও, উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।"

(-সূরা তালাক ৬৫; আয়াত ১২)

অথচ ওরা বলে ..!!!

"কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়। ইহা মানব রচিত।"

"কিয়ামত পুনরুত্থান ও পরকাল বলতে কিছুই নেই।"

"মান্ধাতার আমলের কুরআন বর্তমান যুগের অনুপযোগী।"

"সব কিছু প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। স্রষ্টাকে আবার সৃষ্টি করেছে কে?"